অর্থনীতি ২য়পত্র

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

রচনা

অধ্যাপক ইসমাইল হোসেন
ডঃ আলী আশরাফ
এইচ এম দেলোয়ার আকবর
মোঃ ইমরানুল হক
দিলরুবা খানম

সম্পাদনা

ড. মোঃ আর্শেদ আলী মাতুব্বর
মোস্তফা আজাদ কামাল

রচনাশৈলী সম্পাদক

ড. মোঃ নাসিরুল ইসলাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনীতি ২য়পত্র

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ কাল

সেপ্টেম্বর- ২০০০

পুন:মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী- ২০০২

পুন:মুদ্রণ ডিসেম্বর- ২০০২

পুন:মুদ্রণ জানুয়ারি-২০০৪

পুন:মুদ্রণ জানুয়ারি-২০০৫

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

ডেস্কটপ প্রসেসিং

মোঃ একরামুল হক ভূঁঞা

মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স

আবদুল মালেক

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর - ১৭০৫।

Ó ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রণ

মেসার্স বিজনেস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

১৪/১৫ পদ্মনিধি লেন, ঢাকা

ISBN 984-34-3034-4

অর্থনীতি ২য়পত্র

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
ইউনিট - ১	**জাতীয় আয়**		১
	পাঠ-১	জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা	১
	পাঠ-২	জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি	৭
ইউনিট - ২	**সরকারী অর্থব্যবস্থা**		১৩
	পাঠ-১	সরকারী অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা, সরকারী ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়	১৩
	পাঠ-২	সরকারী ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা	১৮
	পাঠ-৩	সরকারী আয়ের উৎস	২৪
	পাঠ-৪	কর, করের আপাত ভার ও চূড়ান্ত ভার	২৭
	পাঠ-৫	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর – এদের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ	৩৬
	পাঠ-৬	বাজেটের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ	৪০
	পাঠ-৭	বিভিন্ন বাজেটের প্রভাব	৪৭
ইউনিট - ৩	**অর্থ**		৪৯
	পাঠ-১	দ্রব্য বিনিময় প্রথা ও অর্থের ক্রমবিকাশ	৪৯
	পাঠ-২	অর্থের সংজ্ঞা ও কার্যাবলী	৫২
	পাঠ-৩	অর্থের শ্রেণীভেদ	৫৫
	পাঠ-৪	অর্থের চাহিদা ও যোগান	৫৮
	পাঠ-৫	অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব	৬২
ইউনিট - ৪	**মুদ্রাস্ফীতি**		৬৫
	পাঠ-১	অর্থের মূল্য	৬৫
	পাঠ-২	সূচক সংখ্যা	৭২
	পাঠ-৩	মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ, কারণ ও ফলাফল	৭৭
	পাঠ-৪	মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়	৮৩
	পাঠ-৫	বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও এবং অর্থনৈতিতে এর প্রভাব	৮৬
ইউনিট - ৫	**আর্থিক খাত ও ব্যাংক ব্যবস্থা**		৮৯
	পাঠ-১	মূলধন বাজার ও মুদ্রাবাজারের উপাদান শেয়ার বাজার	৮৯
	পাঠ-২	স্বর্ণের গুরুত্ব	৯১
	পাঠ-৩	ঋণের উৎস – প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক	৯৫
	পাঠ-৪	ব্যাংক-এর প্রকারভেদ	৯৯
	পাঠ-৫	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী	১০৩
	পাঠ-৬	বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী	১০৭
	পাঠ-৭	বীমা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব	১১১
ইউনিট - ৬	**সরকারী অর্থব্যবস্থা**		১১৭
	পাঠ-১	প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন	১১৭
	পাঠ-২	বাংলাদেশের অর্থনীতি : উন্নত, অনুন্নত নাকি উন্নয়নশীল	১৩০
	পাঠ-৩	সামাজিক অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো	১৩৯
ইউনিট - ৭	**বাংলাদেশের কৃষি**		১৫৫
	পাঠ-১	বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা ও সমাধান	১৫৫
	পাঠ-২	জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা : কারণ ও ফলাফল	১৫৮
	পাঠ-৩	বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা – এর ত্রুটিসমূহ, কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব	১৬০
	পাঠ-৪	কৃষির আধুনিকীকরণ	১৬২
	পাঠ-৫	খাদ্য সমস্যা – কারণ ও প্রতিকার	১৬৪
	পাঠ-৬	কৃষি ঋণ – ঋণের উৎস ও কাঠামোগত ত্রুটি	১৬৬
	পাঠ-৭	কৃষিজাত পণ্যের বিপণন – সমস্যা ও সমাধান	১৬৮

ইউনিট – ৮	**বাংলাদেশের শিল্প**		**১৭১**
	পাঠ-১	বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো	১৭১
	পাঠ-২	বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা	১৭৩
	পাঠ-৩	বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পর গুরুত্ব	১৭৬
	পাঠ-৪	কতিপয় বৃহৎ শিল্পের বর্তমান অবস্থা	১৭৭
	পাঠ-৫	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব	১৮৩
	পাঠ-৬	কুটিরশিল্প ও স্বকর্মসংস্থান	১৮৫
	পাঠ-৭	কুটির শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায়	১৮৭
	পাঠ-৮	বাংলাদেশেল শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা ও বেসরকারী করণের প্রয়োজনীয়তা	১৯০
ইউনিট – ৯	**বাংলাদেশের সরকারী অর্থ ব্যবস্থা**		**১৯৩**
	পাঠ-১	স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত	১৯৩
	পাঠ-২	বাংলাদেশে সরকারী আয়ের উৎস সমূহ	২০১
	পাঠ-৩	বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য	২০৪
	পাঠ-৪	বাংলাদেশের বাজেট : রাজস্ব ও মূলধনী	২১০
ইউনিট – ১০	**বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থা**		**২১৯**
	পাঠ-১	বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলী	২২০
	পাঠ-২	বাণিজ্যিক ব্যাংক : সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন	২২৩
	পাঠ-৩	বিশেষ ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ	২২৬
	পাঠ-৪	বাংলাদেশের বীমা ব্যবস্থা	২২৯
ইউনিট – ১১	**বাংলাদেশের জনসংখ্যা**		**২৩১**
	পাঠ-১	ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব	২৩২
	পাঠ-২	কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব	২৩৫
	পাঠ-৩	তত্ত্বসমূহের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও বৃদ্ধির কারণ	২৩৮
	পাঠ-৪	বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিশ্লেষণ	২৪২
	পাঠ-৫	জনাধিক্যের চাপ – অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের উপর	২৪৭
ইউনিট – ১২	**মানব সম্পদ উন্নয়ন**		**২৫৩**
	পাঠ-১	মানব সম্পদ উন্নয়ন : ধারণা ও ক্রমবিকাশ	২৫৩
	পাঠ-২	জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান	২৫৭
	পাঠ-৩	পরিবার পরিকল্পনা	২৬০
	পাঠ-৪	বেকারত্ব – জনসংখ্যা ও বেকারত্বের সম্পর্ক	২৬৩
	পাঠ-৫	বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি	২৬৭
ইউনিট – ১৩	**উন্নয়ন পরিকল্পনা**		**২৭১**
	পাঠ-১	সংজ্ঞা ও গুরুত্ব	২৭১
	পাঠ-২	স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎস	২৭৩
	পাঠ-৩	বাংলাদেশে পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা : সফলতা ও ব্যর্থতা, ব্যর্থতার কারণসমূহ	২৭৫

এ বইটি কিভাবে পড়বেন

এ বইটি দূরশিক্ষণের উপযোগী করে এক বিশেষ পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। এটি 'মডিউলার পদ্ধতি' নামে পরিচিত। যখন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষক উপস্থিত থাকেন না, তখন বইটি 'মডিউলার পদ্ধতি'-তে রচনা করা একটি রীতিসিদ্ধ ব্যাপার। এ পদ্ধতি আমাদের দেশে নতুন হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, তা ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট হল, সহজভাবে পাঠ উপস্থাপন।

এ বইটি পাঠ করতে গেলে আপনি দেখবেন, বইটিতে কতিপয় ইউনিট আছে। প্রতিটি ইউনিট আবার কতিপয় পাঠে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিটের শুরুতেই ভূমিকা আছে। ভূমিকা পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন ইউনিটটিতে কি বিষয়ে জানতে যাচ্ছেন। এর পর পাঠ বিভাজন। প্রতিটি পাঠের শুরুতে এক বা একাধিক উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে। পাঠ শেষে আপনি কি লিখতে, বলতে বা বর্ণনা করতে পারবেন তা উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মডিউলার পদ্ধতি'-তে এটি একটি অত্যাবশ্যক অংশ। যা আপনাকে মানসিকভাবে (পাঠ জানার জন্য) তৈরি করে তুলবে।

পাঠের শুরুতে বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতি কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কতিপয় আইকন (icon) যেমন, , , ইত্যাদি। পাঠের শুরুতে বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খোলা বইয়ের প্রত্যেকটি দেখলে আপনি বুঝবেন আপনাকে পড়তে বলা হচ্ছে।

প্রতীক চিহ্নের ডান পাশে মূলপাঠটি দেওয়া আছে। মূলপাঠটি হচ্ছে প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু। কোন ক্ষেত্রে হাতের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। হাতের ছবি দেখলেই আপনি বুঝবেন – এটি একটি নির্দেশ। নির্দেশে যা উল্লেখ রয়েছে তা যত্ন-সহকারে করবেন।

প্রতিটি পাঠ শেষে দেখবেন পাঠোত্তর মূল্যায়ন। এটিও মডিউলার পদ্ধতির অংশ, যা আপনাকে পাঠটির স্বমূল্যায়নের সুযোগ দিবে। পাঠোত্তর মূল্যায়ন যদি সন্তোষজনক হয় তবে বুঝতে হবে পাঠটি আপনার আয়ত্তে এসেছে। প্রতিটি ইউনিটের শেষে চাবি প্রতীক দ্বারা বুঝানো হবে পাঠোত্তর মূল্যায়নের উত্তরমালা। যেখানে পাঠোত্তর মূল্যায়নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। সেগুলো মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন – আপনার উত্তর কতটুকু সঠিক হয়েছে। যদি অধিকাংশ উত্তর ভুল হয় – তবে পাঠটি পুনরায় পড়ুন ও আয়ত্তে আনার চেষ্টা করুন।

প্রতিটি ইউনিটের সকল পাঠ ও পাঠোত্তর মূল্যায়ন শেষে পাবেন রচনামূলক প্রশ্নমালা। এটিকে চূড়ান্ত মূল্যায়নও বলা হয়। রচনামূলক প্রশ্নমালায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নও আছে। প্রতিটি প্রশ্ন শেষে উত্তরের নির্দেশনা আছে। প্রশ্নগুলো ভাল করে ভেবে দেখবেন – উত্তর কি হওয়া উচিত। আপনার ভাবনার সহিত প্রশ্নের শেষে নির্দেশিত উত্তরের সহিত মিলছে কিনা দেখুন। আপনার ভাবনার সহিত উত্তর না মিললে পুনরায় পাঠগুলো অধ্যয়ন করুন। আশা করব আপনি পাঠে কৃতকার্য হবেন।

জাতীয় আয়

ইউনিট ১

পাঠ - ১ : জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন ;
- জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কোন দেশের উৎপাদন, নিয়োগ, দামস্তর ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জাতীয় আয় ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলি সম্পর্কে জানতে হবে। সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলি হল মোট জাতীয় উৎপাদন, নীট জাতীয় উৎপাদন, মোট দেশজ উৎপাদন, নীট দেশজ উৎপাদন, ব্যক্তিগত আয়, ব্যয়যোগ্য আয় ইত্যাদি।

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) : একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে উৎপাদিত মোট চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাদির চলতি বাজার মূল্যকে বলে মোট জাতীয় উৎপাদন। এই জাতীয় উৎপাদনের ধারণায় দুটি, বিষয় উল্লেখযোগ্য। একটি হল বার্ষিক উৎপাদনের বাজার মূল্য। এতে বুঝা যাচ্ছে যে GNP একটি আর্থিক ধারণা, বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ও সেবাদির আর্থিক মূল্য ছাড়া এদেরকে যোগ করার অন্য কোন পথ নাই। অপর বিষয়টি হল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাদি শুধু বিবেচ্য। অর্থনীতিতে যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তাদেরকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়।

১. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা এবং
২. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা।

আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবের সময় শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাকে বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন – কাপড় উৎপাদনের কথাই ধরা যাক। কাপড়ের উৎপাদনের সময় সুতা, আর সুতা উৎপাদনের জন্য তুলা ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে কাপড়ের মূল্যের মধ্যেই সুতা আর সুতার মুল্যের মধ্যেই তুলার মূল্য অন্তর্ভুক্ত আছে। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন গণনার সময় কাপড়ের দাম গণনা করলেই চলবে, সুতা বা তুলার দাম অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এই মোট জাতীয় উৎপাদন আবার দুই প্রকার –
১. বাজার মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদন
২. স্থির মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদন।
এক বছরে কোন একটি দেশে প্রস্তুতকৃত মোট চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার সে বছরের বাজার মূল্যকে অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করে যখন আমরা যোগ করব তখন আমরা ঐদেশের মোট জাতীয়

উৎপাদন পাব। (GNP at current price) অনেক সময় মূল্যের উত্থান পতনের হেতু মোট জাতীয় উৎপাদনের উত্থান পতন হয়। এইজন্য কোন একটি স্বাভাবিক বছরের মূল্যকে ভিত্তি বছর ধরে চলতি সময়ে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্যায়ন করা হয়। এভাবে পরিমাপকৃত জাতীয় উৎপাদনকে স্থির মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP at constant price) বলে।

ডর্ন বুশ ও ফিশারের (Dorn Busch and Fischer) এর মতে মোট জাতীয় উৎপাদন হচ্ছে একটি দেশের নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণসমূহ দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার মোট মূল্য (Gross National product or GNP is the value of all goods and services produced by domestically owned factors of production within a given period.)

নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product, NNP) :

একটি দেশের মোট উৎপাদনের উপকরনের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট বাজার মূল্য থেকে মূলধনের ব্যবহার জনিত ব্যয় বা যন্ত্রপাতির অপচয় জনিত (Capital Consumption Allowance, CCP) ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই সে দেশের নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP)।

অর্থাৎ, NNP = GNP – CCP

সুতরাং GNP=NNP+CCP

অনুশীলনী

১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশের GNP (বাজার মূল্যে) = ১০৭৪২৬২ মিলিয়ন টাকা এবং মূলধনের অপচয় জনিত ব্যয় = ৭৪৯৪২ মিলিয়ন টাকা । উক্ত অর্থ বছরে NNP কত ছিল লিখুন ।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross Domestic Product, GDP) :

একটা দেশের নিজস্ব ভৌগোলিক সীমরেখার ভিতরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ ১ বৎসরে) দেশী বা দেশে অবস্থানরত বিদেশী ব্যাক্তিবর্গ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক বা বাজার মূল্যের সমষ্টিকে আলোচ্য দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বলে। (Gross Domestic Product is the value of final goods and services produced within the country).

মোট জাতীয় উৎপাদন = [মোট দেশজ উৎপাদন] + [বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের আয়] – [দেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আয়]

মোট দেশজ উৎপাদন = [মোট জাতীয় উৎপাদন] – [বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিকদের আয়] + [দেশে অবস্থানকারী বিদেশীদের আয়]

অনুশীলনী

আমেরিকায় অবস্থিত একটি প্রাইভেট ফার্মের মালিক জনাব কামালউদ্দীন। তার বাড়ী সিলেট জেলায়। সে ফার্মে চাকুরী করে আরও ৬ জন বাংলদেশী ও ২ জন আমেরিকান। ঐ ফার্মে

কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে কতজনের আয় বাংলাদেশের GNP, GDP তে যোগ হবে, কতজনের আয় আমেরিকার GNP, GDP তে যোগ হবে? কেন?

জাতীয় আয় (National Income NI) :

একটি দেশে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সব উৎপাদনের উপকরণের দ্বারা যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার চলতি বাজার মূল্যকে বা আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে। সহজ অর্থনৈতিক মডেলে (Simple economic model) এ মোট উৎপন্ন মূল্য এবং উপকরণের অর্জিত আয় সমান হয় বলে GNP কে NI ও বলা যায়।

জাতীয় আয় = খাজনা+ সুদ+ মজুরী+ মুনাফা = GNP

জাতীয় আয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়কে তিনটি দিক থেকে পরিমাপ করা যায় :

ক) **উৎপাদন হিসাবে :** কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটা দেশের উৎপাদনের উপকরণের দ্বারা উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য হল জাতীয় আয়।

খ) **ব্যয় হিসাবে :** কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য সমাজের যে ব্যয় হয় তার সমষ্টিকেও আমরা জাতীয় আয় বলি।

গ) **আয়ের হিসাবে:** কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপকরণসমূহের অর্জিত আয়ের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে।

ব্যক্তিগত আয় (Personal Income PI) :

একটা নির্দিষ্ট সময়ে সব ব্যক্তি বা পরিবারের চলতি আয়কে ব্যক্তিগত আয় বলে। জাতীয় আয় থেকে কিছু কিছু উপাদান যোগ ও বিয়োগ করে ব্যক্তিগত আয় পাওয়া যায়। যেমন –
ব্যক্তিগত আয় = জাতীয় আয় - ১. কর্পোরেট আয়কর - ২. যৌথ প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের অবশিষ্ট অংশ - ৩. সামাজিক বীমার জন্য প্রদত্ত অর্থ + ৪. হস্তান্তরিত আয় + ৫. নীট সরকারী সুদ।

নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১) **কর্পোরেট আয়কর :** কর্পোরেশনের মালিকরা বা শেয়ার মালিকরা যে কর প্রদান করে এবং কর্পোরেটেড মুনাফার জন্য যে কর সরকারকে দিতে হয় জাতীয় আয় থেকে তা বাদ দিতে হয়।

২) **কর্পোরেট মুনাফার অবশিষ্ট অংশ :** কর প্রদানের পর এবং শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রদানের পর কর্পোরেট মুনাফার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে যা পরবর্তী বিনিয়োগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জাতীয় আয় থেকে কর্পোরেট মুনাফার এই অবশিষ্ট অংশ বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত আয় পাওয়া যায়।

৩) **সামাজিক বীমার জন্য প্রদত্ত অর্থ :** চাকুরীজীবিরা সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে বীমা বাবদ অর্থ প্রদান করে থাকে। জাতীয় আয় থেকে এই অর্থ বাদ দিতে হবে ব্যত্তিগত আয় বের করার জন্য।

৪) **হস্তান্তরিত আয় :** সরকার জনগণকে বেকার ভাতা, অবসর ভাতা, দুঃস্থদের ভাতা ইত্যাদি হিসাবে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। এই টাকাটা সরকারের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়ে জনগণের কাছে যায় এবং জনগণের ব্যক্তিগত আয়ের সাথে যুক্ত হয়।

৫) **নীট সরকারী সুদ :** সরকার জনগণের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তাকে সুদ দেয় এবং জনগণও সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিলে সুদ দেয় এই নীট সুদ ব্যক্তিগত আয়ের সাথে যুক্ত হবে।

অনুশীলনী

একজন চাকুরীজীবির মাসিক আয় ৬০০০ টাকা। তার স্ত্রী বেকার ভাতা হিসাবে ১০০০ টাকা পাচ্ছেন। তাকে সামাজিক নিরাপত্তার বীমা হিসাবে দিতে হয় ৫০০ টাকা। তার ব্যক্তিগত আয় কত?

ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয় (Disposible Income DI) :

ব্যক্তি তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যাবহার করতে পারে না। তার আয় থেকে আয়কর, সম্পদ কর ইত্যাদি সরকারকে প্রদান করতে হয়। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত কর বিয়োগ করে পাওয়া যায় ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় :

ব্যয়যোগ্য আয় (Yd) = ব্যক্তিগত আয় - ব্যক্তিগত কর।

অনুশীলনী

মধুর ব্যক্তিগত আয় ৭০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত কর ১৯৪ টাকা। তার ব্যয়যোগ্য আয় কত?

অনুশীলনী

আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয় : কোন দেশে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ উৎপাদনের উপকরণকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার মূল্যকে চলতি দামে GNP বা আর্থিক জাতীয় উৎপাদন বলে।

আর্থিক GNP = $P_1Q_1 + P_2Q_2 +$ ....

আর কোন একটি নির্দিষ্ট বছরের বাজার মুল্যের তুলনায় চলতি বছরের আর্থিক GNP কতটুকু হ্রাস বৃদ্ধি পেল তা জানার জন্য দরকার হয় প্রকৃত GNP। ভিত্তি বছরের দামের উপর নির্ভর করে যদি বিবেচ্য বছরের উৎপন্ন সামগ্রী ও সেবাকে পরিমাপ করা হয় তাকে প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বলে।

$$\text{প্রকৃত জাতীয় আয়} = \frac{\text{আর্থিক জাতীয় আয়}}{\text{দাম সূচক}} \times ১০০$$

$$\text{াম সূচক} = \frac{\text{চলতি বছরের দাম}}{\text{ভিত্তি বছরের দাম}} \times ১০০$$

অনুশীলনী

১৯৮৮ সালের চলতি দামে মোট জাতীয় আয় ছিল ৮০০ মিলিয়ন টাকা। আর ১৯৮৪ সালের দামকে ভিত্তি ধরে ১৯৮৪ সালে মোট জাতীয় আয় ছিল ২০০ মিলিয়ন টাকা। এক্ষেত্রে দাম সূচক কত ?

মোট জাতীয় আয় ডিফ্লেটর :

আর্থিক ও প্রকৃত GNP থেকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ সম্পর্কে জানতে পারি তা হল GNP ডিফ্লেটর। আর্থিক ও প্রকৃত GNP এর অনুপাত হল GNP ডিফ্লেটর ।

$$\text{GNP ডিফ্লেটর} = \frac{\text{আর্থিক GNP}}{\text{প্রকৃত GNP}}$$

ভিত্তি বছর থেকে চলতি বছর পর্যন্ত দাম স্তর কি হারে বাড়ল অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার কত হল তা জানা যায় GNP ডিফ্লেটর থেকে।

জাতীয় আয় ব্যবধান :

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটা দেশে সম্পদের পূর্ণ নিয়োগের দ্বারা যে পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে তা থেকে বাস্তবে উৎপাদন কম হলে সম্ভাব্য উৎপাদন ও বাস্তব উৎপাদনের যে পার্থক্য তাকে জাতীয় আয় ব্যবধান বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মোট জাতীয় উৎপাদন হচ্ছে –
ক. উৎপাদিত দ্রব্যের সমষ্টি
খ. উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মূল্যের সমষ্টি
গ. উপরের কোনটিই নয়

২. নীট জাতীয় উৎপাদনে যন্ত্রপাতির অবচয়জনিত ব্যয় –
ক. অন্তর্ভুক্ত থাকে
খ. অন্তর্ভুক্ত থাকেনা
গ. উপরের কোনটিই নয়

৩. ব্যক্তিগত আয়ে ব্যক্তিগত কর –
ক. অন্তর্ভুক্ত থাকে
খ. অন্তর্ভুক্ত থাকেনা
গ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মোট জাতীয় আয় কি? মোট অভ্যন্তরীন আয়ের সাথে এর তফাৎ ব্যাখ্যা করুন।
২. নীট জাতীয় উৎপাদন কি?
৩. ব্যক্তিগত আয় ও ব্যক্তিগত ব্যবহার্য আয়ের মধ্যে তফাৎ কি?

পাঠ - ২ : জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ♦ জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ;
- ♦ জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ বলতে পারবেন।

জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। তা হল নিম্নরূপ :

১। উৎপাদন পদ্ধতি : এই পদ্ধতির দ্বারা একটা বদ্ধ অর্থনীতিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার মূল্যকে বুঝান হয়। আর অর্থনীতি যদি উন্মুক্ত হয় তবে চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রীর বাজার মূল্যের সাথে রপ্তানী দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে আমদানী দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য বাদ দিলে যে Net export পাব তা যোগ করা হয়। নীট export =X-M

$NI= P_1Q_1+P_2Q_2+P_3Q_3+\ldots\ldots P_nQ_n + (X-M)$

এখানে $P_1, P_2 \ldots\ldots P_n$ হচ্ছে যথাক্রমে $Q_1, Q_2 \ldots\ldots Q_n$ দ্রব্যসমূহের বাজার মূল্য।

অনুশীলনী

মনে কর কোন আর্থনীতিতে শুধু চাল, আলু, ডাল উৎপাদিত হয়। ১৯৯০ সালে এদের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২০০, ১০০, ৫০ একক এবং দাম ছিল যথাক্রমে ২০, ১০, ৩০ টাকা। উল্লিখিত বছরে মোট জাতীয় আয়ের পরিমাপ নির্ণয় করুন।

২। ব্যয় পদ্ধতি : কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের উপকরণ দ্বারা যে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার মূল্য ও সমাজের মানুষের ব্যয় সমান। কারণ যা উৎপাদিত হবে তাই সমাজের মানুষ কিনবে। তাই সমাজের মানুষের ব্যয়ের সমষ্টিকেও জাতীয় আয় বলা যায়। জনগণের কাছে যে উৎপাদনের উপকরণ থাকে তার নিযুক্তির দ্বারা জনগণ অর্থ পায় এই অর্থ জনগণ ভোগের জন্য ব্যয় করে। যা বাকী থাকে তা সঞ্চয় করে বিনিয়োগ করে। সরকারী ব্যয় ও এক্ষেত্রে যুক্ত হবে। তাই –

জাতীয় আয় = ভোগ+ বিনিয়োগ+ সরকারী ব্যয়, অথবা, $NI= C + I + G$

৩। আয় পদ্ধতি : কোন দেশের নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণগুলি এক বছরে যে অর্থ উপার্জন করে তার সমষ্টি থেকে জাতীয় আয় পাওয় যায়। এক বছরে জমির জন্য খাজনা, শ্রমের জন্য মজুরী, পুজির জন্য সুদ আর সংগঠনের জন্য যে মুনাফা তার যোগফল দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ,

জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরী + সুদ + মুনাফা।

$NI= R+W+I+P$ = Rent + wage + interest + profit

অনুশীলনী

১৯৯০ সনে একটি দেশে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদনে ব্যয় হল-মজুরী ২০ কোটি টাকা, সুদ ১০ কোটি টাকা, খাজনা ৩০ কোটি টাকা, মুনাফা ৮০ কোটি টাকা। উল্লেখিত বছরে GNP এর পরিমাণ নির্ণয় করুন।

কি কি বিষয় GNP তে অন্তর্ভুক্ত নয়

১। যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমরা GNP গণনা করব সে সময়ের পূর্বে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার জন্য যে অর্থ ব্যায়িত হয় তা GNP তে আসবে না। তা বিক্রি করে যে অর্থ পাবে তাও GNP তে আসবেনা। যেমন বিবেচ্য সময়ের পূর্বে কোন ব্যক্তি বাড়ী তৈরি

করল তা বিবেচ্য সময়ে বিক্রি করে যে অর্থ পাবে তা বিবেচ্য সময়ের GNP তে আসবে না। শুধু যে বছর তৈরি করেছি সে বছরের ব্যায়ের হিসাবে GNP তে আসবে। বিক্রি করলে যে অর্থ তা সে বছরের আয়ের হিসাবে GNP তে আসবে।

২। স্টক বন্ড ইত্যাদি বাবদ জনগণ সে অর্থ ব্যয় করে তা উৎপাদনের উপাদান নিয়োগের জন্য করে না বা তা উৎপাদনের কাজে লাগে না। তাই সে অর্থ GNP তে আসেনা। তাছাড়া এই শেয়ার ও বন্ড থেকে যে আয় হয় তাও GNP আসবে না। কারণ এটা কোন উৎপাদনের আয় না।

কোন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ

জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ বা কোনটির উপর জোর দেওয়া উচিত তা সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। কোন পদ্ধতি অধিক গ্রহণযোগ্য তা নির্ভর করবে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রাপ্তির উপর। তবে যদি পরিসংখ্যাগত তথ্য সব সময় গ্রহণযোগ্য না হয় তার দুর্বলতা থাকে তবে সব পদ্ধতিই ব্যবহার করা উচিত। যাতে একটির সাথে অপরটির তুলনা করে জাতীয় আয়ের সঠিক চিত্র তুলে ধরা যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যা

জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সে সব সমস্যা দেখা দেয় তা নিম্নরূপ :

১। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা যায়। দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে কোনটি মধ্যবর্তী ও কোনটি চূড়ান্ত তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে একই বিষয়ে দু'বার গণনা হবে এবং দ্বৈত গণনার সমস্যা দেখা দিবে। চূড়ান্ত দ্রব্যের সঠিক মূল্যের মধ্যে মধ্যবর্তী দ্রব্যের দাম ধরা হয়। তাই মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত উভয় পর্যায়ে গণনা হলে দ্বৈত গণনা সমস্যার দেখা দেয়।

২। অবিক্রীত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যায়ন করা কঠিন। তাই জাতীয় আয় পরিমাপে তা সমস্যার সৃষ্টি করে।

৩। নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বিশেষ নিজের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন কোন কৃষক যা উৎপাদন করে তার কিছু অংশ নিজের পরিমাপের ভোগের জন্য রেখে দেয়। সেই কৃষি পণ্যকে অর্থের দ্বারা বিচার করা কঠিন।

৪। যারা নিজ বাড়ীতে বসবাস করেন তাদের বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না অথচ বাড়ী ভাড়া যারা দেন তাদের প্রদেয় অর্থ জাতীয় আয়ে যোগ হয়। কারণ বিল্ডিংটা একটা Capital; ভাড়া হল Capital এর পাওনা। কাজেই বেশী মানুষ ভাড়া বাসায় থাকলে জাতীয় আয় বেশী হবে। আর কম মানুষ ভাড়া বাসায় থাকলে জাতীয় আয় কম হবে। তাই জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে এটি বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে।

৫। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জনগণ সঠিক আয়ের হিসাব দিতে চান না। যেমন একজন ডাক্তার ব্যক্তিগত ভাবে রোগী দেখে বা একজন ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কেউ কত উপার্জন করে তা অনেক সময় সঠিকভাবে জানা যায় না। ফলে আয়ের ভিত্তিতে জাতীয় আয় পরিমাপ বাস্তব সম্মত হতে পারে না।

৬। মূলধনের অপচয়জনিত ব্যয় যা জাতীয় আয়ের পরিমাপে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ বৃহদাকার পরিবেশে অপচয়ের খুঁটিনাটি জানাও সহজ নয়।

৭। বৈদেশিক উৎস থেকে দেশে অর্থ আসে তা ন্যায্য পথে যেমন আসতে পারে তেমনি আসতে পারে চোরা পথে। সেই অর্থের সঠিক হিসাব কিছুতেই সম্ভব নয়। তা সমস্যা সৃষ্টি করে।

৮। আয় কেবলমাত্র অর্থ ভিত্তিক না হয়ে দ্রব্য বা সেবা ভিত্তিক ও হতে পারে। দ্রব্য বা সেবা ভিত্তিক আয়ের হিসাব নির্ণয় কঠিন। তাই এটা সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন ঘরে কাজ করলে মহিলদেরকে আমরা এক কেজি চাল দেই একটু নাস্তা পানি দেই এগুলি এদের আয় কিন্তু এগুলির আর্থিক হিসাব নাই। এটা শ্রমের দ্বারা অর্জিত প্রকৃত আয়।

৯। পরিবারের সদস্যদের গৃহাস্থালী কাজের আর্থিক মূল্যায়ন হয় না। তাই এটা GNP পরিমাপে সমস্যা সৃষ্টি করে।

১০। অর্থের নিজস্ব মূল্য পরিবর্তনশীল। তাই উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্যায়ন দ্বারা জাতীয় আয়ের সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। আবার মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা অর্জিত আর্থিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এর দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে জাতীয় আয় বেড়েছে বা কমেছে।

১১। জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য সঠিক তথ্য দরকার। কিন্তু পরিসংখ্যানগত সমস্যার কারণে এ সমস্ত তথ্য প্রায়ই অসম্পূর্ণ এবং অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এটা GNP পরিমাপে সমস্যা সৃষ্টি করে।

১২। কোন দ্রব্য উৎপাদিত হলে তাকে অর্থ মূল্য দ্বারা পরিমাপ করে জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ; কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অনেক দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং তারা একের সাথে অপরে বিনিময় করে ভোগ করে যা অর্থ মূল্যে পরিমাপ হয়না।

দ্বৈত গণনার সমস্যা ও সমাধান

জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনার সমস্যা দেখা দেয়। দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে কোনটি মধ্যবর্তী ও কোনটি চূড়ান্ত তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে একই বিষয়ে দুবার গণনা হবে। কারণ চূড়ান্ত দ্রব্য মূল্যের মধ্যে মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত দ্রব্য উভয়ই গণনা করলে দ্বৈত গণনার সমস্যা দেখা দিবে।

মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী : যে দ্রব্য ভোক্তার হাতে চূড়ান্ত ভোগের জন্য পৌঁছায়। পুনরায় বিক্রয় বা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় না তাকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলে। অপর দিকে যে উৎপন্নদ্রব্য ভোগের পর্যায়ে না পৌঁছে পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন কাজে ব্যাবহৃত হয় বা যা বাজারে পুনঃবিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হয় তাকে বলে মধ্যবর্তী দ্রব্য। বস্ত্রকে চূড়ান্ত দ্রব্য রুপে চিহ্নিত করা যায়। তবে সুতাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে।

সেবা : চূড়ান্ত সেবা বলতে সেই সেবাকে বুঝানো হয় যা ভোক্তার নিকট ভোগের পর্যায়ে পৌঁছে। অপর দিকে মধ্যবর্তী উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। পরিবারের ঝি-চাকরের সেবা, ধোপা ও নাপিতের সেবা চূড়ান্ত সেবা রুপে গণ্য। অপরদিকে কোন ফার্মের ম্যানেজারের প্রদত্ত সেবা মধ্যবর্তী। কারণ তার সেবা ফার্মের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।

সমাধান : দ্বৈত গণনা সমস্যার থেকে পরিত্রাণের জন্য দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়।
১। চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি ২। মূল্য সংযোজন পদ্ধতি

চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি

এই পদ্ধতির দ্বারা জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করতে হলে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা এবং মাধ্যমিক দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্যকে সতর্কতার সংগে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্য হিসাব করা প্রয়োজন যেমন যখন বস্ত্রের আর্থিক মূল্য হিসাব করা হবেনা। কারণ সুতার মূল্য চূড়ান্তভাবে বস্ত্রের মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এভাবে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যকে হিসাব করে যে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় তাতে দ্বৈত গণনার সমস্যা থাকে না।

অনুশীলনী

একটি অর্থনীতিতে তিনটি চূড়ান্ত দ্রব্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য যথাক্রমে, ২৪, ২৯, ১৫ লক্ষ কেজি এবং ৬, ৭, ৮ টাকা। GNP কত?

মূল্য সংযুক্তি পদ্ধতি

উৎপাদন কাজে উপাদান নিয়োজিত হয়। একটি ক্ষেত্রে অপর ক্ষেত্র থেকে উপাদান ক্রয় ও নিয়োগ করে। উপাদান ক্রয়ের জন্য যে অর্থ খরচ হয় তা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সাথে পরবর্তীতে যুক্ত হয়। মূল্য সংযুক্তির সংজ্ঞা হল ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য থেকে ফার্মের বাইরের কোন যোগান দারের কাছে প্রাপ্ত মধ্যবর্তী দ্রব্যের খরচ বাদ দিলে যা থাকে তাই হল মূল্য সংযুক্তি। যে পদ্ধতির দ্বারা ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের চূড়ান্ত মূল্য থেকে মধ্যবর্তী দ্রব্যের মূল্যবাদ দেয়া হয় তাকে মূল্য সংযুক্তি পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত উৎপন্ন মূল্যকে খাজনা, মজুরী, সুদ, মুনাফা হিসাবে উপকরণগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়।

বস্ত্র উৎপাদনের একটি উদাহরণ দ্বারা নির্ণয় ব্যাখ্যা করা যায়। মনে করি, কোন দেশে তুলা উৎপাদনকারীগণ ২০০ কোটি টাকার তুলা উৎপাদনকারীর কাছে বিক্রি করল। সুতা উৎপাদনকারী ২৫০ কোটি টাকার সুতা উৎপাদন করে। তুলা থেকে সুতা উৎপাদন করতে সংযোজিত মূল্য হল (২৫০-২০০) = ৫০ কোটি টাকা। এরপর বস্ত্র উৎপাদনকারীগণ ২৫০ টাকার সুতা ক্রয় করে ৩৫০ কোটি টাকার বস্ত্র উৎপাদন করল, এখানে তুলা থেকে বস্ত্র উৎপাদন করতে গিয়ে মূল্য সংযুক্ত হল (৩৫০-২৫০) = ১০০ কোটি টাকা এই বস্ত্র যদি চূড়ান্ত ভোগ্য সামগ্রী হয় তবে তা ভোক্তার নিকট পৌঁছবে খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে, খুচরা বিক্রেতা চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত করল ৩৭৫ টাকা। এক্ষেত্রে মূল্য সংযুক্তি দাঁড়ায় ৫০ কোটি টাকা। সুতরাং উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোজিত মূল্যে যোগফলই চূড়ান্ত উৎপন্ন মূল্য। যেমন – ২০০+ ৫০+২০০+২৫ = ৩৭৫ = চূড়ান্ত উৎপন্ন মূল্য।

উদাহরণটিকে নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখান হল-

ফার্ম	উৎপাদক	উৎপাদিত দ্রব্য	উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য	মূল্য সংযুক্তি
১ম ফার্ম	তুলা উৎপাদক	তুলা	২০০	২০০
২য় ফার্ম	সুতা উৎপাদক	সুতা	২৫০	৫০
৩য় ফার্ম	বস্ত্র উৎপাদক	বস্ত্র	৩৫০	১০০
৪র্থ ফার্ম	বস্ত্রের খুচরা বিক্রেতা	খুচরা বিক্রয়	৩৭৫	২৫
			১১৭৫	৩৭৫

যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের দামকে যোগ করা হয় তবে GNP = ১১৭৫ কিন্তু এটা GNP হতে পারে না, কারণ এতে দ্বৈত গণনার সমস্যা আছে। প্রকৃত পক্ষে, GNP = ৩৭৫ = মূল্য সংযুক্তি = চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য।

অনুশীলনী

কোন দ্রব্য Y উৎপাদনের তিনটি স্তর আছে।

১। কাঁচামাল উৎপাদন ২। প্রক্রিয়াজাতকরণ ৩। চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন। প্রথম পর্যায়ে উৎপাদক ৫০০ টাকার কাঁচামাল উৎপাদন করল দ্বিতীয় পর্যায়ে কাঁচামালের প্রক্রিয়াজাতকরণে খাজনা ও মজুরী হিসাবে ৩০০+২০০ টাকা ব্যয় করল এবং ৩য় পর্যায়ে আরও খাজনা ও মজুরী দিয়ে ২০০০ টাকার দ্রব্য উৎপাদন করল। এখানে মোট মূল্য সংযুক্তি কত? ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ের মূল্য সংযুক্তি কত?

জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব

একটা দেশের সার্বিক অবস্থা জানতে হলে সেই দেশের জাতীয় আয় সর্ম্পকে জানা প্রয়োজন। কারণ জাতীয় সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিমাপক জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব ক্ষেত্রগুলি নিম্নরুপ :

১) **পরিকল্পনা প্রণয়ন :** জাতীয় আয় পরিমাপ থেকে একটা দেশের মোট ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাপ জানা যায়। পরিকল্পানাবিদগণ জাতীয় আয়ের মাধ্যমে এদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে না পারলে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হবেন।

২) **অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা :** সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা জানা যায় জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে বুঝতে হবে যে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় আয়ের সঠিক বৃদ্ধি না হলে বুঝতে হবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। কাজেই জাতীয় আয় পর্যালোচনার দ্বারা পরবর্তিতে সে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে নেয়া যায়।

৩) **অর্থনৈতিক গঠনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা :** জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব থেকে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং তাদের অবদান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

৪) **মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের তীব্রতা পরিমাপ :** জাতীয় আয়ের পরিমাপ থেকে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন (Inflationary gap & Diflationary gap) সম্পর্কে জানা যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের সাথে জড়িত সমস্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। সঠিক সমুচিত নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে এসব সমস্যা দূর করতে হলে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব জানা প্রয়োজন।

৫) **জীবনযাত্রার মান নির্ণয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা :** যেহেতু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় একটা দেশের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে তাই বিভিন্ন বছরের জাতীয় আয়ের মধ্যে তুলনা করে বলা যায় সে দেশের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে না হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে সে সমস্ত দেশের জীবনযাত্রার তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় পরিমাপের প্রচলিত পদ্ধতির সংখ্যা

ক. ৩ খ. ২

গ. ১ ঘ. ৪

২। নিচের কোন্‌টি জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত নয় –

ক. পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদন দ্রব্যের মূল্য

খ. সন্তানের প্রতি মায়ের সেবা

গ. চলতি বছরে শ্রমিকের পারিশ্রমিক

ঘ. শেয়ার ও বন্ড থেকে প্রাপ্ত আয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ কি কি?

২. কি কি বিষয় জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়না?

৩. জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কি কি সমস্যা দেখা দেয়?

miKvix A_©e¨e¯'v

BDwbU 2

cvV 1 : miKvix A_©e¨e¯'vi msÁv, miKvix I e¨w³MZ Avq-e¨q

D‡Ïk¨

GB cvV †k‡l Avcwb –

- miKvix A_©e¨e¯'vi msÁv w`‡Z cvi‡eb|
- miKvix A_©e¨e¯'vi ¸i€Z m¤ú‡K Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡eb|
- e¨w³MZ I miKvix Avq-e¨‡qi cv_©K¨ wb‡`k Ki‡Z cvi‡eb|

fwgKv

Avgiv Rwb †h, eZgvb we‡k GKwU †`‡ki mwweK Dbqb wbfi K‡i †m †`‡ki miKv‡ii `¶Zvi Dci| Avi miKvix `¶Zvi Ab¨Zg ¸i€Z GKwU w`K n‡ŽQ miKvix A\_©e¨e¯'v| A\_bxwZi Ab¨Zg ¸i€Zc• Y GKwU kvLv| Ebwesk kZvãxi †klfvM chš• miKvix Avq-e¨‡qi †Zgb †Kvb ¸i€Zc• Y fwgKv wQj bv| ZLb GKwU gRvi avi Yv cPwjZ wQj| Avi Zv nj Ò†h miKvi Kg kvmb K‡i †mB miKviB DËgÓ (The best government is that which governs the least)|Ó KwmK¨vj A\_bxwZwe`MY g‡b Ki‡Zb †h, A_%bwZK Kvh©Kjv‡c iv‡óªi n¯•‡¶c Kiv DwPZ bq| †`‡ki Af¨š•‡i kwš• I k•Ljv i¶v Kiv Gi ˆe‡`wkK kÎ€i AvµgY n‡Z †`k‡K i¶v KivB iv‡óªi cavb KvR| Zv‡`i g‡Z, ivó hZ Kg Avq K‡i Ges Kg e¨q K‡i ZZB †`‡ki c‡¶ g½jRbK| wKš eZgv‡b iv‡óªi Kvh©vejx m¤ú‡K c• ‡ei GB avi Yvi cwieZb N‡U‡Q| gvb‡li mwweK A\_%bwZK KgKv‡Ûi welqe¯' eZgv‡b miKv‡ii ¸i€Zc• Y Kv‡hi Aš•f³ n‡q‡Q| Avi ZvB miKvix A\_ e¨e¯'v n‡ŽQ `¶ miKv‡ii cwZdjb|

Abkxjbx 1

1. miKvixi Kvh©vejx‡Z A_ msµvš• wK wK welq _vK‡Z cv‡i e‡j Avcwb g‡b K‡ib?

msÁv

A_ e¨e¯'v‡K msÁwqZ Ki‡i Av‡M Avmb Avgiv miKvix A_e¨e¯'v wK wK w`K‡K Aš• f³ K‡i Zv †ei Kwi| j¶ Ki‡j †`Lv hv‡e †h, miKvix A_ e¨e¯'v wb‡æv³ welq¸‡jv Aš•f³ K‡i –

1. miKvix Avq ;
2. miKvix e¨q ;
3. FY msµvš• bxwZ ;
4. Aw_K bxwZ|

Zvn‡j wk¶v_xiv, Avgiv ej‡Z cwi †h, A_ kv‡¯¿• i †h kvLvq miKvix Avq-e¨q, Aw_K I FY msµvš• bxwZ I c×wZ wb‡q Av‡jvPbv Kiv nq Zv‡K miKvix A_e¨e¯'v (Public Finance) e‡j| A_vr GKwU †`‡ki miKvi wK wK †¶‡Î n‡Z wKfv‡e Avq Ki‡e, †Kvb †Kvb †¶‡Î wK c×wZ e¨q Ki‡e, †Kvb †Kvb †¶‡Î FY mweav †`qv †h‡Z cv‡i Ges Zvi bxwZ wbavi Y cfwZ KvRB miKvix A_e¨e¯'vq Aš•f³|

cL¨vZ A_bxwZwe` Wv÷b e‡jb, ÒmiKvix A_e¨e¯'v miKv‡ii Avq-e¨q Ges GKwUi m‡½ AbwUi mgšq m¤‡Ü Av‡jvPbv K‡i|Ó

¸i€Z

Avgiv Rwb †h, ivó cwiPvjbvi Rb¨ GKwU miKvi‡K †`k i¶vi cvkvcwk cvKwZK `‡hvM (eb¨v, Liv, `wf¶) †gvKwwejv, mgvR Kj¨vY Ges A_%bwZK Dbq‡bi Rb¨ A‡bK KvR Ki‡Z nq| G Rb¨B eZgv‡b miKvix A_e¨e¯'vi ¸i€Z h‡_ó ew× †c‡q‡Q| Avmb miKvix A_e¨e¯'vi ¸i€Z ew×i KviY¸wj Av‡jvPbv Kwi –

1. mvgwRK DcKvi : mgv‡R Ggb KZ¸wj KvR i‡q‡Q hv †Kvb e¨w³ ev cwZôvb GKKfv‡e †fvM bv K‡i mgwóMZfv‡e †fvM K‡i| KvR¸‡jv nj – cwZi¶v, wbivcËv, †mev, wk¶v cfwZ| G KvR¸‡jv m¤žv`b Ges wbqš•‡Yi fwgKv miKvi‡KB enb Ki‡Z nq|

2. GK‡PwUqv evRvi wbqš•Y : GK‡PwUqv Kvievixiv mvavi YZt AwaK gbvdv jv‡fi Rb¨ Drcv`b I g• j¨ wbqš•Y K‡i \_v‡K| Gi d‡j mgv‡R A\_%bwZK ˆel‡g¨i mwó nq, A\_vr m¤ž‡`i mô e¨enwi I Av‡qi mlg e›Ub e¨nZ nq| GB GK‡PwUqv Kvievi‡ii wejwß NwU‡q evRv‡i cwZ‡hwMZv mwói Rb¨ miKvi‡KB D‡`¨vMx n‡Z nq|

3. ewYR¨ Pµ wbqš•Y : AvawbKKv‡j miKvix Avq-e¨q GKwU †`‡ki A\_bxwZi Rb¨ we‡kl fwgKv iv‡L| ewYR¨P‡µi g›`vi mgq mgv‡R Avq, Drcv`b cfwZ nvm cvq| G Ae¯'vq miKvi e¨q ew× K‡i G Ae¯'v n‡Z mgvR‡K D×vi Ki‡Z cv‡i| Avevi ewYR¨ P‡µi mgw×i mgq miKvi e¨q nvm K‡i Ges Ki ew× K‡i fvimvg¨ wdwi‡q Avb‡Z cv‡i| mZivs ewYR¨P‡µi wbqš•‡Y miKvix A_e¨e¯'vi cPi fwgKv i‡q‡Q|

D`vniY¯^i|c ejv hvq †h, Avgv‡`i †`‡k Pv‡ji `vg †e‡o hvIqvq miKvi we‡kl e¨e¯'vq †ik‡bi gva¨‡g evRvi `v‡gi †P‡q Kg `v‡g Pvj mieivn Ki‡Q| GB fZwKB miKvix A_e¨e¯'vi Aš•f³|

4. Av‡qi mlg e›Ub : AvawbK ivó Av‡qi mlg e›Ub wbwðZ K‡i mgv‡R A_%bwZK b¨vqwePvi cwZôv K‡i| m¤ž‡`i Amg e›UbB mgv‡R Avq ˆelg¨ ew× K‡i| mZivs RvZxq Av‡qi cbe›Ub Ges Mixe‡`i ¶` F‡Yi e¨e¯'v wbwðZKi‡Yi gva¨‡g miKvi

Av‡qi mgZ e›Ub wbwðZ Ki‡Z cv‡i| Avgv‡`i †`‡ki miKvi I miKv‡ii mn‡hvwMZvq wewfb †emiKvix ms¯'v ev Gb.wR.I (NGO) ¶`ª FY (Micro Credit) cKí Pvj K‡i‡Q| d‡j `wi`ª †kYxi RbmvaviY G e¨e¯'vi gva¨‡g Zv‡`i Avq e„w× Ki‡Z cv‡i Ges mwweK Av‡qi e›Ub Avq mg n‡e|

5. A_‰bwZK w¯'wZkxjZv : evRvi e¨e¯'v memgq k• b¨¯• ‡ii w¯'wZkxjZv ev c• Y wb‡qvM ¯•i eRvq ivL‡Z cv‡i bv| G Ae¯'vq A_‰bwZK w¯'wZkxjZv eRvq ivLvi Rb¨ miKvi‡K wewfb Aw_K ivR¯^ bxwZ MnY Ki‡Z nq|

6. mIg Dbqb : mIg Dbq‡bi Afv‡e GKwU †`‡k AvÂwjK ˆelg¨i mwó nq Ges G‡Z K‡i A‡bK DcKiY Awb‡qwRZ _v‡K| †hgb – Avgv‡`i †`‡k wkí-KviLvbv XvKv †Kw›`ªK| Gi d‡j ewikv‡ji fwg, kg BZ¨w` DcKiY Ae¨eüZ †_‡K hvq| G Ae¯'vq miKvi‡KB D‡`¨vMx n‡q AvÂwjK Dbq‡bi avivi‡K AviI mIg Ki‡Z n‡e|

7. RbKj¨vYg• jK e¨q : Aw_K mvnvh¨ c`vb, †eKvi Kgnxb‡`i fvZv, eq¯‹Kvjxb fvZv cfwZ RbKj¨vYg•jK Kv‡R miKvi‡K wewfb e¨e¯'v MnY Ki‡Z nq|

8. A_‰bwZK Dbqb : Dbqbkxj †`kmg• ‡ni (†hgb – evsjv‡`k) mwweK fv‡M¨vbq‡bi Rb¨ `€Z A_‰bwZK Dbqb GKvš• c‡qvRb| Avi G A_‰bwZK KviYI e¨w³MZ chv‡q c‡ivcwi m¤e bq| miKvix A_e¨e¯'vi gva¨‡gB `€Z A_‰bwZK mgwׄ m¤e| mZivs G †_‡K Avgiv ej‡Z cwi †h, AvaywbK miKvi GK‡PwUqv Kvie‡ii wbqš• Y, evwYR¨ wbqš• Y, Av‡qi mIg e›Ub, A_‰bwZK w¯'wZkxjZv cfwZ KvR‡K ZiwšZ I we¯•Z Ki‡Z A_e¨e¯'vi ¸i€Z Acwimxg|

Abkxjbx 2

wb‡æv³ KvR¸‡jvi g‡a¨ †KvbwU miKvix A_ e¨e¯'vi Aš•f³ †ei Kivi †Póv Ki€b?

K. msm` wbevPb

L. exR wbgvY

M. e³Zv Kiv

N. nvmcvZvj wbgvY|

miKvix I e¨w³MZ A_e¨e¯'vi cv_K¨ :

c• eeZx Av‡jvPbv nj miKvix Avq-e¨‡qi chv‡jvPbv A_vr miKvix A_e¨e¯'v| Avi e¨w³i Avq-e¨‡qi chv‡jvPbv I c×wZ nj e¨w³MZ A_e¨e¯'v| hw`I Dfq‡¶‡Î A_ msµvš• ixwZbxwZ †gvUvgwU GKB, ZeI GB `B A_e¨e¯'vi g‡a¨ KZ¸wj †gŠwjK cv_K¨ i‡q‡Q| Avmb G¸‡jv GLb Avgiv we‡kIY Kwi –

1. Avq-e¨‡qi mvgÄm¨Zv : GKwU K_v Pvj Av‡Q ÒAvq e‡S e¨q KiÓ| G K_wU ïa e¨w³i †¶‡ÎB c‡hvR¨| A_vr †Kvb e¨w³i Avq †ewk n‡j Zvi e¨qI †ewk nq Avevi Avq Kg n‡j e¨qI Kg nq| wKš miKvi c_‡g Zvi e¨‡qi LvZ¸‡jv wbavviY K‡i| c‡i †mB e¨q Abhvqx miKvi Avq nvm-ew× K‡i| Zvn‡j `vovq †h, e¨w³ Zvi Avq e‡S e¨q K‡i Avi miKvi e¨q e‡S Avq K‡i|

2. F‡Yi Drm : miKvix chv‡q miKvi †`‡ki Af¨š• ixY e¨vsK QvovI we‡ki Ab¨vb¨ ms¯'v †hgb – wek e¨vsK, IMF, DbZ †`k (h³ivó, KvbvWv) n‡Z FY mweav †fvM

Ki‡Z cv‡i| wKš GKRb e¨w³i FY wb‡Z n‡j †`‡ki Avf¨š• ixY wewfb Aw_K cwZôvb, Mvg¨ gnvRbx c_v cfwZ n‡Z FY wb‡Z nq|

3. ev‡R‡Ui cKwZ : Avq hw` e¨‡qi †P‡q †ewk nq Z‡e mÂq Kiv m¤e| Avi GB ev‡RU‡K ejv nq DØË ev‡RU| e¨w³i †¶‡Î DØË ev‡RU g½jRbK wKš NvUwZ ev‡RU fvj bq| miKv‡ii †¶‡Î I DØË ev‡RU fvj| wKš Zv hw` RbM‡Yi Dci Aw_K Ki avh K‡i A_ev Dbqbg• jK ev †mevg• jK KvR cwiZ¨vM K‡i DØË ev‡RU mwó Kiv nq Z‡e Zv mg_b‡hvM¨ bq| miKv‡ii †¶‡Î c‡qvR‡b NvUwZ ev‡RU MnY‡hvM¨| KviY miKv‡ii Avq ew×i m‡hvM _v‡K|

4. cwš• K Dc‡hvM : e¨w³ Ggbfv‡e LiP K‡i †hb cwZwU n‡Z Zvi c‡qvRb Abhvqx Dc‡hvM cvq| A_vr mgvb cwš• K Dc‡hvM jvf K‡i| wKš miKvi‡K †`‡ki Kj¨v‡Yi w`‡K j¶¨ †i‡L e¨q K‡i e‡j †Kv_vI cwš• K Dc‡hvM A‡c¶vKZ Kg Avevi †Kv_vI †ewk nq|

5. Avq wbwZ¯vcKZv : †Kvb e¨w³i Av‡qi Drm wbw`ó _v‡K| A_vr PvKwi, e¨emv BZ¨vw`| wKš miKv‡ii Av‡qi Drm wbw`ó bq| miKvi c‡qvRb‡ev‡a evov‡Z ev Kgv‡Z cv‡i| ZvB Avgiv ej‡Z cwi, miKv‡ii Av‡qi Drm wbwZ¯vcK wKš e¨w³i †¶‡Î Zv Kg wbwZ¯vcK|

6. †bvU Qvcv‡bv : miKvi Aw_K c‡qvR‡b †bvU Qvcv‡Z cv‡i| wKš e¨w³i †¶‡Î GB m‡hvM †bB|

7. mgqmxgv : miKvix ev‡RU mvaviYZ GK erm‡ii Rb¨ ˆZwi Kiv nq| cwZ ermi miKvi Zvi Avq-e¨‡qi ZwjKv c¯Z K‡i ev‡RU cYqb K‡i| wKš e¨w³ Pvq gwmK wn‡me ˆZwi Ki‡Z| KviY e¨w³ gwmKfv‡e Avq K‡i Avi miKvi K‡i evrmwiK wfwË‡Z|

8. †MvcbxqZv : miKvi hLb Zvi A_ e¨e¯v A_vr ev‡RU †NvlYv K‡i ZLb Zv †Uwjwfkb, †iwWI, cwÎKv cfwZ cPvi gva¨g Øviv cKvk Kiv nq| GB ev‡R‡Ui Dci Av‡jvPbv, †mwgbvi, wm‡¤žwRqvg cfwZ nq| wKš e¨w³i †¶‡Î Zvi Avq-e¨‡qi wn‡me c‡ivcwi †Mvcb ivLv nq| e¨w³ B‡ŽQ Ki‡j Zv cKvk Ki‡Z cv‡i| Z‡e †Kvb e¨w³i wei€‡× m‡›`n cKvk Ki‡j Zvi Avq-e¨‡qi wnmve cKvk Kiv nq| Z‡e mvaviYZt e¨w³i Avq †Mvcbxq, c¶vš•‡i miKvix Avq cKvk¨|

9. Kv‡ji ¸i€Z : e¨w³ fwel¨r A‡c¶v eZgvb‡K †ewk cvavb¨ †`q| KviY fwel¨‡Z †m Avi bvI evP‡Z cv‡i| wKš miKv‡ii cwZwU c`‡¶cB fwel¨‡Zi Rb¨ A_vr miKvi †`k I RwZi fwel¨r Kj¨v‡Yi Rb¨B e¨q K‡i| miKvi cwiewZZ n‡j Zvi KvR AcwiewZZ _v‡K Ges †mB Kv‡Ri Dc‡hvM H miKv‡ii Aš•f³ †jvKRbI cieZx‡Z †fvM K‡i|

10. Avq-e¨‡qi j¶¨ : e¨w³MZ Avq-e¨‡qi j¶¨ gbvdv ARb ev Avq ew×| c¶vš• ‡i miKvix A_ e¨e¯vi j¶¨ nj mvgwRK Kj¨vY| mZivs e¨w³ gbvdv ARbKvix (Profit making) cwZôvb Avi miKvi mvgwRK Kj¨vYgLx (Social welfare) cwZôvb| Zvn‡j Avgiv eSjvg †h, miKvix I e¨w³MZ A_e¨e¯vi A_ msµvš• ixwZ-bxwZ GK nIqv m‡Ë I G‡`i g‡a¨ A‡bK †gŠwjK cv_K¨ i‡q‡Q|

chv‡jvPbv :

miKvix A_©e¨e¯'v miKv‡ii Avq-e¨‡qi wnmve|
miKvix A_©e¨e¯'v PvwiwU welq Aš— f³ K‡i †hgb – miKvix e¨q, Avq, FY msµvš— bxwZ, Avw_©K bxwZ|
miKvix A_©e¨e¯'vi ¸i€Z eZgv‡b A‡bK ewo †c‡q‡Q|

cv‡VvËi g~j¨vqb

^be©¨w³K ck

1| miKvix A_©e¨e¯'vi Av‡jvP¨ welqe¯' †KvbwU bq?
K. miKvix Avq L. e¨w³MZ Avq
M. FY msµvš— bxwZ N. Avw_©K bxwZ

2| cwj‡ki wbivcËv †mev wK ai‡bi miKvix A_©e¨e¯'vq c‡o?
K. mvgwRK DcKvi L. A_©%bwZK DcKvi
M. ewYwR¨K DcKvi N. †KvbwUB bq|
3| ewYR¨P‡µi mgwóI mgq miKvi wK c`‡¶c MnY K‡ib?
K. e¨q nvm K‡i L. Ki ewo K‡i
M. †KvbwUB bq N. DfqB|
4| Ô¶`ª FYÕ cK‡íi `i€Y †Kvb A_©%bwZK ceo †ekx AwRZ nq?
K. A_©%bwZK w¯'wZkxjZv L. GK‡PwUqv evRvi wbqšY
M. Av‡qi mlg e›Ub N. mlg Dbqb|
5| †KvbwU e¨w³MZ F‡Yi Drm bq?
K. wkí e¨vsK L. †mvbvjx e¨vsK
M. evsjv‡`k Kwl e¨vsK N. wek¦ e¨vsK

msw¶ß ck

1| miKvix A_©e¨e¯'v wK? miKvix A_©e¨e¯'vi ¸i€Z Av‡jvPbv Ki€b|
2| miKvix I e¨w³MZ A_©e¨e¯'v ej‡Z wK eSvq? G‡`i g‡a¨ cv_©K¨ wK wjLb|
3| ÒmiKvix A_©e¨e¯'v `¶ miKv‡ii cwiZdjbÓ weewZwU e¨vL¨v Ki€b|

mgm¨v 1 :

bx‡Pi mgm¨wU chv‡jvPbv Ki€b –
nVvr K‡i †`‡k cPÛ eb¨v nj| miKvi GB Ri€ix Ae¯'v †gvKwe jv Kivi Rb¨ wKQ UvKv e¨q Kij| GLb GB AwZwi³ A‡_©i †hvMvb miKvi wKfv‡e Ki‡e Avi miKvix A_©e¨e¯'vi gva¨‡g wKfv‡e cbivq fvimvg¨ Ae¯'vq DcbxZ nIqv hv‡e e¨vL¨v Ki€b|

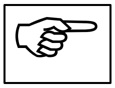

cvV - 2 : miKvix e¨‡qi c‡qvRbxqZv

D‡Ïk¨

G cvV †k‡l Avcwb –

- miKvix e¨q wK Zv ej‡Z cvi‡eb|
- miKvix e¨‡qi †kYxwefvM Ki‡Z cvi‡eb|
- miKvix e¨‡qi LvZmg~‡ni Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡eb|
- miKvix e¨‡qi ¸i€Z I c‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|

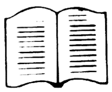

miKvix e¨q (Public expenditure) :

Avmb wk¶v_xiv, K‡qKwU Ae¯'vi K_v wPš•v Kwi –

1| <u>iv¯•v</u> w`‡q †n‡U †Kv_vI hwŽQ|

2| iv‡Zi †ejv <u>÷xU jvBU</u> (Street Light) Gi Av‡jvq c_ PjwQ|

3| BRTC evm ev †U‡b K‡i XvKv †_‡K <u>PÆMvg</u> hwŽQ|

4| Am¯' eÜ‡K <u>XvKv †gwWK¨vj</u> K‡j‡R wb‡q hwŽQ|

5| †QvU fvB‡K GKwU <u>miKvix K‡j‡R</u> fwZ KiwŽQ|

6| wbivcËvi Rb¨ <u>cwj‡ki</u> Avkq wbwŽQ|

GLb Avmb bx‡P `vM †`qv kã¸wji K_v wPš•v Kwi †hgb : iv¯•v, Street, Light, BRTC, XvKv †gwWK¨vj, miKvix K‡jR, cwjk| Gi g‡a¨ †KvbwU e¯'RvZ Avevi †KvbwU †mevRvZ| GLb Avmb wPš•v Kwi G¸‡jv †K ˆZix K‡i‡Q? wbðqB miKvi|
Zvn‡j Avgiv ej‡Z cwi, †`‡ki Af¨š•‡i kwš• k•Ljv eRvq, ewntkÎ€i AvµgY n‡Z †`k‡K i¶v Ges wewfb Dbqbg~jK I RbKj¨vYg~jK e¯'RvZ I †mevRvZ Kv‡Ri Rb¨ miKvi †h e¨q K‡i ZvB miKvix e¨q|
AvawbK ivó AvBb k•Ljv i¶vi cvkvcwk wk¶vi cmvi, Rb¯^v¯'¨ mvgwRK wbivcËv, RbKj¨vY, ckvmb, A_%bwZK cwiKíbv cfwZ Lv‡Z e¨q K‡i _v‡K| GB me e¨qB n‡ŽQ miKvix e¨q|

Abkxjbx 1

`kwU †¶‡Î miKvix e¨‡qi K\_v wPš•v Ki€b| G‡`i g‡a¨ †KvbwU Avcbvi Kv‡Q ¸i€Zc~Y© e‡j g‡b n‡ŽQ wjLb|

miKvix e¨‡qi †kYxwefvM :

miKvix e¨q A‡bK iKg n‡Z cv‡i| †hgb – wk¶vLvZ, †mbvewnbx, wkíLvZ, ¯'vbxq ckvmb, ewYR¨ Pµ †iva, fZwK cfwZ| GB me¸‡jv †¶‡Î wbðqB GKiKg bq| Avmb Avgiv wb‡Pi ZwjKv †_‡K miKvix e¨‡qi cKvi‡f` m¤ž‡K aviYv wbB –

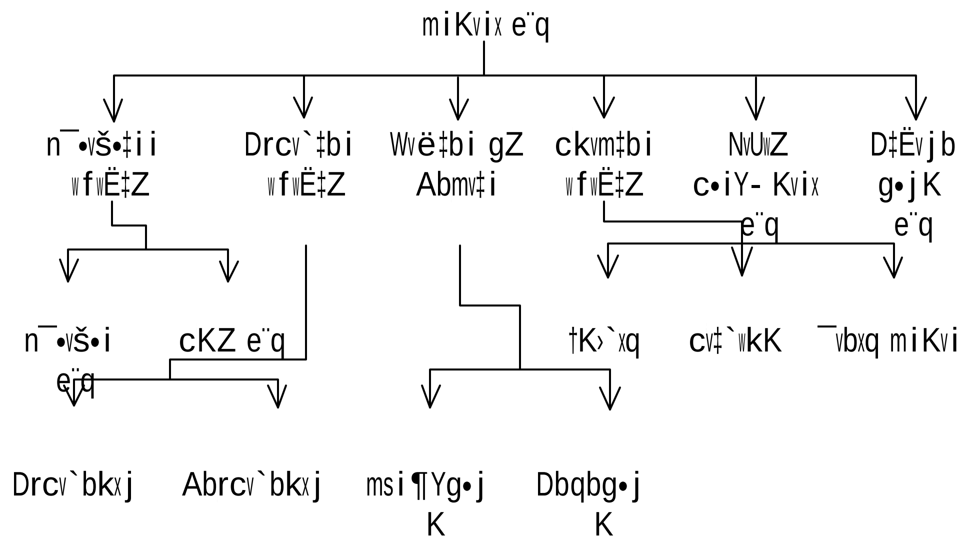

Gevi Avmb Avgiv †kYxwebʼvm¸wj Av‡jvPbv Kwi –

n¯• vš• ‡ii wfwË‡Z Avgiv miKvix e¨q‡K `Õfv‡M fvM K‡iwQ – n¯• vš• i‡hvM¨ e¨q I cKZ e¨q|

miKvi‡K miKvix FY cwi‡kva ev F‡Yi m` c`vb Ki‡Z nq| GB e¨‡qi d‡j µq¶gZv ev m¤ž` Ki c`vbKvixi wbKU n‡Z FY`vZv‡`i wbKU n¯• vš• i nq gvÎ| Zvn‡j Avgiv cwi †h, miKvix e¨‡qi d‡j m¤ž` Ki`vZvi wbKU n‡Z FY c`vbKvixi wbKU n¯•vš•i nq e‡j G‡K n¯•vš•i e¨q e‡j|

c¶vš• ‡i, hLb h× nq ev eb¨v nq ZLb miKvi †h e¨q K‡i Zvi Dc‡hvM wbt‡kl n‡q hvq| A_vr †h mKj e¨‡qi d‡j m¤ž‡`i Dc‡hvM m¤ž• Y webó n‡q hvq Zv‡K cKZ e¨q e‡j|

Drcv`bkxjZvi wfwË‡Z miKvix e¨q `B cKvi – Drcv`bkxj I Abrcv`bkxj| wk¶v, ¯v¯¨, wkí BZ¨w` Lv‡Z e¨q K‡i fwel¨‡Z Avq ew× m¤e| ZvB G¸‡jv Drcv`bkxj e¨q| A_vr †h mKj e¨‡qi gva¨‡g miKvi fwel¨‡Z Avq ew× Ki‡Z m¶g Zv‡K Drcv`bkxj e¨q e‡j|

c¶vš• ‡i, †h mg¯• e¨‡qi d‡j fwel¨‡Z Avq ew×i †Kvb m¤vebv †bB Zv‡K Abrcv`bkxj e¨q e‡j| †hgb – h‡×i e¨q|

Avf¨š• ixY k• Ljv eRvq ivLvi Rb¨ Ges ewnivµgY n‡Z wbivcËvi Rb¨ †h e¨q nq ZvB msi¶Y e¨q| †hgb – †mbvewnbx, cwjk, †Rj, wePvi wefvM BZ¨w`i Rb¨ e¨q| Avevi wkí, ewYR¨, wk¶v, ¯v¯¨, †hvMv‡hvM, A_%bwZK cwiKíbv cfwZi Rb¨ †h e¨q Zv Dbqbg•jK e¨q| A_vr mvgwRK DbqbK‡í e¨qB n‡ŽQ Dbqbg•jK e¨q|

ckvmwbK wfwË‡Z :

ckvmwbK w`K n‡Z miKvix e¨q wZb iKg| †K›`xq miKvi KZK †h A_ e¨q Kiv nq ZvB †K›`xq e¨q Ges cv‡`wkK miKvi KZK †h A_ e¨q nq Zv‡K cv‡`wkK e¨q e‡j|

GQvov BDwbqb KvDwÝj, wgDwbwmc¨vwjwU cfwZ ¯vqËkwmZ cwZôvbmg• n KZK †h A_ e¨q nq ZvK ¯vbxq e¨q e‡j|

Avgiv Rwb †h, miKv‡ii Ab¨Zg cavb j¶¨ nj †`‡k o Y Kgms¯vb eRvq ivLv| GRb¨ miKvix I †emiKvix Lv‡Z e¨‡qi mgšq mvab Kiv c‡qvRb| hLb †emiKvix Lv‡Z e¨‡qi cwigvY nvm cvq ZLb †mB NvUwZ o i‡Yi Rb¨ miKvix Lv‡Z e¨q ew× Ki‡Z nq| KviY G Ae¯vq miKvix e¨‡qi cwigvY ew× bv Ki‡j `vg¨• i, Avq I Kgms¯vb K‡g hvq| G Ae¯vq †emiKvix Lv‡Z NvUwZ c• i‡Yi Rb¨ miKvi‡K †ekx A_ e¨q Ki‡Z nq| GB RvZxq e¨qB nj NvUwZ c• iY e¨q| Avevi `vg¨• i nv‡mi `i€Y hLb A_%bwZK Kvhvej x nvm cvq Ges †eKvi mgm¨v †`Lv †`q ZLb miKvi e¨q ew× K‡i `vg¨• i c• ‡ei Ae¯vq wdwi‡q Av‡b Ges djk€wZ‡Z Kgms¯vb ew× cvq| Avi GUvB n‡ŽQ D‡Ëvjbg•jK e¨q|

Abkxjbx 2

Abkxjb 1G †bqv LvZmg• ‡ni g‡a¨ †KvbwU †Kvb †kYx‡Z c‡o, wjLb Ges KviY `kvb|

miKvix e¨‡qi LvZmg•n :

miKvix e¨‡qi LvZmg•n‡K mvaviYfv‡e `ÔfvM wef³ Kiv hvq –

K. PjwZ e¨q I

L. g•jabx e¨q|

cwZwU †`‡ki miKvi wewfb LvZ n‡Z ivR¯ Av`vq K‡i| G ivR¯ Av`vq Kivi Rb¨ Dnvi mv‡_ mswkó e¨w³ ev cwZôv‡bi LiP eve` †h e¨q nq ZvB ivR¯ e¨q| †hgb – mvaviY ckvmb| G e¨qB nj PjwZ e¨q| Avi GKwU †`‡ki AeKvVv‡gvMZ Dbqb †hgb – iv¯• vNvU, Mv‡gvbqb, ¯v¯¨ cfwZ Lv‡Z †h e¨q nq ZvB g• jabx e¨q| G e¨q‡K Dbqbg•jK e¨qI ejv nq| †hgb –

1995/96 mv‡j Avgv‡`i †`‡ki †gvU ivR¯ e¨q 4095 †KwU UvKv Ges †gvU Dbqb e¨q 12100 †KwU UvKv| Gevi Avmb miKvix e¨‡qi mvaviY LvZ wb‡q Av‡jvPbv Kwi –

1. cwZi¶v I AvBb k•Ljv :

AvawbK h‡M cwZi¶v miKvix e¨‡qi Ab¨Zg cavb Drm| miKvi Af¨š• ixY k•Ljv i¶v Ges ewntkÎ€i AvµgY n‡Z †`ki¶vi Kv‡R wb‡qwRZ mvgwiK ewnbx I cwjk ewnbxi cwiPvjbvi Rb¨ GKwU ¸i€Zc•Y Ask e¨q K‡i|

1995/96 mv‡j mvgwiK Lv‡Z eiv‡Ïi cwigvY 1935 †KwU UvKv|

mvaviY ckvmb : †`‡ki kvmbKv‡hi mô I ¯vfwweK ivL‡Z mvaviY ckvm‡bi D™e| gš• Yvjq, Kv‡j±‡iU, †Rjv cwil` BZ¨w` mvaviY ckvm‡bi Aš• f³| Avgv‡`i †`‡k 95/96 bvMv` G Lv‡Z e¨‡qi cwigvY 310 †KwU UvKv|

wePvi wefvM : †`‡ki Af¨š•‡i b¨vqwePvi cwZôvi Rb¨ wePvi wefvM Acwinvh| Gi mwweK ZËveavb miKv‡ii e¨‡qi GKwU cavb LvZ|

wk¶v I cwk¶Y : cwZwU †`‡k miKvix I †emiKvix Dfqfv‡eB wewfb wk¶v I cwk¶Y cwZôvb M‡o †Zvjv nq| GKB cwZôvb¸‡jvi LiP, wk¶K‡`i †eZb, eË c`vb cfwZ

Kv‡Ri e¨q miKvi‡KB enb Ki‡Z nq| 95/96 mvj bvMv` evsjv‡`k G LiP 1605 †KvwU UvKv|

Dbqbg• jK KvR : Kvw I wbqš¿Y, wkí, kw³ m¤ž`, ¯v¯', Kgms¯vb cfwZ AeKvVv‡gvg• jK KvR Gi AvIZvq c‡o| 95/96 mvj bvMv` G Lv‡Z evsjv‡`‡ki †gvU LiP 12100 †KvwU UvKv|

Ab¨vb¨ : Dc‡iv³ LvZmg• n Qvov I miKvi ¯v¯' I cwievi cwiKíbv, cvKwZK `‡hvM, †eKvi fvZv, e×Kvjxb fvZv cfwZ Lv‡Z e¨q K‡i _v‡K|
95/96 mvj bvMv` ¯v¯' I cwievi cwiKíbv Ges cvKwZK `‡hvM †iva K‡í evsjv‡`‡ki e¨q h_vµ‡g 986 †KvwU UvKv Ges 37 †KvwU UvKv|

Abkxjbx 3
Avgv‡`i miKvix e¨‡qi cavb LvZ †KvbwU? 5wU Lv‡Zi e¨‡qi cwigvY (95/96) †ei Ki€b Ges G‡`i g‡a¨ Li‡Pi Zjbvg•jK cv_K¨ †ei Ki€b|

miKvix e¨‡qi ¸i€Z I c‡qvRbxqZv :

eZgvb we‡k miKvix e¨‡qi ¸i€Z Acwimxg| µgeagvb A_bxwZ‡Z `wqZ cvj‡bi Rb¨ miKvi‡K wecj A_ e¨q Ki‡Z nq| GKwU †`‡ki A_bxwZ‡K miKvix e¨q bvbvfv‡e cfvewšZ K‡i| Avmb Gevi A_bxwZi Dci miKvix e¨‡qi cfve¸‡jvi cKvi‡f` Av‡jvPbv Kwi|

c_gZt Drcv`‡bi Dci miKvix e¨‡qi cfve wZbfv‡e wePvi Kiv hvq| †hgb –

K. K‡gv`¨g I mÂ‡qi ¶gZv

L. K‡gv`¨g I mÂ‡qi ¯žnv

M. m¤ž‡`i wewb‡qv‡Mi w`K cwieZb|

wk¶v, ¯v¯' cfwZ Dbqbg• jK Kv‡R miKvi A_ e¨q Ki‡j gvb‡li Drcv`b ¶gZv ew× cvq| d‡j †gvU Drcv`b ev‡o Ges mÂ‡qi ¶gZvI ew× cvq| Avevi cwk¶K‡`i bvbv iKg m‡hvM-mweav `v‡bi Rb¨ Ges †ivMvµvš¿ ev Ab¨ †Kvb AvKw¯§K Kvi‡Y K‡g AcviM n‡j Zvi Rb¨ miKvi hw` A_ e¨q K‡i Zvn‡j kwgK‡`i Kg¯žnv ew× cvq| G‡Z K‡i mÂ‡qi ¯žnvI ev‡o| G n‡Z ejv hvq †h, Aemi ev †eKvi fvZv A‡bK mgq kwgK‡`i mÂq ¯žnv Kwg‡q †`q|

miKvi A‡bK mgq wkí‡¶‡Î we‡kl fZwK w`‡q _v‡K| †h wkí cwZôvb Kg m‡hvM jvf K‡i‡Q Dnv‡`i Aw_K mvnvh¨ w`‡q ev miKvi wb‡RB H mg¯• wkí M‡o Zj‡Z Zrci nq| GB iKg e¨‡qi d‡j Drcv`‡bi DcKiY GK e¨envi n‡Z m‡i wM‡q Ab¨ e¨env‡i wbh³ nq| G‡Z K‡i A_bxwZ‡Z fvimvg¨ i¶v cvq|

wØZxqZ : GLb Avmv hvK, †eKvi fvZv, eq¯‹Kvjxb fvZv, wk¶v fZwK cfwZ D‡Ï‡k¨ e¨wqZ A‡_i ms¯vb nq †Kv_v n‡Z? abx‡`i wbKU n‡Z A_ msMn K‡i Zv Gfv‡e ew›UZ nq| d‡j mgv‡Ri e›Ub e¨e¯v mIg _v‡K| e›Ub e¨e¯v mIg Kivi Rb¨ †h e¨w³ hZ Mixe n‡e ZZ AwaK nv‡i iv‡ói wbKU n‡Z Zvi Aw_K mvnvh¨ cvIqv DwPZ|

ZZxqZ : mgv‡Ri mwweK Avq I Kgms¯v‡bi Dci miKvix e¨‡qi cfve i‡q‡Q| e¨w³MZ †¶‡Î †gvU e¨‡qi Øviv †mB dvK c• iY Ki‡Z cvi‡j mgv‡R c• Y Kgms¯vb eRvq ivLv hvq| ewYR¨P‡µi NvUwZ ev DØ‡Ëi †h AmvgÄm¨Zvi mwó nq miKvix A_

e¨e¯'vi Øviv †m fvimvg¨ wdwi‡q Avbv hvq Ges mgv‡R RvZxq m¤ž‡`i c• Y e¨envi K‡i c•Y Kgms¯'vb eRvq ivLv hvq|

mZivs †`‡ki we`¨gvb †eKvi mgm¨v, ab-‰elg¨, g`vùxwZ, g`vms‡KvPb cfwZ A_‰bwZK msK‡Ui mgvavbK‡í miKvix e¨‡qi fwgKv Acwimxg| `¶, mcwiKwíZ Ges mcwiPwjZ miKvix e¨‡qi gva¨‡g †Kvb †`‡k we`¨gvb A_‰bwZK mgm¨vi mgvavb Kiv m¤e|

Abkxjbx 4

miKv‡ii 5wU e¨‡qi LvZ wjLb| G LvZ¸‡jvq we`¨gvb mgm¨v †ei Ki€b Ges †¶Î¸wj‡Z miKvix e¨‡qi c‡qvRb Av‡Q wK bv Zv wjLb|

chv‡jvPbv :

miKvix e¨q g•jZt Qq ai‡bi|
¯'v¯'¨, wk¶v n‡ŽQ Drcv`bkxj e¨q|
h×Kvjxb e¨q n‡ŽQ Abrcv`bkxj e¨q|
miKvix e¨‡qi `wU LvZ
K. PjwZ e¨q, L. g•jabx e¨q|

ivR¯' e¨q n‡ŽQ PjwZ e¨q|
Dbqb e¨q n‡ŽQ g•jabx e¨q|
mgv‡R c•YKgms¯'vb, Av‡qi mgZv cfwZ Kv‡R miKvix e¨q h‡_ó cfvekvjx DcKiY|

cv‡VvËi g•j¨vqb

ˆbe©w³K ck :

1. †KvbwU cKZ e¨q?
   - K. wk¶v e¨q — L. ¯'v¯'¨ e¨q
   - M. h× e¨q — N. ckvmb e¨q|
2. †Kvb msi¶Y e¨q?
   - K. g`v msi¶‡Yi Kv‡R wb‡qwRZ UvKkvj Gi Rb¨ ¸`vg LiP|
   - L. †`‡ki gRZ ivLvi Rb¨ ¸`vg LiP
   - M. cwZi¶v e¨q
   - N. wk¶v e¨q
3. †K›`xq e¨‡qi Aš•f ³ †Kvb e¨q?
   - K. ivócwZi e¨q — L. g•j¨wfwËK e¨q
   - M. Dfq e¨q — N. GKwUI bq|
4. ckvmwbK w`K n‡Z miKvix e¨q KZ cKvi?
   - K. 1 cKvi — L. 2 cKvi
   - M. 3 cKvi — N. 4 cKvi
5. evsjv‡`‡ki miKvix e¨‡qi cavb LvZ †KvbwU?
   - K. ckvmb — L. mvgwiK
   - M. wePvi wefvM — N. wk¶v

msw¶ß DËi ck :

1. miKvix e¨q wK? wewfbœ cKvi miKvix e¨‡qi eYbv wjLb|
2. miKvix e¨‡qi LvZmg~n Av‡jvPbv Ki€b|
3. miKvix e¨q Kv‡K e‡j? Gi ¸i€Z e¨vL¨v Ki€b|

mgm¨v 2 :
1997/98 mv‡ji ev‡RU †`Lb| AMÖwaKvi wfwË‡Z miKvix e¨‡qi `kwU LvZ †ei Ki€b| GLb GB LvZ¸‡jv‡K ¸i€Z †`qvi (AMÖwaKv‡ii µg Abmv‡i) KviY¸wj e¨vL¨v Ki€b|

cvV 3 : miKvix Av‡qi Drm

D‡Ïk¨

G cvV †k‡l Avcwb –

- miKvix Avq ej‡Z wK eSvq Zv ej‡Z cvi‡eb|
- miKvix Av‡qi Drmmg~n eYbv Ki‡Z cvi‡eb|
- Drmmg~‡ni cKvi‡f` Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡eb|

msÁv :

c~eeZx cv‡V Avgiv miKv‡ii wewfb e¨qe¨e¯v wb‡q Av‡jvPbv K‡iwQ| GLb ck n‡ŽQ miKvi GB me e¨q wbevn Kivi Rb¨ c‡qvRbxq A_ †Kv_vq cvq? wPš• v K‡i †`Lb, Avcbvi evoxi cv‡ki iv¯• v wbgv‡Yi Rb¨ miKvi †h e¨q K‡i Zv‡Z Avcwbl Ask †bb wKbv| wbðqB lB A‡\_i Avcwbl Askx`vi| Zvn‡j Avcbvi A_ wKfv‡e miKv‡ii Kv‡Q †Mj? Aek¨B Zv K‡ii gva¨‡g| Zvn‡j Avcwb miKvix A_ w`‡ŽQb| Avi Avcbvi †`qv A_B n‡ŽQ miKvix Avq| GBfv‡e RbM‡Yi Dci Ki avh K‡i Ges Ab¨vb¨ Dcv‡q †h A_ msMn K‡i Zv‡K miKvix Avq e‡j|

miKvix Av‡qi Drmmg~n‡K `ôfv‡M fvM Kiv hvq :

K. Ki n‡Z Avq, L. Ki ewnf Z Avq|

Ki n‡Z miKvi †h ivR¯ msMn K‡i Zv Ki Avq Ges Ab¨vb¨ Drm n‡Z †h Avq nq Zv Ki ewnf Z Avq|

miKvix Av‡qi Drmmg~n :

miKvix Av‡qi Drmmg~n Av‡jvPbv Ki‡Z n‡j c_‡g Avgv‡`i Ki n‡Z Avq wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Z n‡e|

miKvix ivR‡¯i enËg Ask Ki n‡Z MnxZ| GB Ki c`v‡bi wewbg‡q RbMY †Kvb cZ¨¶ mweav `vex Ki‡Z cv‡i bv| miKvix Lv‡Z wewb‡qvM ew× I ivR¯ NvUwZ wbqš• ‡Y ivLvi gva¨‡g `€Z A\_%bwZK cew× AR‡bi j‡¶¨ ivR¯ Avq ew×i †Kvb weKí †bB| eZgvb Avš• RwZK cwiw¯wZ‡Z ^e‡`wkK m¤ž‡`i cevn nvm cvIqvq ivR¯ Av‡qi ¸i€Z h‡\_ó ew× †c‡q‡Q| evsjv‡`‡ki 1997/98 mv‡ji ev‡RU Abhvqx Ki n‡Z †gvU Avq 16153 †KwU UvKv|

miKv‡ii Ki n‡Z Av‡qi g‡a¨ AvqKi, Avg`vbx-ißvbx ïé, AveMvix ïé, g~j¨ ms‡hvRb Ki, m¤ž•iK ïé, ÷¨v¤ž weµq, †iwRóxKiY cfwZ D‡jL‡hvM¨|

Abkxjbx 1

Dc‡i ewYZ K‡ii †¶Î¸‡jv eYbv Ki€b|

Gevi Avmb Ki ewnfZ Avq¸wj wb‡q Av‡jvPbv Kwi| Ki e¨ZxZ Ab¨vb¨ Drm n‡Z †h Avq nq ZvB Ki ewnfZ Avq| 97/98 mvj bvMv` evsjv‡`‡k Ki ewnfZ Avq 3471.24 †KwU UvKv|

Gi g‡a¨ i‡q‡Q –

wd : miKvi †Kvb e¨w³‡K †Kvb we‡kl mweav `v‡bi wewbg‡q Zvi wbKU n‡Z †h A\_ Av`vq K‡i ZvB wd| †hgb – †KvU wd, †iwR‡ókb wd BZ¨vw`| Ki I wd wKš GK bq| Ki eva¨Zvg•jK wKš wd eva¨Zvg•jK bq|

ewYwR¨K Avq : miKvix wewfb e¨emvq cwZôvb †hgb – †ij wefvM, WvK I Zvi wefvM, miKvix cwZôvb cfwZ n‡Z †h Avq ZvB ewYwR¨K Avq| ewYwR¨K Avq miKvix Av‡qi GKwU eo Ask|

Rwigvbv : AvBb k• Ljv f½Kvix‡`i KvQ n‡Z kw¯•¯i¦c ev ¶wZc• iY eve` †h A_ Av`vq K‡i ZvB Rwigvbv| Ki I Rwigvbv DfqB eva¨Zvg• jK| Z‡e Rwigvbv ïagvÎ Acivax‡`i †¶‡Î eva¨Zvg•jK|

miKvix m¤žwË : miKvix m¤žwË †hgb – Lvj, wej, b`x, eb BZ¨vw` jxR (wVKv †`qv) w`‡q miKvi cPi A_ DcvRb K‡i|

we‡kl Ki : hw` †Kvb GjvKvi Dbqbg• jK KvR †hgb – iv¯•vNvU, we`¨r BZ¨vw` m¤žw`Z n‡j H GjvKvi Rwgi `vg †e‡o hvq| GB `vg ew×‡Z Rwgi gwj‡Ki †Kvb Ae`vb †bB| GB Kvi‡Y Rwgi gwj‡Ki wbKU n‡Z †h AwZwi³ A\_ Av`vq Kiv nq ZvB we‡kl Ki| mZivs †Kvb Dbqbg• jK Kgm• Px ev¯•evqb nevi d‡j †h mg¯• e¨w³ we‡kl mweav cvq miKvi Zv‡`i Dci †h AwZwi³ Ki avh K‡i ZvB we‡kl Ki|

miKvix FY : miKv‡ii ¯vfwweK Avq A‡c¶v e¨q †ewk n‡j miKvi‡K RbMY n‡Z ev we‡`k n‡Z FY MnY Ki‡Z nq| mvaviYZt Ri€ix Ae¯v ev h× weM‡ni mgq GB RvZxq FY MnY Kiv nq|

wewea : A‡bK mgq h‡×i ¶wZc• iY, ci¯wi Ges ˆe‡`wkK mvnvh¨ cfwZ n‡Z miiKvi cPi A_ Avq K‡i _v‡K|

chv‡jvPbv :

- miKvix Avq `ÔcKvi : Ki n‡Z cvß Avq I Ki ewnf•Z LvZ n‡Z cvß Avq|
- Ki eva¨Zvg•jK|
- we‡kl Ki|
- ewYwR¨K Avq|
- miKvix FY|

cv‡VvËi g•j¨vqb

ˆbe¨w³K ck :

1. miKvix NvUwZ wbev‡ni Rb¨ †Kvb Drm n‡Z Avq ew× Kiv nq –
   K. Ki L. ïé
   M. ewYwR¨K Avq N. me¸‡jv
2. †KvbwU miKv‡ii ewYwR¨K Av‡qi Drm?
   K. wd L. Rwigvbv
   M. AvqKi N. †ij wefvM
3. wb‡æi †KvbwU eva¨Zvg•jK bq?
   K. Ki L. Rwigvbv

M. wd N. †KvbwUB bq

4. Avgv‡`i †`‡k ÔGg•j¨ ms‡hvRb KiÕ KZmvj n‡Z cPwjZ nq?
K. 1990/91 L. 1991/92
M. 1992/93 N. 1993/94

5. †`‡ki Af¨š•‡i Drcw`Z I e¨eüZ `‡e¨i Dci AwcZ ïé‡K wK e‡j?
K. m¤ž•iK ïé L. AveMvix ïé
M. Avg`vbx ïé N. ißvbx ïé

msw¶ß DËi-ck :

1. miKvix Avq ej‡Z wK †ev‡Sb? miKvix Av‡qi Drm¸‡jv eYbv Ki€b|
2. miKvix Av‡qi Drm¸‡jv KZ cKvi?

mgm¨v 3 :

bx‡Pi KZ¸wj †¶Î n‡Z 1996-97 mv‡j miKvix Av‡qi cwigvY †`Iqv nj| G¸‡jv n‡Z †gvU Ki Avq Ges †gvU Ki ewnf•Z Avq †ei Ki€b|

	Drmmg•n	**Avq (†KwU UvKv)**
1.	AveMvix ïé	207
2.	A_%bwZK †mev	321
3.	g•j¨ ms‡hvRb Ki	4390
4.	†ij I‡q	134
5.	fwg ivR¯	184
6.	†hvMv‡hvM I cwienb	74

cvV 4 : Ki, K‡ii AvcvZ fvi I Povš• fvi

D‡Ïk¨

G cvV †k‡l Avcwb –

- K‡ii msÁv w`‡Z cvi‡eb|
- K‡ii D‡Ïk¨ eYbv Ki‡Z cvi‡eb|
- K‡ii Kvbbmg•n we‡klY Ki‡Z cvi‡eb|
- wewfb cKvi K‡ii Zjbvg•jK Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡eb|
- K‡ii AvcvZ fvi I Povš• fv‡ii g‡a¨ m¤žK wbYq Ki‡Z cvi‡eb|

Ki wK ?

mvavi Yfv‡e, RbMY eva¨Zvg• jKfv‡e miKvi‡K †h A_ c`vb K‡i ZvB Ki| GKwU †`‡ki miKvi Zvi e¨q wbev‡ni Rb¨ †h Avq K‡i _v‡K Zvi GKwU eo Ask Av‡m RbM‡Yi c`Ë Ki n‡Z| GKwU †`‡ki cwZwU bvMwiK Zvi Av‡qi GKwU Ask miKvi‡K c`vb K‡i| Avi miKv‡ii e¨q wbev‡ni Rb¨ c`Ë GB A_ c`vb cwZwU DcvRb¶g bvMwi‡Ki Rb¨ eva¨Zvg• jK| Avi GB A\_ ØvivB wbwgZ nq iv¯•v-NvU, miKvix nvmcvZvj, miKvix wk¶v cwZôvb cfwZ| GB mg¯• Dcv`vb Avgiv wbZ¨ e¨envi K‡i AvmwQ| wKš Avwg hw` nvmcvZvj e¨envi bvI Kwi ZeI Avgv‡K Ki c`vb Ki‡Z n‡ŽQ| Avwg bv Ki‡jI Avi I `kRb GUv e¨envi Ki‡Q| mZivs ejv hvq Ki Øviv †Kvbi/c cZ¨¶ cwß AvKv Kiv hvq bv| Zvn‡j ejv hvq †h, †Kvbi/c cZ¨¶ mweavi cZ¨vkv bv K‡i RbMY eva¨Zvg• jKfv‡e miKvi‡K †h A\_ c`vb Ki‡Z nq Zv‡K Ki e‡j|

ˆewkó¨ :

Dc‡ii Av‡jvPbv n‡Z Avgiv †`wL †h, cwZwU bvMwiK Ki c`vb K‡i wKš wewbg‡q †h miKvi nvmcvZvj ev iv¯•vNvU mweav w`‡Z eva¨ bq| Zvn‡j Avgiv K‡ii `wU ˆewkó¨ cvB –

1. Ki c`vb eva¨Zvg•jK
2. Ki`vZv Ki c`v‡bi Rb¨ †Kvbi/c cZ¨¶ mweav `vex Ki‡Z cv‡i bv|

K‡ii D‡Ïk¨ :

¯fveZtB ck RvM‡Z cv‡i – Ki †_‡K hw` †Kvb cZ¨¶ mweav bv-B cvIqv hvq Z‡e †Kb Ki w`e? Gi mgvavb †c‡Z n‡j Avgv‡`i Ki c`v‡bi D‡Ïk¨ m¤ž‡K Rvb‡Z n‡e|

1. ivR¯ msMn : Ki e¨e¯vi g• j D‡Ïk¨ n‡ŽQ ivR¯ msMn Kiv| †`‡ki wbivcËv, Af¨š• ixY kwš• k• Ljv i¶v, wewfb RbKj¨vYg• jK I †mevg• jK KvR Kivi Rb¨ miKvi‡K cPi A_ e¨q Ki‡Z nq| GB A‡_i †hvMv‡bi g• j Drm Ki| mZivs ejv hvq ivR¯ msMn KivB Ki e¨e¯vi gL¨ D‡Ïk¨|

**2. Drcv`b wbqš•Y :** A‡bK mgq we‡`k n‡Z Avg`vbxKZ `‡e¨i Kg g•‡j¨i Kvi‡Y †`kxq `e¨ Kg wewµ nq| d‡j †`kxq cwZôvb¸‡jv Zv‡`i Kw• ¶Z gbvdv ARb Ki‡Z cv‡i bv| ZvB †`kx wkí cwZôv‡bi Drcv`b wbqš•‡Yi D‡Ï‡k¨ miKvi Avg`vbxKZ `‡e¨i Dci DŽPnv‡i Ki Av‡ivc K‡i Avg`vbx LiP ewo‡q †`q| d‡j †`kxq evRv‡i Dnvi g• j¨ †e‡o hvq Ges †`kx c‡Y¨i wewµ †ewk nq| Gfv‡e Ki Av‡iv‡ci gva¨‡g miKvi Drcv`b wbqš•Y K‡i|

3. †fvM wbqš¿Y : Ki e¨e¯'vi Avi GKwU cavb D‡Ïk¨ †fvM wbqš¿Y Kiv| Zv nj – wejvmRvZ `‡e¨i †fvM wbqš¿Y Kivi Rb¨ miKvi Zvi Dci DŽPnv‡i Ki avh K‡i| GQvov g`, Awdg cfwZ ¶wZKviK `‡e¨i e¨enviI wbi€rmwnZ Kivi j‡¶¨ G¸‡jvi Dci AwZwi³ Ki avh Kiv nq|

4. ewYR¨P‡µ wbqš¿Y : ewYR¨P‡µi d‡j †Kvb `‡e¨i `vg cwieZZ n‡j miKvi †mB k¬b¨¯vb ο i‡Yi Rb¨ fZwK †`q| d‡j evRv‡i Avevi fvimvg¨ wd‡i Av‡m| GB fZwK c`v‡bi A_ miKvi Ki †_‡K msMn K‡i|

**5. m¤ž` I Av‡qi mIg e›Ub :** †`‡ki m¤ž‡`i b¨vqm½Z e›Ub Ges mgv‡Ri Avq ˆelg¨ `¬ iKi‡Yi D‡Ï‡k¨ Ki avh Kiv nq| abx e¨w³‡`i Dci µgeagvb nv‡i Ki avh K‡i abx `wi‡`i Avq ˆelg¨ `¬i Kiv hvq|

6. A_%bwZK Dbqb : AbbZ Ges Dbqbkxj †`‡k Ki e¨e¯'vi Ab¨Zg cavb D‡Ïk¨ nj A_%bwZK Dbqb mvab Kiv| mvgwRK I A_%bwZK Dbqb cwiKíbv ev¯¬evq‡bi Rb¨ A_ msM‡ni wbwg‡Ë Ki avh Kiv nq|
mZivs ivR¯ msMn Kiv QvovI wewfb mvgwRK I A_%bwZK j¶¨ AR‡bi D‡Ï‡k¨ Ki avh Kiv nq| Zvn‡j ejv hvq †h, miKvix KvR‡K A_vq‡bi me‡P‡q mnR c×wZ nj Ki|

Abkxjbx 1

Ki c`v‡bi D‡Ïk¨mg¬‡ni cwZwUi D`vniY w`b Ges Avcwb e¨envi K‡ib G iKg cvPwU miKvix e¨q Lv‡Zi bvg wjLb|

K‡ii Kvbbmg¬n :

Ki avh ev Av`vq Kivi Rb¨ miKvi KZ¸‡jv wbqgKvbb †g‡b P‡j| GB wbqg¸‡jvB K‡ii Kvbb| KviY Ki Av`vq Kivi Rb¨ †h LiP nq Zv c`Ë K‡ii †P‡q †ekx n‡e †mwU †Kvb Ae¯'vqB Kvg¨ bq| ZvB Ki Av`v‡qi Rb¨ †h Kvbbmg¬n †g‡b Pjv nq Zv nj –

1. mgZvi Kvbb
2. wbðqZvi Kvbb
3. mweavi Kvbb
4. wgZe¨wqZvi Kvbb|

Dc‡ii PviwU wbq‡gi ce³v G¨vWvg w¯§_| wKš' AvaywbK A_bxwZwe`MY Avi I K‡qKwU Kvb‡bi D‡jL K‡i‡Qb –

5. Drcv`bkxjZvi Kvbb
6. w¯wZ¯vcKZvi Kvbb
7. mijZvi Kvbb I
8. wewfbZvi Kvbb|

1. mgZvi Kvbb : c‡Z¨K bvMwiK Zvi wbR wbR mvg_ Abhvqx Ki c`vb Kivi bxwZB nj mvg_¨ ev mgZvi Kvbb| GKRb e¨w³ hLb iv‡ói AvIZvq †_‡K †h Avq ev mweav †fvM K‡i †m †mB Abcv‡ZB iv‡ói Kvhvbev‡ni Rb¨ e¨qfvi enb K‡i|

2. wbðqZvi Kvbb : G bxwZ Abhvqx K‡ii cwigvY I c`v‡bi mgq m¤ú‡K Ki`vZv AewnZ _v‡K| d‡j e¨w³ mn‡RB Zvi Aewkó Avq Ges ev‡RU ˆZwi Ki‡Z cv‡i|

3. mweavi Kvbb : G bxwZ Abhvqx Ki`vZv Zvi mweav Abhvqx Ki c`vb K‡i| †hgb – Pvlxi wbKU †_‡K dmj DVvi ci Ki Av`vq Kiv DwPZ| e¨emvqx‡`i wbKU n‡Z eQi †k‡l Ki Av`vq Kiv DwPZ| KviY †m mgq e¨emv‡qi wnmve-wbKvk Kiv nq|

4. wgZe¨wqZvi Kvbb : G bxwZ Abhvqx Ki Av`vq Ki D‡Ëvjb LiP †ekx Kg nIqv DwPZ| Ki Av`vq Ki D‡Ëvjb LiP A‡c¶v Kg n‡j Zvi †Kvb †hŠw³KZv _v‡K bv|

**5. Drcv`bkxjZvi Kvbb :** Ki av‡hi D‡Ïk¨ ivR¯ msMn Kiv| mZivs cwZwU Ki av‡hi mgq j¶¨ ivL‡Z n‡e †hb chvß ivR¯ msMnxZ nq| Aí cwigv‡Y A_ Av`vq n‡Z cv‡i G iKg AmsL¨ Ki A‡c¶v AwaK A_ Av`vq n‡Z cv‡i G iKg Aí Ki avh¨ Kiv DwPZ|

6. w¯wZ¯vcKZvi Kvbb : Ki e¨e¯v G iKg nIqv DwPZ †hb c‡qvRb‡ev‡a K‡ii cwigvY nvm-ew× Kiv hvq| miKvix e¨q w¯wZkxj bq| ZvB Ki e¨e¯v Øviv GB Aw¯wZkxj e¨q wbev‡ni Rb¨ K‡ii Kvbb I Aw¯wZkxj nIqv DwPZ|

7. mijZvi Kvbb : Ki e¨e¯v AZ¨š• mij Ges mvavi‡Yi †evaMg¨ nIqv DwPZ hv‡Z mvaviY RbMY K‡ii mnR wnmve-wbKvk Ki‡Z cv‡i| d‡j `bxwZ I ceÂbvi ¯vb _v‡K bv|

8. wewfbZvi Kvbb : GB bxwZ Abhvqx c‡Z¨K e¨w³ wKQ bv wKQ Ki w`‡Z eva¨ _v‡K| Ki e¨e¯vq wewfb cKvi Ki _vKvi d‡j Kifvi mK‡ji Dci h_vm¤e mgfv‡e ewÈZ nq|
Zvn‡j c‡Z¨K †`‡k Ges Ki e¨e¯v‡K KvhKix Kivi D‡Ï‡k¨ GB bxwZ¸wj KvhKi Kiv DwPZ|

cMwZkxj Ki :
cMwZkxj Ki e¨e¯vq GKRb †jv‡Ki Avq ev m¤úwËi cwigvY hZ †ewk nq Zv‡`i Dci µgk ZZ †ewk nv‡i Ki avh Kiv nq| bx‡P wZbRb †jv‡Ki D`vniY †`qv nj hv‡`i Avq wewfb –

Ki‡hvM¨ Av‡qi cwigvY	K‡ii nvi	†gvU Ki
1,000 UvKv	5%	50 UvKv
2,000 UvKv	6%	120 UvKv
3,000 UvKv	7%	210 UvKv

mZivs Av‡qi cwigvY ev m¤úwËi g• j¨ ewׄi Abcv‡Z hw` K‡ii nvi ew× cvq Z‡e Zv‡K cMwZkxj Ki e‡j|
Gevi Avmb wP‡Î gva¨‡g GB Ki †evSvi †Póv Kwi|

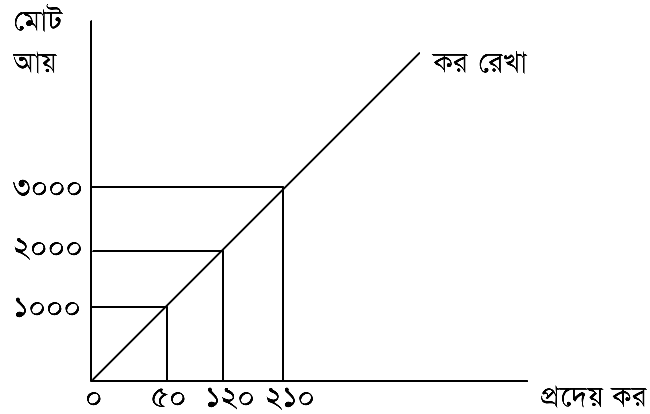

wPÎ 2.1 : cMwZkxj Ki

wPÎ 2.1 G cMwZkxj K‡ii aiY †`Lv‡bv n‡q‡Q| wP‡Î †`Lv hv‡ŽQ, †gvU Avq e„w×i mv‡_ mv‡_ c‡`q Ki I mgnv‡i e„w× cv‡ŽQ|

A‡avMwZkxj Ki :
DŽP Av‡qi Dci µgk Kg nv‡i Ki avh Kiv n‡j Zv‡K A‡avMwZkxj Ki e‡j| A‡avMwZkxj Ki e¨e¯vq Av‡qi ¯•i hZ evo‡Z _v‡K K‡ii nvi I ZZ Kg‡Z _v‡K|

D`vniY :

Ki‡hvM¨ Avq	K‡ii nvi	†gvU Ki
1,000 UvKv	7%	70 UvKv
2,000 UvKv	6%	120 UvKv
3,000 UvKv	5%	150 UvKv

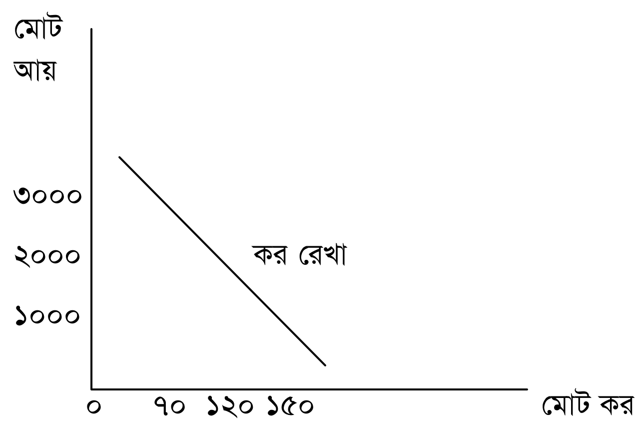

wPÎ 2.2 : A‡avMwZkxj Ki

wPÎ 2.2 G A‡avMwZkxj Ki †iLv †`Lv‡bv n‡q‡Q| wP‡Î †`Lv hv‡ŽQ, †gvU Avq e„w×i mv‡_ mv‡_ c‡`q K‡ii nvi Kg‡Q|

mgvbcvwZK Ki : †h e¨e¯vq mevi Dci mgvb nv‡i Ki Av‡ivc Kiv nq Zv‡K mgvbcvwZK Ki e‡j|

D`vniY :

†gvU Avq	K‡ii nvi	†gvU Ki

1,000 UvKv	6%	60 UvKv
2,000 UvKv	6%	120 UvKv
3,000 UvKv	6%	180 UvKv

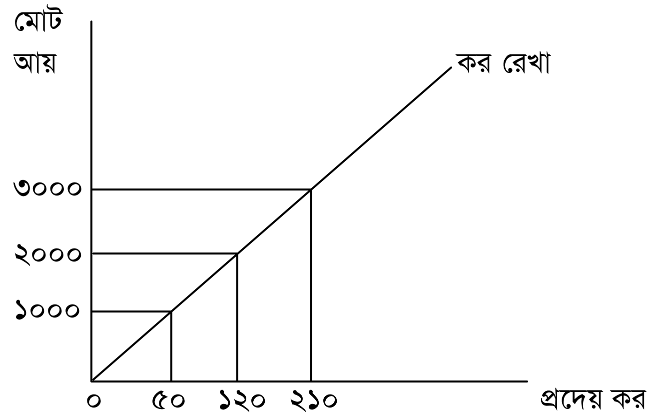

wPÎ 2.3 : mgvbcvwZK Ki

wPÎ 2.3 G mgvbcvwZK Ki †iLv †`Lv‡bv n‡q‡Q| wP‡Î †`Lv hv‡ŽQ, †gvU Avq ew×i cvi Ki c`v‡bi nvi GKB _vK‡Q| G‡¶‡Î Ki †iLvi Xvj cMwZkxj Ki †iLvi Xv‡ji PvB‡Z Kg|

Abkxjbx 2

GB wZbwU Ki e¨e¯vi g‡a¨ †KvbwU fvj e‡j g‡b nq wjLb|

**Pwn`v I Ki :** GLb Avmb Avgiv Pwn`v Ges K‡ii mv‡_ †Kvb m¤žK Av‡Q wKbv Zv wbYq Kivi †Póv Kwi|

†Kvb `‡e¨i Dci Ki Av‡ivwcZ n‡j Zvi `vg ew× cvq| GB ewaZ `vg Kvi Dci AwcZ nq ZvB Av‡jvP¨ welq –

1. mvaviY Pwn`v I †hvMv‡bi †¶‡Î :

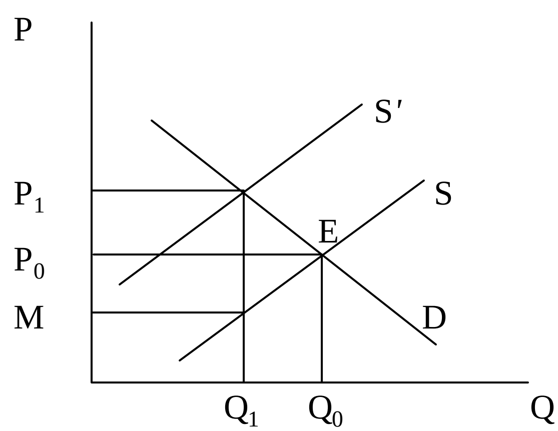

Dc‡ii wP‡Î fvimvg¨ Ae¯vq P_0 `v‡g $Q_0$ cwigvY cvIqv hvq| GLb hw` Gi Dci Ki Av‡ivwcZ nq Z‡e `vg †e‡o $OP_1$ n‡e| Gi d‡j Av‡Mi †h cwigvY `e¨ OP_0 `v‡g cvIqv †hZ †mB cwigvY `e¨B GLb †ewk `v‡g cvIqv hv‡e| A_ev Av‡Mi `v‡g Kg `e¨ cvIqv hv‡e| Drcv`K Zvi Drcv`b Kwg‡q w`‡q K‡ii GKUv Ask †fv³vi Dci mÂvjb Ki‡Z cv‡i|

Dc‡ii wP‡Îi †gvU K‡ii P_1P_0 Ask †fv³v Ges P_0M Ask Drcv`K enb K‡i| Zvn‡j †gvU `vg P_1M cwigv‡Y ew× †c‡q‡Q|

2. c•Y wµwZ¯vcK Pwn`vi †¶‡Î :

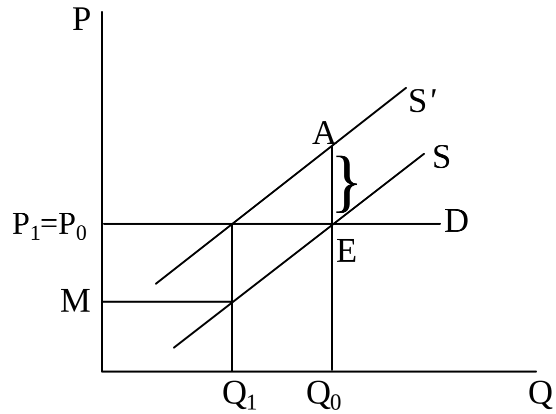

Pwn`v †iLv hw` c• Y wµwZ¯vcK nq Z‡e †fv³v GKB `v‡g Zvi Pwn`v cKvk K‡i| GB me `‡e¨i †¶‡Î `vg evov‡j ev Kgv‡j †fv³v Avi H `e¨ †fvM Ki‡e bv| G‡¶‡Î Ki Av‡ivc‡i d‡j ewaZ `vg (AE) Drcv`K‡KB enb Ki‡Z nq|

3. c•Y Awµ¯wZ¯vcK Pwn`v :

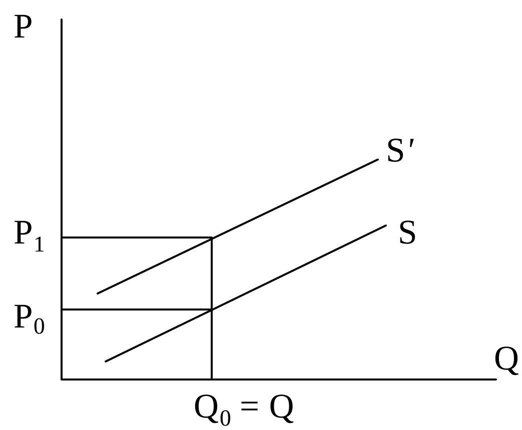

c• Y Awµ¯wZ¯vcK Pwn`v †iLvq †µZvi Pwn`v AcwiewZZ _v‡K| d‡j `vg cwieZ‡b Zvi Pwn`vi cwieZb nq bv| G‡Z Ki Av‡iv‡ci d‡j ewaZ `vg (P_1P_0) m¤ž• Yfv‡eB †µZvi Dci c‡o|

Zjbvg•jK Av‡jvPbv :

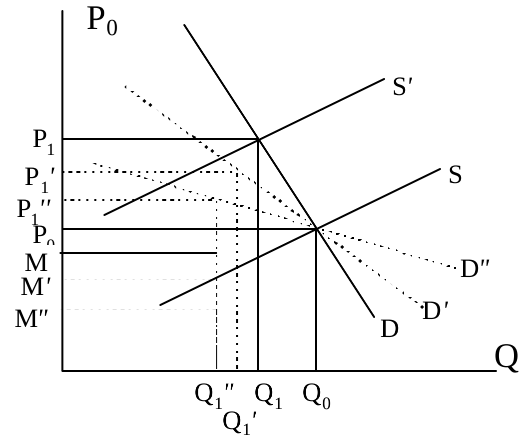

Pwn`v †iLv hLb Kg w¯wZ¯vcK (D) _v‡K ZLb Ki Av‡iv‡ci d‡j evaZ g~‡j¨i †ekxi fvM †fv³vi Dci ($P_1P_0$) Ges Kg cwigv‡Y Drcv`‡Ki Dci (P_0M) c‡o| A_vr $P_1P_0 > P_0M$| GLb Pwn`v †iLv Avi GKU Kg Lvov (D′) n‡j †µZvi Dc‡ii K‡ii cfve K‡g Drcv`‡Ki Dci ($P_0P\M_1'$) Ki fvi Av‡iwcZ nq|

GLb Pwn`v †iLv Avil w¯wZ¯vcK n‡j Drcv`‡Ki Dci (P_0M'') Avil †ekx K‡ii fvi AwcZ nq|

mZivs Avgiv ej‡Z cwi, Pwn`v †iLv Aw¯wZ¯vcK n‡j †fv³vi Dci Ges w¯wZ¯vcK n‡j we‡µZvi Dci K‡ii Povš• fvi †ewk AwcZ nq|

Abkxjbx 4

Dc‡ii †h wZbwU Ae¯vq K‡ii Povš• fv‡ii eYbv †`qv nj Zvi wZbwU D`vniY wjLb|

K‡ii AvcvZ fvi I Povš• fvi :

aiv hvK, Avgiv K‡qKRb eÜ wg‡j wm‡bgv †`L‡Z hwŽQ| wm‡bgvi †h wU‡KU µq Kijvg Zvi w`‡K ZvKv‡j †`Lv hv‡e †h c‡gv` Ki bv‡g GKUv Ask Av‡Q| GB K‡i Avgiv c`vb KiwQ| GLb K_v n‡ŽQ †h, GB Ki wm‡bgv gwjK‡`i KvQ †_‡K miKvi Av`vq K‡i| Avi Avgiv KiwU c`vb KiwQ| Zvn‡j †`Lv hv‡ŽQ †h, Ki Av‡iwcZ n‡ŽQ GKR‡bi Dci Avi c`vb Ki‡Q Ab¨Rb| Avevi †Kvb †¶‡Î hvi Dci Ki Av‡iwcZ †mB Ki c`vb K‡i| Avevi GgbI n‡Z cv‡i †h, †µZv I we‡µZv AvswkKfv‡e Ki c`vb Ki‡Q| Zvn‡j hvi Dc‡i K‡ii cv_wgK Aew¯wZ NU‡j †mUv AvcvZ fvi Ges †h Ki c`vb Ki‡Q Zv‡K K‡ii Povš• fvi eSvq| Zvn‡j Avgiv ej‡Z cviwQ †h, K‡ii cv_wgK Aew¯wZ‡K KivNvZ ev AvcvZ fvi Ges Povš• Aew¯wZ‡K KivcvZ ev Povš• fvi e‡j|

weµq K‡ii †¶‡Î K‡ii AvcvZ fvi we‡µZvi Dci Ges Povš• fvi †µZvi Dci AwcZ nq| Avevi AvqK‡ii †¶‡Î K‡ii AvcvZ Ges Povš• fvi DfqB GKR‡bi Dci c‡o|

GLb Avmb K‡qKwU †¶‡Î K‡ii AvcvZ I Povš• fvi †K enb K‡i Zv chv‡jvPbv Kwi –

1. AvqKi : RbM‡Yi Av‡qi Dci †h Ki avh Kiv nq Zv AvqKi| AvqK‡ii KiNvZ I KicvZ Ki`vZvi Dci c‡o|

2. weµq Ki : `e¨-mvgMx weµ‡qi Dci †h Ki Av‡ivc Kiv nq ZvB weµq Ki| weµq K‡ii KiNvZ we‡µZvi Dci wKš' Kic‡Z †µZvi Dci c‡o|

3. fg¨ ivR¯^ : f¨gi gwj‡Ki Dci Av‡iwcZ Ki f¨g iR¯^ Ki| f¨gi gwjKB G K‡ii KivNvZ I KicvZ enb K‡i| Z‡e f¨gi gwjK Drcw`Z `‡e¨i g• j¨ ewo‡q K‡ii A_ †µZv‡`i wbKU n‡Z Av`vq Ki‡Z cv‡i| G‡Z K‡i KicvZ KwlRvZ `‡e¨i †µZv‡`i Dci co‡e|

4. AveMwi ïé : `‡e¨i Drcv`b I †fvM †`‡ki g‡a¨ mxgve× n‡j Zvi Dci Av‡iwcZ Ki‡K AveMwi ïé e‡j| Kvco, Pv, wmMv‡iU BZ¨w`i Dci Av‡iwcZ Ki AveMwi ïé| G ï‡é KiNvZ Drcv`bKvixi Dci Ges KicvZ †µZvi Dci c‡o|

**5. Avg`vbx-ißvbx ïé :** Avg`vbx `‡e¨i Avg`vbx ïé Ges ißvbx `‡e¨i Dci ißvbx ïé Av‡iwcZ nq| G‡¶‡Î Avg`vbx ïé Avg`vbxKZ †`‡ki bvMwiK‡`i enb Ki‡Z nq| A\_vr K‡ii Povš• fvi bvMwi‡Ki Dci AwcZ nq| Avevi ißvbxKZ †`‡ki bvMwiKiv ißvbx ï‡éi KicvZ enb K‡i|

**6. c‡gv` Ki :** RbM‡Yi Av‡gv`-c‡gv` e¨e¯'w`i Dci Av‡iwcZ Ki c‡gv` Ki| †hgb – wm‡bgv, hvÎv, w\_‡qUvi BZ¨w`i wU‡K‡Ui Dci †h Ki Av‡iwcZ nq Dnv c‡gv` Ki| G K‡ii KiNvZ D‡`¨v³v‡`i Dci Ges KicvZ `kK‡`i Dci c‡o|

Abkxjbx 3

Dc‡ii †¶‡Î¸wj QvovI AviI cvPwU †¶‡Îi K_v wjLb| Gevi Zv‡`i KiNvZ I KicvZ Av‡jvPbv Ki€b|

chv‡jvPbv :

Ki evaZ¨Zvg•jK|

ivR¯^ Av`vq K‡ii cavb j¶¨|

K‡ii Kvbb 8 (AvU) wU|

A‡avMwZkxj Ki e¨e¯'vq Av‡qi Ki evo‡j K‡ii nvi K‡g|

K‡ii cv_wgK Aew¯'wZ‡K AvcvZ fvi Ges Povš• Aew¯'wZ‡K Povš• fvi e‡j|

Avq K‡ii KicvZ I KiNvZ GKB e¨w³i Dci c‡o|

c‡gv` K‡ii KiNvZ `kK‡`i Dci c‡o|

cv‡VvËi g•j¨vqb

ˆbe¨w³K ck :

1| A¨vWvg w¯§_ evYZ K‡ii Kvbb KqwU?
K. 4wU L. 6wU
M. 8wU N. 10wU

2| K‡ii †Kvb Kvb‡bi Rb¨ KlK dmj DVvi ci Ki c`vb K‡i?
K. mgZvi L. wbðqZvi
M. mweavi N. wgZe¨wqZvi

3| K‡ii †Kvb Kvb‡bi Rb¨ Ki e¨e¯vq `bxwZi m¤vebv Kg nq?
K. wbðqZv L. mijZv
M. wewfbZv N. mweav

4| cMwZkxj Ki e¨e¯vq †K †ewk jvfevb nq?
K. abx L. Mixe
M. DfqB N. †KDB bq

5| c•Y Aw¯wZ¯vcK Pwn`vi †¶‡Î K‡ii Povš• fvi †K enb K‡i?
K. miKvi L. Drcv`K
M. we‡µZv N. †µZv

msw¶ß DËi-ck :

1| Ki wK? K‡ii D‡Ïk¨¸‡jv eYbv Ki€b|
2| K‡ii KZ¸wj Kvbb i‡q‡Q? eYbv Ki€b|
3| Ki e¨e¯v KZ cKvi I wK wK?
4| K‡ii AvcvZ fvi I Povš• fvi wK? weµq K‡ii †¶‡Î K‡ii AvcvZ fvi I Povš• fvi Av‡jvPbv Ki€b|

mgm¨v 4 :

wb‡æi wZbwU †¶‡Î Ki Gi fvi Kvi Dci AwcZ nq, †ei Ki€b|
1| ¯vfweK †hvMv‡bi †¶‡Î|
2| c•Y w¯wZ¯vcK †hvMv‡bi †¶‡Î|
3| c•Y Aw¯wZ¯vcK †hvMv‡bi †¶‡Î|

cvV 5 : cZ¨¶ I c‡iv¶ Ki - G‡`i mweav I Amweavmg•n

D‡Ïk¨

G cvV †k‡l Avcwb –

- cZ¨¶ Ki I c‡iv¶ K‡ii msÁv eYbv Ki‡Z cvi‡eb|
- cZ¨¶ K‡ii mweav I Amweavmg•n eYbv Ki‡Z cv‡eb|
- c‡iv¶ K‡ii mweav I Amweavmg•n ej‡Z cv‡eb|

cZ¨¶ Ki

ÔcZ¨¶ KiÕ Gi ÒcZ¨¶Ó kãwU †_‡K Avcbvi wbðqB aviYv n‡q‡Q †h, G K‡ii mv‡_ e¨w³i mivmwi m¤žK i‡q‡Q| Zvn‡j Avcwb wVK c‡_B wPš•v Ki‡Qb| cZ¨¶ K‡ii msÁv wn‡m‡e ejv hvq, †Kvb e¨w³i Dci Ki avh Kiv n‡j hw` †mB e¨w³‡KB †kl chš• K‡ii Aw_K fvi enb Ki‡Z nq Zvn‡j †mB Ki‡K cZ¨¶ Ki e‡j| Gi¦c K‡ii †¶‡Î Ki`vZv K‡ii fvi A‡b¨i Nv‡o Pvcv‡Z cv‡i bv; hvi Dci Ki avh Kiv nq Zv‡KB Kifvi enb Ki‡Z nq| A_vr KiNvZ I KicvZ GKB e¨w³i Dci cwZZ nq| †hgb – AvqKi, gZ¨Ki, fwgi ivR¯ BZ¨vw` K‡ii †¶‡Î hvi Dci Ki avh Kiv nq †mB e¨w³‡KB Ki c`vb Ki‡Z nq| GRb¨ G mKj Ki‡K cZ¨¶ Ki ejv nq| mZivs †h e¨w³i Dci Ki avh Kiv nq hw` †mB e¨w³ wb‡RB K‡ii cZ¨¶ Aw_K fvi enb K‡i A_vr †Kvb K‡ii KiNvZ I KicvZ hw` GKB e¨w³i Dci c‡o Zvn‡j G‡K cZ¨¶ Ki ejv nq|

cZ¨¶ K‡ii mweav

1. b¨vqbxwZ : cZ¨¶ K‡ii cavb mweav nj †h, GwU mZZv I b¨vqbxwZi Dci cwZwôZ| †jv‡Ki Av‡qi cwigvY I mvg_¨ Abhvqx GB Ki avh Kiv nq| d‡j Kifvi e›U‡bi †¶‡Î b¨vqbxwZ AbmiY Kiv m¤e nq|

2. wbðqZv : cZ¨¶ Ki wbðqZvi bxwZ Abmi‡Y avh¨ Kiv hvq| cZ¨¶ K‡ii †¶‡Î Ki`vZv c•‡eB Rvb‡Z cv‡i †h, Zv‡K wK cwigvY Ki w`‡Z n‡e Ges KLb w`‡Z n‡e| Aciw`‡K, miKvi I GB Drm n‡Z wK cwigvY ivR¯ †c‡Z cv‡i †mB m¤‡Ü wbwðZ n‡Z cv‡i|

3. wgZe¨wqZv : cZ¨¶ Ki Av`v‡qi LiP Kg| GB Ki miKvi Ki`vZvi KvQ †_‡K mivmwi Av`vq K‡i, d‡j Ki Av`vq Ki‡Z miKv‡ii LeB Kg e¨q nq|

4. w¯wZ¯vcKZv : c‡qvRb Abhvqx cZ¨¶ K‡ii cwigvY ewo‡q ev Kwg‡q ivR‡¯i cwigvY nvm-ew× Kiv †h‡Z cv‡i| A_vr cZ¨¶ Ki w¯wZ¯vcK|

**5. Drcv`bkxjZv :** cZ¨¶ Ki h‡_ó Drcv`bkxj| KviY, K‡ii nvi cwieZb K‡i Ges abx e¨w³i Dci µgeagvb nv‡i Ki avh K‡i AwaK ivR¯ Av`vq Kiv hvq|

6. bvMwiK †PZbv ew× : cZ¨¶ Ki Ki`vZv‡`i bvMwiK †PZbv RvMvq| cZ¨¶ fv‡e Ki †`qvq Ki`vZvMY K‡ii †evSv Abfe K‡i| mZivs Zv‡`i wbKU †_‡K Av`vqKZ A_ wKfv‡e e¨q Kiv nq †mw`‡K Zviv mRvM `wó iv‡L| d‡j Zv‡`i bvMwiK †PZbv I KZe¨Ávb ew× cvq|

cZ¨¶ Ki Amwbav

1. AwcqZv : cZ¨¶ Ki mvaviYZt Awcq| mivmwi c‡KU †_‡K GB Ki w`‡Z nq e‡j Ki`vZv G RvZxq Ki cQ›` K‡i bv| G Kvi‡Y cZ¨¶ K‡ii nvi AwaK n‡j miKv‡ii wei€‡× Ki`vZv‡`i g‡a¨ Zxe Am‡šÍvl mwó nq|

**2. dwK †`qvi ceYZv :** cZ¨¶ Ki e¨w³i mZZvi Dci wbfikxj| Kv‡RB GLv‡b dwK †`qv mnR| Ki`vZv hw` BŽQv K‡i fj wnmv‡e `wLj K‡i Ki dwK w`‡Z cv‡i| G ai‡bi Ki e¨e¯'vq †`‡k `bxwZ, ceÂbv BZ¨vw` i cmvi NUvi m¤¢vebv _v‡K|

3. †¯ŽQvPwiZv : cZ¨¶ K‡ii nvi wbavi‡Y Kiv KwVb e¨vcvi| G‡¶‡Î wewfb †jv‡Ki Dci wewfb nv‡i Ki emv‡bv nq| wKš' GB nvi wbavi‡Yi †Kvb ˆeÁwbK gvcKwV †bB| †m Rb¨ K‡ii nvi me mgq Ki`vZvi mvg_¨ wePvi K‡i wbavi‡Y Kiv m¤¢ei nq bv| d‡j A‡bK mgq b¨vqbxwZ D‡cw¶Z nq|

4. mÂ‡q wbi€rmvn : cZ¨¶ K‡ii nvi †ewk n‡j †jv‡Ki mÂq ¯ž nv I K‡gv`¨g nvm cvq| d‡j †`‡k c‡qvRbxq g•jab MVb e¨vnZ nq|

c‡iv¶ Ki :

†Kvb e¨w³i Dci Ki avh Kiv n‡j hw` †mB e¨w³ K‡ii fvi A‡b¨i Dci Pwc‡q w`‡Z cv‡i Z‡K c‡iv¶ Ki ejv nq| c‡iv¶ K‡ii †¶‡Î K‡ii KiNvZ Ges KicvZ wfb e¨w³i Dci c‡o| †hgb – weµq Ki, AveMwi ïé, c‡gv` Ki BZ¨vw`| Gi¨c K‡ii †¶‡Î KiNvZ Ki`vZv enb Ki‡j I KicvZ Ab¨ †jv‡K enb K‡i| D`vniY¯'i¨c ejv hvq, weµq Ki we‡µZvi KvQ †_‡K Av`vq Kiv n‡j I we‡µZv `e¨g• j¨ ewx× K‡i †µZv‡`i KvQ †_‡K H A_ Z‡j wb‡Z cv‡i|

G‡¶‡Î KiNvZ we‡µZvi Dci co‡j I KicvZ †µZv‡KB enb Ki‡Z nq| mZivs †h K‡ii KiNvZ Ki`vZv wb‡R enb K‡i wKš' KicvZ A‡b¨i Nv‡o Pwc‡q w`‡Z cv‡i Zv‡K ÔC‡iv¶ KiÕ e‡j|

c‡iv¶ K‡ii mwbav

1. Rbwcq : c‡iv¶ K‡ii cavb mwbav n‡ŽQ †h, GwU AwaKZi Rbwcq| KviY, G‡¶‡Î Ki`vZv cZ¨¶ K‡ii †evSv Abfe Ki‡Z cv‡i bv|

2. mwbavRbK : c‡iv¶ Ki mvaviYZt `‡e¨i `v‡gi g‡a¨B _v‡K, ZvB GB Ki c`vb Kiv Ki`vZvi c‡¶ we‡kl mewavRbK| ZvQvov †Kbvi mgq cwZevi Aí cwigvY Ki w`‡Z nq| GRb¨ Ki`vZv‡`i we‡kl Amwbav nq bv|

3. Ki dwKi Amwbav : c‡iv¶ Ki dwK †`qv hvq bv| †h‡nZ c‡iv¶ Ki wRwb‡mi `v‡gi m‡½ Av`vq Kiv nq, †mRb¨ `e¨w` wKb‡jB †µZv Ki w`‡Z eva¨ _vK‡e| mZivs G‡¶‡Î Ki dwK †`qvi †Kvb Dcvq †bB|

4. Ki KvVv‡gv we¯•Z : c‡iv¶ K‡ii Ab¨Zg mwbav nj †h, iv‡ói mKj †kYxi Awaevmxi KvQ †_‡K Ki Av`vq Kiv hvq| iv‡ói bvbwea KvR †_‡K abx-Mixe mK‡jB DcKvi

†c‡q _v‡K| mZivs †m‡¶‡Î DcvRb¶g mKj‡KB wKQ bv wKQ Ki †`qv DwPZ| GKgvÎ c‡iv¶ K‡ii gva¨‡gB mKj‡K Ki w`‡Z eva¨ Kiv hvq| d‡j Ki KvVv‡gv we¯•Z nq|

5. w¯wZ¯vcK : c‡iv¶ Ki w¯wZ¯vcK| GB K‡ii nvi BŽQvgZ cwieZb K‡i miKvi c‡qvRbgZ A_ msMn Ki‡Z cv‡i|

**6. Drcv`bkxj :** c‡iv¶ Ki h‡_ó Drcv`bkxj| †h me wRwb‡mi Pwn`v w¯wZ¯vcK Zv‡`i Dci hw` Ki avh Kiv nq Zvn‡j wecj cwigvY ivR¯ msMn Kiv hvq|

7. mvgwRK Kj¨vY : c‡iv¶ Ki A‡bK mgq mvgwRK Kj¨v‡Yi mnvqK wn‡m‡e KvR K‡i| g`, wmMv‡iU BZ¨w` wRwb‡mi Dci c‡iv¶ Ki emv‡j GB mKj wRwb‡mi `vg †e‡o hvq Ges G‡`i e¨envi nvm cvq| Gfv‡e c‡iv¶ Ki mgv‡Ri Kj¨vY mvab K‡i|

c‡iv¶ K‡ii Amweav

1. AmgZv : c‡iv¶ K‡ii cavb Amweav n‡ŽQ †h, GwU b¨vqbwZ Ges mgZ¨vM bwZ AbmiY K‡i bv| c‡iv¶ K‡ii †evSv abx A‡c¶v `wi`‡`i‡KB †ewk cwigvY enb Ki‡Z nq| c‡qvRbxq `‡e¨i Dci Ki emv‡j Zjbvg• jKfv‡e `wi`‡`i DciB GB K‡ii Pvc †ewk c‡o|

2. Awbðq Zv : c‡iv¶ Ki mvaviYZt Awbwð Z| GB Ki n‡Z wK cwigvY ivR¯ Av`vq n‡e Zv c•e n‡Z wbwðZ K‡i wKQ ejv hvq bv|

3. e¨qeûj : c‡iv¶ Ki AZ¨š• e¨qeûj| c‡iv¶ Ki Av`v‡qi LiP Zjbvg• jKfv‡e A‡bK †ewk| d‡j GB K‡ii †¶‡Î wgZe¨wqZvi m•Î cwZcwjZ nq bv|

**4. g`vùxwZ mwó :** c‡iv¶ Ki av‡h¨i d‡j Drcv`b e¨q I cY¨mvgMxi `vg ew× cvq| Gi d‡j †`‡k g`vùxwZ †`Lv †`q Ges e¨emv-ewY‡R¨i †¶‡Î wek•Ljvi mwó nq|

5. AwgZe¨wqZv : c‡iv¶ Ki Av`vq Kivi Rb¨ miKvi‡K A‡bK †jvK wb‡qvM Ki‡Z nq| mZivs e¨q wbevn K‡i we‡kl DØË ivR¯ cvIqv hvq bv|

6. bvMwiK †PZvi Afve : c‡iv¶ Ki Rbmvavi‡Yi g‡a¨ bvMwiK †PZbv‡eva RvMvq bv| Ki`vZv mvaviYZt Ki c`vb m¤ž‡K AewnZ _v‡K bv| GRb¨ miKvi wKfv‡e ivR¯ e¨q K‡i †m m¤‡Ü Zviv †Kvb †LvR-Lei iv‡L bv|

cv‡VvËi g•j¨vqb

ˆbe¨w³K ck :

1. cZ¨¶ K‡i KiNvZ I KicvZ –
   K. GKB e¨w³i Dci cwZZ nq
   L. wfb e¨w³i Dci cwZZ nq
   M. AvswkK e¨w³ I AvswkK miKv‡ii Dci cwZZ nq
   N. Dc‡ii †KvbwUB mwVK bq|
2. †KvbwU cZ¨¶ Ki?
   K. AvqKi　　　　L. weµq Ki
   M. g•j¨ ms‡hvRb Ki　　　　N. †KvbwUB bq|

3. †KvbwU c‡iv¶ Ki?
   K. AvqKi   L. †Kv¤úvwb Ki
   M. Dfq   N. †KvbwUB bq|
4. †KvbwU cZ¨¶ Ki bq?
   K. AvqKi   L. c‡gv` Ki
   M. fwg Ki   N. gZ¨ Ki
5. †KvbwU c‡iv¶ K‡ii Amwzav?
   K. AwgZe¨wqZv   L. †¯ŽQvPwiZv
   M. mÂ‡q wbi€rmvn   N. AwcqZv

iPbvg•jK ck :

1. cZ¨¶ Ki I c‡iv¶ K‡ii cv_K¨ wb‡`k Ki€b|
2. cZ¨¶ K‡ii mwzav Ges Amwzavmg•n Av‡jvPbv Ki€b|
3. c‡iv¶ K‡ii mwzav Ges Amwzavmg•n D‡j-L Ki€b|

mgm¨v 5 :

ai€b evsjv‡`‡k GKRb †jvK GKwU `e¨ 5,000 UvKvi wewbg‡q µq Ki‡Q| wRwbmwU BUvjx n‡Z Avg`vbxKZ| GB wRwbmwUi Drcv`b LiP 3,000 UvKv| GLb –

1. Drcv`b n‡Z †fvM chš• GB `e¨wUi Dci wK wK Ki Av‡iwcZ n‡q‡Q e‡j Avcwb g‡b K‡ib|
2. Gi g‡a¨ BUvjx miKvi wK wK Ki cv‡ŽQ|
3. evsjv‡`k miKvi wK wK Ki cv‡ŽQ|
4. 2 gvm ci miKvi `e¨wUi Dci 200 UvKv Ki ew× Kij| `B gvm ci `e¨wUi `vg KZ n‡e?

cvV 6 : ev‡R‡Ui msÁv I cKvi‡f`

D‡Ïk¨

G cvV †k‡l Avcwb –

- ev‡RU wK Zv ej‡Z cvi‡eb|
- ev‡RU †Kb ¸i€Zc•Y Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
- wewfb cKvi ev‡R‡Ui we‡kl‡Y Ki‡Z cvi‡eb|

ev‡RU wK ?

cwZwU cwievi gv‡mi c_‡g H cwiev‡ii gwmK Li‡Pi cwigvY w¯'i K‡i| †hgb – GB gv‡mi Lv`¨, †cvkvK, evm¯'vb, we‡bv`b, wk¶v, wPwKrmv cfwZ LiP| GB Li‡Pi cwigvY wbfi K‡i e¨w³i Av‡qi Dci| †h e¨w³i Avq Kg †m me‡¶‡Î Kg e¨q K‡i Avevi †h e¨w³i Avq †ewk †m †ewk e¨q K‡i| Avevi †Kvb GKwU wbw`ó `‡e¨i ev †mevi wcQ‡b LiP †ewk n‡j Ab¨ `e¨ ev †mevi LiP Kwg‡q †`q| A_ev Ab¨ †Kvb Drm n‡Z avi K‡i| Avi Gfv‡eB e¨w³ Zvi Avq-e¨‡qi wnmve K‡i _v‡K| GB wbw`ó mg‡qi Rb¨ MnxZ Aw_K cwiKíbv‡KB ev‡RU e‡j| ev‡RU ˆZixi cavb KviY nj Av‡qi mxgve×Zv| Avmb GKwU wP‡Îi gva¨‡g ev‡RU eSvi †Póv Kwi|

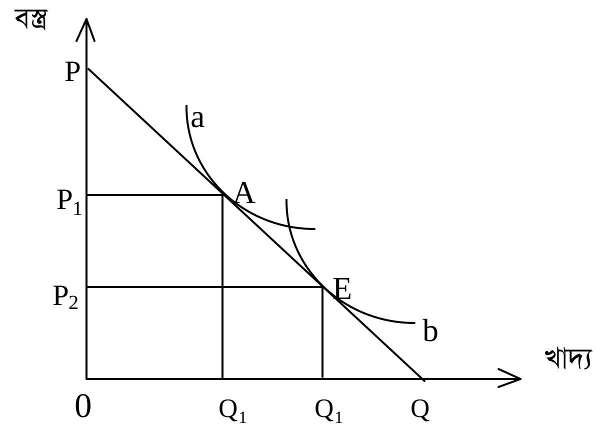

wPÎ : ev‡RU

Dc‡ii wPÎ Abhvqx, GKRb e¨w³i Avq hw` 1000 UvKv nq Z‡e Zv w`‡q †m OP cwigv‡Y e¯• A_ev OQ cwigv‡Y Lv`¨ †fvM Ki‡Z cvi‡e| H e¨w³ hw` Dfq `e¨B †fvM Ki‡Z Pvq Z‡e Zv‡K Dfq `‡e¨i †fvM Kgv‡Z n‡e| Zvn‡j PQ †iLvi †h †Kvb we›`‡Z H e¨w³ Zvi †fvM cQ›` Ki‡Z cv‡i| mZivs PQ †iLvB nj H e¨w³i ev‡RU †iLv| c_g H e¨w³ hw` a mg cwigvY (iso-quant) Dc‡hvM †iLvq Ae¯'vb Ki‡Z Pvq Z‡e †m A we›`‡Z †fvM Ki‡e| A we›`‡Z †m $OP_1$ cwigv‡Y e¯• I $OQ_1$ cwigv‡Y Lv`¨ †fvM K‡i| GLb †m hw` Zvi Lv‡`¨i cwigvY evov‡Z Pvq Z‡e Zv‡K Aek¨B e‡¯•i cwigvY Kgv‡Z n‡e| hw` †m E we›`‡Z Zvi †fvM wbwðZ Ki‡Z Pvq A_vr b iso-quant G Ae¯'vb Ki‡Z Pvq Z‡e †m OP_2 cwigv‡Y e¯• I OQ_2 cwigv‡Y Lv`¨ MnY Ki‡e| Avgiv GUv ej‡Z cwi †h, a I b Dfq iso-quant Gi Xvj mgvb, KviY Zviv GKB †iLvq Ae¯'vb Ki‡Q| Zvn‡j ev‡RU †iLvi mKj we›`‡Z Dc‡hvM mgvb| H e¨w³‡K A n‡Z E †Z hvIqvi Rb¨ A_vr Q_1Q_2 cwigv‡Y Lv`¨ †fvM evwoi Rb¨ P_2P_1

cwigv‡Y e¯• †fvM Kgv‡Z n‡q‡Q| GB e¨w³‡K hw` GKwU †`k aiv nq Zvn‡j I wKš GKB Ae¯vi mwó nq| GKwU †`‡ki †¶‡Î e¯• I Lv‡`¨i cwie‡Z h_vµ‡g A_%bwZK Dbqb I mvgwRK Dbq‡bi K_v wPš• v Kwi| Zvn‡j I wKš GKB Ae¯vi AeZviY NU‡e| Zvn‡j Av‡qi Drm, e¨‡qi LvZmg• n, e¨‡qi Lv‡Zi g‡a¨ †Kvb Lv‡Z wK cwigvY e¨q n‡e BZ¨w` mweK wnmve-wbKvkB n‡ŽQ ev‡RU|

ev‡RU kãwU divmx kã 'Bougette' n‡Z Drcb| GB divmx kãwUi A_ nj e¨vM ev _‡j| ewUk A_gš• x 1733 mv‡j KgÝmfvq mec_g ev‡RU kãwUi †MvovcËb K‡i| †mB †_‡K ev‡RU kãwU e¨eüZ n‡q Avm‡Q|

miKvix A_e¨e¯vq ev‡RU n‡ŽQ miKvix Avq-e¨‡qi wnmve| GB K_wU ev‡RU kãUi Rb¨ chvß bq| eZgv‡b ev‡RU A_%bwZK bxwZ, wb‡qvM ew×, wewb‡qvM MVb, mÂq, wewb‡qvM ¯vbvš• i I ceYZv, FY MnY, mIg Avq I e›Ub, m¤ž‡`i Kvg¨ e¨envi, Kgms¯vb, Drcv`b, †eKviZ cfwZ‡K Aš• f³ K‡i| Avi ZvB ev‡RU‡K DP `‡ii Aw_K cwiKíbv ejv nq|

ev‡R‡Ui ¸i€Z :

AvawbK A_bxwZ‡Z ev‡R‡Ui ¸iZ I c‡qvRbxqZv Acwimxg| mvaviYfv‡e ev‡RU miKv‡ii GK erm‡ii m¤ve¨ Avq-e¨‡qi wnmve| ev‡R‡Ui GKw`‡K miKvix Av‡qi Drmmg• n I Av‡qi cwigvY Ges Aciw`‡K e¨‡qi LvZmg• n Ges c¯•weZ e¨‡qi cwigvY †`Lv‡bv nq|

AvawbKKv‡j miKvi ev‡R‡Ui gva¨‡g wewfb A_%bwZK bxwZ ev¯•evqb K‡i| eZgvb ev‡R‡Ui gL¨ D‡Ïk¨ wb‡qvM ew× Kiv| wb‡qvM ew×i cavb kZ n‡ŽQ wewb‡qv‡Mi nvi ew× Kiv| AbbZ ev Dbqbkxj †`‡k †emiKvix wewb‡qv‡Mi cwigvY Avkvbi¦c bv nIqvq miKvi ev‡R‡Ui gva¨‡g cZ¨¶ ev c‡iv¶fv‡e †`‡ki wewb‡qv‡Mi nvi ew× K‡i| mZivs Kwg•¶Z ¯•‡i wewb‡qvM †cŠQv‡bvi Rb¨ ev‡RU ¸i€Zc•Y fwgKv cvjb K‡i|

wewfb †¶‡Î †fvM e¨q nvm K‡i m¤ž` wewb‡qv‡M ¯vbvš• i, mÂq I wewb‡qv‡Mi ceYZv ew×, RbM‡Yi wbKU n‡Z Ki Av`vq K‡i Dnv Drcv`bkxj Kv‡R e¨q Kiv cfwZ Kv‡R ev‡RU mqswµq fwgKv cvjb K‡i| Zvn‡j Avgiv †`LwQ †h, ev‡R‡U cKwZ Ges c‡qv‡Mi †¶Î Ae¯v †f‡` KLbI AbK‡j Avevi KLbIev cwZK‡j hvq| GLb Avmb Avgiv cKvi‡f` Abhvqx ev‡R‡Ui ¸i€Z Av‡jvPbv Kwi –

mIg ev‡RU :

mIg ev‡R‡Ui msÁvg‡Z miKvix Avq e¨‡qi g‡a¨ mKj Ae¯vq fvimvg¨ eRvq ivLv DwPZ| G ev‡R‡U e¨‡qi cwigvY KLbI Avq A‡c¶v †ekx nIqv DwPZ bq| Avgv‡`i mweK A_bxwZ‡Z mIg ev‡R‡Ui cfve nj –

c_gZ : mIg ev‡RU bxwZ Abhvqx ev‡RU cYqb Ki‡j miKv‡ii c‡¶ wgZe¨qx nIqv m¤e| miKvi hLb Avq Abhvqx e¨q K‡i, ZLb ¯fveZtB AZ¨waK e¨q Kivi ceYZv nvm cvq| djk€wZ‡Z miKv‡ii c‡¶ †`Dwjqv nevi AvksKv K‡g hvq|

wØZxqZ : GB ev‡RU bxwZ AbmiY Ki‡j g`vùxwZi m¤vebv Kg _v‡K| KviY †Kvb Ae¯vq GKevi g`vùxwZ NU‡j Ges Zvi Rb¨ NvUwZ ev‡RU bxwZ AbmiY Ki‡j memgqB NvUwZ ev‡RU bxwZ AbmiY Ki‡Z n‡e| GB Pµ n‡Z †ei n‡q Avmv ZLb KwVb n‡q `vovq|

ZZxqZ : mlg ev‡RU mgv‡R Avq ˆelg¨ ev‡× K‡ibv| KviY NvUwZ ev‡R‡Ui d‡j miKvi FY MnY K‡i cwiPwjZ nq| Avi GB F‡Yi †evSv mvaviY †jv‡Ki Dci Ki avh K‡i Av`vq Kiv nq| wKš GB F‡Yi A_ FY c`vbKvix abx †kYxB †c‡q _v‡K| d‡j Avq ˆelg¨ Av‡iv ev× cvq|

PZ_Z : mlg ev‡RU †`‡ki A_‰bwZK w¯wZkxjZv m¤‡Ü Rbmvavi‡Yi Av¯v ev× K‡i| Gi d‡j e¨w³MZ wewb‡qvM ev×i m¤vebv _v‡K|

Abkxjbx 1

we‡ki `vZv †MvôX (Aid Group) hw` †Kvb †`k‡K mvnvh¨ K‡i Z‡e Zv †m‡`‡ki mlg ev‡RU bxwZi Dci wK †Kvb cfve †d‡j? hw` DËi Ôn¨vÕ nq Z‡e KviY wjLb Avi ÔbvÕ n‡j I KviY wjLb|

NvUwZ ev‡RU :

AvawbK A_bxwZwe`MY mlg ev‡RU bxwZ mg_b K‡ib bv| †`‡ki o Y-Kgms¯v‡bi ¯• i eRvq ivLv I `€Z A_‰bwZK Dbqb Ges Rbmvavi‡Yi Rxebhv Îvi gvb Dbqb cfwZi Rb¨ mlg ev‡RU bxwZ A‡c¶v NvUwZ ev‡RU bxwZi ¸i€Z †ekx| KviY –

c_gZ : RvZxq A_bxwZ fvimvg¨ Avbvi †Póv bv K‡i ïa ev‡R‡U mgZv Avbq‡bi †Póvi †Kvb hw³ †bB| eis AvqKi, Rxebhv Îvi gvb cfwZ Dbq‡bi Rb¨ c‡qvRb‡ev‡a NvUwZ ev‡RU AbmiY Kiv DwPZ|

wØZxqZ : eZgv‡b c‡Z¨K †`‡ki ivR¯bxwZi cavb j¶¨ mgv‡R c• Y-Kgms¯v‡bi ¯• i eRvq ivLv| G Rb¨ ewYR¨PµKvjxb ev‡RU cYqb Kiv †h‡Z cv‡i| Avi Zv nj Amg ev‡RU bxwZ| ewYR¨ P‡µi mgq e¨w³MZ Avq I wewb‡qvM nvm cvq| G mgq miKvi hw` NvUwZ ev‡RU bxwZi Abmi‡Y MVbg• jK Kv‡R A_ e¨q K‡i, Z‡e †`‡k o Y Kgms¯v‡bi ¯• i _v‡K| G mg‡q †Kej Avq-e¨‡qi mgZvi Dci ¸i€Z Av‡ivc Ki‡j †`‡ki Kgms¯v‡bi cwigvY nvm cvq Ges †`‡k mgm¨v †`Lv †`q| m• Zivs e¨emvq-ewY‡R¨i g›`vi mgq miKv‡ii c‡¶ NvUwZ e¨q bxwZ AbmiY Kiv hw³m½Z|

ZZxqZ : GKwU †`‡ki A_‰bwZK DbwZi Rb¨ cPi g• jab c‡qvRb| wKš AbbZ †`‡ki RbM‡Yi gv_wcQ Avq Ges Ki c`v‡bi ¶gZv mxgve×| mlg ev‡R‡Ui gva¨‡g miKv‡ii c‡¶ Dbq‡bi Rb¨ c‡qvRbxq g• jab Ki n‡Z msMn Kiv m¤e bq| Gi¦c Ae¯vq A_‰bwZK Dbqb‡K MwZkxj Ki‡Z miKvi‡K Aek¨B NvUwZ ev‡RU bxwZ Aej¤b Ki‡Z n‡e|

PZ_Z : GUv g‡b Kiv †h‡Z cv‡i †h, NvUwZ ev‡R‡Ui d‡j g`vùxwZ †`Lv w`‡Z cv‡i| wKš †`‡k hw` cPi m¤ž` Ae¨eüZ _v‡K Zvn‡j NvUwZ ev‡RU bxwZ MnY Kiv n‡j I g`vùxwZi m¤vebv _v‡K bv| KviY NvUwZ ev‡R‡Ui d‡j GKw`‡K †hgb e¨q ev× cvq †Zgwb †`‡ki Drcv`bI ev× cvq| mZivs o Y wb‡qvM ¯•‡ii c• e chš• NvUwZ ev‡RU bxwZ cYq‡bi d‡j g`vùxwZi †Kvb m¤vebvB _v‡K bv| Aek¨ Dbqbkxj †`‡k e¨q ev×i m‡½ m‡½ Drcv`b ev× cvq bv e‡j NvUwZ ev‡R‡Ui d‡j wKQUv g`vùxwZ †`Lv w`‡Z cv‡i| Z‡e miKv‡ii mRvM `wó _vK‡j Ges Dbqb c‡Póv¸wj m¤ž• Y ev¯•ewqZ n‡j GB mgm¨v †Zgb cKU nevi m¤vebv _v‡K bv| ZvQvov GB g` g`vùxwZ ¶wZKi bq eis GUv †`‡ki Drcv`b I wewb‡qv‡M Drmvn ev× K‡i|

cÂgZ : mvaviYfv‡e g‡b n‡Z cv‡i, NvUwZ ev‡RU †`‡ki A_©bxwZK `• ejZvi cZxK| wKš GB avi Yv wVK bq| KviY, †`‡ki Kgms¯vb I A_©bxwZK Dbq‡bi w`‡K j¶¨ bv †i‡L ïa mgZvcvß ev‡R‡U †Kvb mv_KZv †bB| G ai‡bi mgZvcvß ev‡R‡Ui A_ nj AwZwi³ Ki avh¨ Kiv| Gfv‡e AwZwi³ Ki avh¨ K‡i ev miKvix e¨q nvm K‡i mgZvcvß ev‡RU cYqb Kiv m¤ž• Y A‡hŠw³K I wbi_K| Gi Øviv Dbqb KZc¶ I ckvmwbK e¨e¯vi `ejZv Ges A‡hvM¨ZvB cgwYZ nq| G Kvi‡Y NvUwZ ev‡RU bxwZ cYqb KLbB `ejZvi cwiPvqK bq eis †`‡ki Dbqb I c• Y-Kgms¯v‡bi Rb¨ GKvš• Acwinvh|

ivR¯ ev‡RU :

Gevi Avmb Avgiv ivR¯ ev‡R‡Ui cfve Av‡jvKcvZ Kwi| ai€b Avcwb evRv‡i †M‡jb Avj A_ev †Kvb `e¨ wKb‡Z| wM‡q †`L‡jb Avj i `vg †e‡o †Mj| ¯fveZtB Avcbvi Avj †Kbvi ceYZv K‡g hv‡e| Avi GB `vg ew×i KviY hw` nq miKvix ivR¯bxwZ, Zvn‡j Avgiv ej‡Z cwi, Ki Av‡iv‡ci d‡j †Kvb `‡e¨i g• j¨ew×i Rb¨ gvb‡li H `‡e¨i †fv‡Mi ceYZv K‡g hvq| Avi †fv‡Mi ceYZv nvm †c‡j gvb‡li mÂ‡qi ceYZv ew× cvq| KviY MPC + MPS = 1 A_vr †fv‡Mi cwš• K ceYZv I mÂ‡qi cwš• K ceYZvi †hvMdj 1| ZvB GKwUi ceYZv nvm †c‡j Ab¨wUi ceYZv ew× cvq| G †_‡K ejv hvq Ki Av‡iv‡ci Rb¨ g• j¨¯• ‡ii DaŸMwZi d‡j gvb‡li mÂ‡qi ceYZv ew× cvq| hv A_©bxwZK Dbq‡bi GKwU cavb c•ekZ|

Abkxjbx 2

ivR¯ ev‡R‡Ui d‡j hw` Ki Av‡iv‡ci cwigvY nvm cvq Zvi cfve wK n‡Z cv‡i wjLb|

Dbqb ev‡RU :

GKwU †`‡ki Av_-mvgwRK †c¶vc‡U Dbqbg• jK ev‡R‡Ui cfve Acwimxg| GLb Avmb Avgiv Gi cfve wek`fv‡e we‡kl Y Kwi –

wk¶v‡¶‡Î : wk¶v m¤žmviY, wk¶vi nvi ew×, wk¶v cwZôv‡bi MVb wk¶K‡`i fvZv cfwZ †¶‡Î miKvi wewfb Dbqbg•jK ev‡RU cYqb K‡i|

¯v¯'‡¶‡Î : wewfb nvmcvZv‡ji MVb I Dbqb, Wv³vi‡`i †eZb, nvmcvZv‡ji i¶Yv‡e¶Y, Jla I c‡qvRbxq wRwb‡mi mieivn BZ¨w` c`v‡bi gva¨‡g miKvi Zvi Dbqbg•Lx KgKv‡Ûi cwiPvjbv NUvq|

evm¯vb : miKvix KgKZv I KgPvix‡`i evm¯v‡bi wbðqZv, `¯ I eb¨v `MZ GjvKv Ges h‡×i mgq evm¯v‡bi mnvqZv c`vb miKvix DbqbgjK ev‡R‡Ui GKwU cavb LvZ|

mvgwRK : Dc‡iv³ Kvhw` m¤žv`b QvovI wewfb agxq cwZôvb †hgb – gmwR`, gw›`i, MxRv cfwZ, mvs¯wZK cwZôvb †hgb – mvs¯wZK †K›` BZ¨w` MVb I i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ miKvi Zvi Dbqbg•jK ev‡R‡Ui GKUv eo Ask e¨q K‡i|

wewea : GQvov mvs¯wZK †¶‡Î Ges iv¯• vNvU cfwZ Dbq‡b miKvi cPi e¨q K‡i _v‡K Ges Zv Dbqbg•jK ev‡R‡Ui cfve|

chv‡jvPbv :
mlg ev‡RU
mlg ev‡R‡Ui cfve
NvUwZ ev‡RU
ivR¯ ev‡R‡Ui cfve
Dbqbg•jK ev‡R‡Ui LvZ|

m¤ž‡`i Kvg¨ e›Ubl ev‡R‡Ui GKwU D‡jL‡hvM¨ fwgKv| Dbqbkxj †`k¸‡jv‡Z Ae¨eüZ m¤ž‡`i cZjZv _vKv m‡Ël mô e›U‡bi Afv‡e A_%bwZK cewׄ nq bv| A_vr Dbqb I Drcv`‡b wewb‡qv‡Mi Rb¨ c‡qvRbxq cwR I Drcv`b †KŠk‡j i h‡_ó Afve i‡q‡Q| miKv‡ii Aw_K bxwZ cavb j¶¨ cwR MV‡bi nvi ewׄ Kiv Ges Dbqb‡K ZiwšZ Kiv| Avi Gi cavb wfwË nj ev‡RU| ev‡RU cYq‡bi mgq miKvi Dnvi Ki I e¨qbxwZ Ggbfv‡e wbaviY K‡i hv‡Z †`‡ki cvß m¤ž` Abrcv`bkxj LvZ n‡Z Drcv`bkxj Lv‡Z cewnZ nq Ges m¤ž‡`i Kvg¨ e¨envi wbwðZ nq|

A_%bwZK ˆelg¨ `• i Kiv Ges m¤ž` I Av‡qi mlg e›Ub wbwðZ Kiv miKv‡ii Ab¨Zg cavb j¶¨| Avi GUv wbwðZ Ki‡Z n‡j KibxwZ I e¨qbxwZ Ggb n‡Z n‡e †hb Zv gwó‡gq †jv‡Ki nv‡Z †K›`xfZ bv _v‡K| Gi Rb¨ miKvi cMwZkxj Ki e¨e¯v cYqb Ges n¯• všŸ i e¨‡qi ewׄi gva¨‡g Avq I m¤ž‡`i AmgZv `• i Kiv †h‡Z cv‡i| ewYR¨P‡µi cwZ‡iva Ges A_%bwZK w¯wZkxjZv eRvq ivLv miKv‡ii Aw_K bxwZi GKwU ¸i€Zc• Y j¶¨| ewYR¨P‡µi †ZRxfv‡ei mgq †`‡k g`vùxwZ †`Lv w`‡j miKvi DØË ev‡RU cYqb K‡i g`vùxwZ †iva K‡i| Avevi ewYR¨P‡µi g›`vfv‡ei mgq g`v ms‡KvPb †`Lv †`q| d‡j mgv‡R Drcv`b, Kgms¯vb nvm cvq| †eKviZ ewׄ cvq| GB Ae¯vq miKvi NvUwZ ev‡RU cYqb K‡i A_bxwZ‡Z i¶v K‡i|

mZivs GUv ¯žó †h, ev‡RU ïa miKv‡ii Avq-e¨‡qi `wjjB bq, GUv miKv‡ii A_%bwZK D‡Ïk¨ I j¶¨ AR‡bi mnvqK wn‡m‡e KvR K‡i| GKwU †`‡ki mwweK A_%bwZK Dbqb I miKv‡ii Aw_K bxwZ ev¯•evq‡bi ev‡R‡Ui fwgKv AMMY¨|

Avq-e¨‡qi mgZv `wó‡KvY n‡Z ev‡RU `ÔcKvi – mlg ev‡RU I Amg ev‡RU| †h ev‡R‡U m¤ve¨ Avq I m¤ve¨ e¨‡qi cwigvY mgvb _v‡K ZvB mlg ev‡RU| G RvZxq ev‡R‡U miKvi Avq-e¨‡qi fvimvg¨ i¶v K‡i e‡j H miKvi‡K wgZe¨qx miKvi ejv nq|

c¶vš• ‡i †h ev‡R‡U Avq-e¨‡qi m¤ve¨ cwigvY mgvb nq bv Zv Amg ev‡RU| hw` ev‡R‡U e¨q A‡c¶v Avq †ekx nq Z‡e Zv DØË ev‡RU Ges Avq A‡c¶v e¨q †ekx n‡j Zv NvUwZ ev‡RU| AvaywbK A_bxwZ‡K MwZkxj ivL‡Z wewfb †`‡kB Amg ev‡R‡Ui cYqb ewׄ cv‡e|

Avq-e¨‡qi cKwZ Abmv‡i ev‡RU wZb ai‡Yi| †hgb – ivR¯ ev‡RU, Dbqb ev‡RU I g•jabx ev‡RU|

ivR¯ ev‡RU :
miKv‡ii ivR¯ Avq I ckvmwbK e¨‡qi wnmve n‡ŽQ ivR¯ ev‡RU| ivR¯ ev‡R‡Ui A_ g•jZt cZ¨¶ I c‡iv¶ K‡ii gva¨‡gB msMnxZ nq|

Dbqbg•jK ev‡RU :

†`‡ki Dbqbg• jK †hgb — iv¯• vNvU, ¯‹j-K‡jR, nvmcvZvj cfwZ Lv‡Z miKv‡ii Avq-e¨v‡qi wnmv‡eB nj Dbqbg•jK ev‡RU|

g•jab ev‡RU :

g• jab ev‡RU nj bZbf v‡e mwÂZ g• jab m¤ž` A_ev ¶qcvß ev e¨enví Abc‡hvMx g•jab m¤ž‡`i wee iY|

Abkxjbx 1

mIg I Amg ev‡R‡Ui g‡a¨ †Kvbw U †kq wjLb|

chv‡jvPbv :

ev‡RU nj Avq-e¨‡qi wnmve
mIg ev‡RU I Amg ev‡RU
ivR¯ ev‡RU, Dbqbg•jK ev‡RU I g•jabx ev‡RU|

cv‡VvËi g•j¨vqb

1| ev‡R‡Ui msÁv wK? ev‡RU †Kb ¸i€Zc•Y Av‡jvPbv Ki€b|
2| ev‡RU KZ cKvi I wK wK? Av‡jvPbv Ki€b|
3| miKvix ev‡RU KZ w`‡bi Rb¨ ejer _v‡K?
K. 6 gvm L. 1 eQi
M. 2 eQi N. 5 eQi
4| wk¶vi Rb¨ eivÏKZ ev‡RU wK ai‡Yi?
K. mIg ev‡RU L. Amg ev‡RU
M. Dbqb ev‡RU N. g•jab ev‡RU
5| ewYR¨P‡µi g›`vfv‡ei `i€b †Kvb Ae¯vi mwó nq?
K. g`v ms‡KvPb L. g`vùxwZ
M. g`vi Aeg•j¨vqb N. †KvbwUB bq
6| ckvmwbK e¨q †Kvb ev‡R‡Ui Aš•f ³?
K. ivR¯ ev‡RU L. Dbqbg•jK ev‡RU
M. g•jab ev‡RU N. NvUwZ ev‡RU
7| †Kvb ev‡R‡U Ri€ix Ae¯v †gvKwe jv Kiv mnRZi —
K. mIg ev‡RU L. Amg ev‡RU
M. Dfq †¶‡Î N. †Kvb †¶‡ÎB bq|

mgm¨v 6 :

ai€b GKwU †`‡ki RvZxq ev‡R‡U Av‡qi cwigvY 10,000 UvKv Ges e¨‡qi cwigvY 6,000 UvKv|

GLb bx‡Pi cÖkœ¸wji DËi w`b|

1| ev‡RU wK ai‡bi?

2| G ev‡R‡Ui mweav wK?

3| ewYR¨P‡µ G ev‡R‡Ui cÖfve wK?

4| g›`v ms‡KvP‡b G ai‡Yi ev‡R‡Ui †Kvb cÖfve Av‡Q wK? hw` _v‡K Z‡e Zv wK?

cv‡VvËi g~j¨vqb

cvV 1 :

4. L, 5. K, 6. N, 7. M, 8. N

cvV 2 :

4. M, 5. M, 6. K, 7. M, 8. N

cvV 3 :

3. N, 4. N, 5. M, 6. L, 7. L

cvV 4 :

5. K, 6. M, 7. L, 8. L, 9. N

cvV 5 :

1. K, 2. K, 3. N, 4. L, 5. K

cvV 6 :

3. L, 4. M, 5. K, 6. K, 6. K, 7. L

cvV 7 :

3. L, 4. N, 5. L, 6. M, 7. L

cvV 7 : wewfb cKvi ev‡R‡Ui cfve

D‡Ïk¨

GB cvV †k‡l Avcwb –

- mlg ev‡R‡Ui cfve
- Amg ev‡R‡Ui cfve
- ivR¯ ev‡R‡Ui cfve

c• eeZx cv‡V Avgiv ev‡R‡Ui msÁv Ges Gi cKvi‡f` wb‡q Av‡jvPbv K‡iwQ| GLb Avgiv A_bxwZ‡Z Gi cfve wb‡q Av‡jvPbv Kie|
miKvix ev‡RU wK iKg nIqv DwPr Zv wb‡q wewfb gZ‡f` i‡q‡Q| GKU wPš• v Ki‡j Avcwb I mgm¨vq co‡Z cv‡ib|
ai€b, †`‡k cej eb¨v nj| miKvix ev‡RU hw` mlg nq Z‡e miKvi GB Ri€ix Ae¯v wbim‡b h‡_ó D‡`¨vMx n‡Z cvi‡e bv|
Avevi ai€b G eQi KlK‡`i djb Kg nj| KlK‡`i i¶v Kivi Rb¨ miKvix Amg ev‡RU (NvUwZ ev‡RU) bxwZ MnY K‡i| G‡Z K‡i KlK‡`i g‡a¨ AwaK dj‡bi ceYZv nvm cv‡e| KviY Zvi miKvi n‡Z fZKx cv‡ŽQ| G‡Z K‡i mwieK Drcv`b nvm cv‡e Ges `wi`Zv ew× cv‡e| Avevi miKvix ev‡RU bxwZi Rb¨, we‡kl K‡i ivR¯ ev‡RU, `‡e¨i `vg †e‡o †Mj| Zvn‡j gvb‡li †fvM ceYZv K‡g hv‡e d‡j Aw_K AeKvVv‡gv Aw¯wZkxj n‡q co‡e|

cvV 6 :

1| A_bxwZ‡Z wewfb cKvi ev‡R‡Ui cfve Av‡jvPbv Ki€b|

2| NvUwZ ev‡R‡Ui mweav¸‡jv Av‡jvPbv Ki€b|

3| †Kvb ev‡R‡U miKv‡ii Avq-e¨q mgvb _v‡K?

K. DØË ev‡RU	L. mlg ev‡RU
M. NvUwZ ev‡RU	N. Dbqb ev‡RU

4| ewYR¨ P‡µi mg‡q miKvi †Kvb ev‡RU bxwZ AbmiY K‡i|

K. mlg ev‡RU	L. DØË ev‡RU
M. NvUwZ ev‡RU	N. L I M DfqB

5| †Kvb cKvi †`‡ki RbM‡Yi Ki c`v‡bi ¶gZv mxwgZ?

K. DbZ †`k	L. Dbqbkxj †`k
M. AbbZ †`k	N. †KvbwUB bq|

6| †Kvb ev‡R‡U g`vùxwZ mwó n‡Z cv‡i?

K. mlg ev‡RU	L. g•jabx ev‡RU
M. NvUwZ ev‡Ri	N. ivR¯ ev‡RU

7| †fv‡Mi cwš•K ceYZv I mÂ‡qi cwš•K ceYZvi †hvMdj KZ?

K. k•b¨ (0)	L. GK (1)
M. `B (2)	N. Amxg (∝)

mgm¨v 7 :

bx‡Pi `e¨¸‡jv ch‡e¶Y Ki€b|

1| iv¯•v-NvU

2| g`vùwZ

3| Avq-‰elg¨

4| Ki Av‡ivc

5| wk¶v †¶Î

Gevi Dc‡ii †KvbwU †Kvb cKvi ev‡R‡Ui Aš• f³ Zv wjLb| hw³mn Avcbvi e³‡e¨i c‡¶ wjLb|

অর্থ

ইউনিট ৩

পাঠ ১ : দ্রব্য বিনিময় প্রথা ও অর্থের ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- দ্রব্য বিনিময় প্রথা সম্পর্কে বলতে পারবেন ;
- অর্থের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থ আবিষ্কারের পূর্বে দ্রব্যের মাধ্যমে বিনিময় কার্য সম্পাদিত হত। কিন্তু এ প্রথায় নানা জটিলতার কারণে মানুষ অর্থ আবিষ্কারের প্রয়োজন অনুভব করে এবং অর্থের আবিষ্কার সকল জটিলতার অবসান ঘটায়। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে অর্থ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এ পাঠে দ্রব্য বিনিময় প্রথা ও তার অসুবিধাসমূহ তুলে ধরে অর্থের ক্রমবিকাশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

দ্রব্য বিনিময় প্রথা

অর্থের আবিষ্কার এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহারের পূর্বে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লেনদেন অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে সম্পাদন করত। মানুষ তাদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত দ্রব্যের বিনিময়ে তারা যে সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারত না সেসব প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্যের নিকট থেকে সংগ্রহ করত। দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের এরূপ সরাসরি বিনিময়কে 'দ্রব্য' বিনিময় প্রথা বলা হয়। যেমন- কামার তা দা-ছুড়ি-কুড়ালের বিনিময়ে কৃষরের নিকট থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করত, জেলে তার মাছের পরিবর্তে কৃষকের নিকট থেকে ধান-চাল, তাঁতীর নিকট থেকে কাপড় সংগ্রহ করত। এ বিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকার পশ্চাতে দু'টো মৌলিক কারণ বিদ্যান ছিল (১) শ্রম বিভাগের সৃষ্টি এবং (২) সর্বজন গ্রাহ্য বিনিময় মাধ্যমের অভাব।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার কার্যকর হওয়ার জন্য তিনটি পূর্বশর্ত :

১. একজনের দ্রব্য অন্যজনের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে ;
২. কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের বিনিময়ে নিজের দ্রব্য প্রদানের ইচ্ছা থাকতে হবে ;
৩. অন্যের দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ নিজের ত্যাগকৃত দ্রব্যের উপযোগ পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত উপযোগ ও ত্যাগকৃত উপযোগ সমান।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ

সুদীর্ঘ সময় ব্যপী মানব সমাজে দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকলেও তা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এই বিনিময় অর্থনীতি কেবলমাত্র প্রাচীন জীবনপদ্ধতির জন্য মোটামুটি চলনসই ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানব জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকতর হয়। ফলে দ্রব্য বিনিময় প্রথা তার সাথে তাল মিলিয়ে উঠতে অক্ষম হয়। নিম্নে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. **অভাবের অসামঞ্জস্যতা :** দ্রব্য বিনিময় প্রথার সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল বিনিময়কারীদের অভাবের অসামঞ্জস্যতা। মনে করুন একজন ক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং অন্যজন খ দ্রব্য উৎপাদন করে। এমন হতে পারে যে ক-দ্রব্য উৎপাদনকারীর খ-দ্রব্যের প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে বিনিময় সম্ভব নয়। তাই এমন দু'জনের মধ্যে বিনিময় হবে যাদের কাছে পরস্পরের দ্রব্যের চাহিদা বিদ্যমান। আর এ কাজ কষ্টসাধ্য, সময় সাপেক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

২. **দ্রব্যের অবিভাজ্যতা :** বিনিময়কারীদের মধ্যে অভাবের মিল থাকলেও দ্রব্য বিনিময় করা সম্ভব হয় না দ্রব্যের অবিভাজ্যতার কারণে। মনে করি, জনাব জাহাঙ্গীরের ২০ কেজি চালের দরকার। কিন্তু তার কাছে একটি গরু আছে যার বিনিময়ে ৮০ কেজি চাল পাওয়া যায়। তাই ২০ কেজি চালের জন্য গরুটির চার ভাগের এক অংশ দিতে হবে যা অসম্ভব, এক্ষেত্রে বিনিময় অসম্ভব অথবা গরুটির বিনিময়ে ৮০ কেজি চালই নিতে হবে।

৩. **সাধারণ মূল্যমানের অভাব :** এ প্রথায় বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণের কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ছিল না। তাই একটি দ্রব্যের সাথে অন্যান্য দ্রব্য কি হারে বিনিময় করা হবে তা নির্ধারণ খুব অসুবিধাজনক ছিল। দ্রব্যের পারস্পরিক চাহিদার তীব্রতার উপর বিনিময় হার নির্ভর করত। এই পারস্পরিক চাহিদার তীব্রতা সদা পরিবর্তনীয় ছিল বলে বিনিময় হারও পরিবর্তনীয় ছিল। তাই সঠিক পরিমাপকের অভাবে দ্রব্য বিনিময়ে অসুবিধা হত।

৪. **সঞ্চয়ের অসুবিধা :** দ্রব্য বিনিময় প্রথার যুগে সঞ্চয় করা অসুবিধাজনক ছিল। এমন কি অসম্ভবও ছিল। কেউ সঞ্চয় করতে চাইলে দ্রব্যের আকারে তা করতে হত। পচনশীল দ্রব্য সঞ্চয় করতে চাইলে তার উপযোগ নষ্ট হয়ে যেত, এছাড়া দ্রব্য সামগ্রী মজুত রাখতে সংরক্ষণ ব্যয়ও বেশি পড়ত। এসব কারণে সঞ্চয় করা সম্ভব হত না।

৫. **মূল্য স্থানান্তরের অসুবিধা :** দ্রব্য বিনিময় প্রথায় একস্থান হতে অন্যস্থানে সম্পদের মূল্য স্থানান্তরের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না।

৬. **ঋণ পরিশোধের অসুবিধা :** এ প্রথায় ঋণ গ্রহীতা যে দ্রব্যের আকারে ঋণ গ্রহণ করত সেই একই দ্রব্য দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হত। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হত না। ফলে ঋণের আদান প্রদান অসুবিধাজনক এবং খুব সীমিত ছিল।

এসব অসুবিধার কারণে দ্রব্য বিনিময় প্রথা সমাজে অচল হয়ে পড়ে এবং মানুষ এ প্রথার বিকল্প মাধ্যম হিসেবে অর্থ আবিষ্কার করে। লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার বিনিময় প্রথার সকল অসুবিধা দূর হয় এবং সামজ জীবনে সূচীত হয় নতুন দিগন্তের। অর্থ আবিষ্কারের ফলে লেনদেন ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে, সঞ্চয়ের ধারা সৃষ্টির মাধ্যমে মূলধন গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছে, অর্থনীতিতে এসেছে গতিশীলতা। মানবজীবনে এসেছে সমৃদ্ধি।

অর্থের ক্রমবিকাশ

অর্থের বর্তমানরূপ মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির পরিচায়ক। এমন এক সময় ছিল যখন অর্থ বা বিনিময়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন সকলেই নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন

করতে সক্ষম ছিল। কালক্রমে মানুষের অভাবের বৈচিত্র্য এবং শ্রমবিভাগের প্রবর্তন স্বাবলম্বিতা হ্রাস করে। এ প্রথার নানা অসুবিধার কারণে তা সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। ফলে সমাজে চালু হয় সামগ্রী মুদ্রা প্রথা যে ব্যবস্থার বিভিন্ন দ্রব্য (যেমন- কড়ি, পশু, চামড়া, পাথর প্রভৃতি) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু হয়। নানা অসুবিধার কারণে তাও সমাজে বেশিদিন চালু থাকেনি। এরপর শুরু হয় মূল্যবান ধাতুর যুগ। সে সময় মূল্যবান ধাতবপিন্ড (যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধাতব পিন্ডের ওজন, আকার, গুণাগুণের তারতম্যের কারণে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে এ প্রথাও টিকেনি। অতঃপর শুরু হয় মূল্যবান ধাতব মুদ্রার যুগ। এ যুগে সোনা, রুপা, তামা ইত্যাদি গলিয়ে বা পিটিয়ে বিভিন্ন ওজন, আকার আকৃতির ও মানের মুদ্রা তৈরি করা হত। সেগুলোর গায়ে রাজা বাদশার ছবি কিংবা অন্যান্য নকশার ছাপ মারা হত। কিন্তু মূল্যবান ধাতুর সীমিত যোগানের কারণে এবং মুদ্রা তৈরী অধিক ব্যয়বহুল বলে এ প্রথাও স্থায়ী হয়নি। এ প্রথার পরে সমাজে অর্থের যে রূপ দেখা দেয় তা আজও টিকে আছে। আর তা হলো কাগজী মুদ্রা। কাগজী মুদ্রা ছিল বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য, বহনযোগ্য এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রার সকল গুনাগুন সম্পন্ন। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র এ মুদ্রা পাকা আসন দখল করে আছে। প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা/বৈদিশিক স্ট্যান্ডার্ড মুদ্রা জমা রেখে তার বিপরীতে কাগজী নোট ছাপায় বর্তমান বিশ্বে অর্থের আরেকটি রুপ দেখা যায় যা আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায় ব্যবহৃত তা হলো বিভিন্ন ধরনের মানপত্র (যেমন- চেক, হুন্ডি, ব্যাংক ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলতে কি বুঝেন? এ প্রথার অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।

২. অর্থের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

পাঠ ২ : অর্থের সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

- অর্থের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন ;
- অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন ;
- আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

এ পাঠে অর্থের সংজ্ঞা অর্থের কার্যাবলী ও আধুনিক অর্থনীতিতে তার ভূমিকা আলোচনা করব।

অর্থের সংজ্ঞা

দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় এবং ঋণ পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে যা সর্বজন গ্রাহ্য তাকে অর্থ বলে। অর্থ বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট বাহন। অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্নভাবে অর্থকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ওয়াকারের মতে, "অর্থ যা করে তাই অর্থ"। অনেকের মতে রাষ্ট্র দ্বারা ঘোষিত এবং আইন দ্বারা স্বীকৃত বস্তুই অর্থ। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রচলনকৃত কাগজী ও ধাতব বস্তুর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে তাকেই একমাত্র অর্থ হিসেবে মেনে নেয়া যায়। কোলেন এর মতে, "অর্থ এমন একটি বস্তু যা সকলেই সাধারণভাবে দেনা পাওনা মেটাতে এবং দাম পরিশোধ করতে ব্যবহার করে"। সেয়ার্সের মতে, "দেনা পাওনা মেটানোর কাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত কোন বস্তুকে অর্থ বলে"। ক্রাউয়ারের মতে,"যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সংস্কারের বাহন হিসেবে কাজ করে তাই অর্থ"। লর্ড কীনস্ এর মতে,"অর্থ এমন একটি দ্রব্য যা হস্তান্তর করে ঋণের চুক্তি ও দামের চুক্তি মেটানো যায় এবং যার মাধ্যমে ক্ষমতা সংরক্ষণ করা যায়"।

সুতরাং, যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায় হিসেবে সর্বজন গৃহীত এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকেই অর্থ বলে। অর্থ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রুপী, জাপানে ইয়েন, জার্মানীতে মার্ক, যুক্তরাজ্যে পাউন্ড স্টার্লিং, যুক্তরাষ্ট্রে ডলার।

অর্থের কার্যাবলী

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে অর্থের প্রচলন হলেও পরবর্তীতে তার কার্যক্রম আরও ব্যাপক হয়ে উঠে। উৎপাদন, ভোগ, বন্টন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণের আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজ অর্থের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতিবিদগণ অর্থের নানা কার্যাবলীর উল্লেখ করেছেন কেহ কেহ অর্থের বিভিন্ন কাজকে নিম্নোক্ত তিনটি দৃষ্টিকোণে দেখেছেন :

(১) প্রাথমিক কার্যাবলী, (২) মাধ্যমিক কার্যাবলী ও (৩) সহায়ক কার্যাবলী। প্রাথমিক কার্যাবলী বলতে অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অর্থের মাধ্যমিক কার্যাবলী হিসেবে মূল্যের ভান্ডার এবং স্থগিত লেনদেনের মান নির্ধারণকে বিবেচনা করেছেন। আর সহায়ক কার্যাবলী তারতম্য, আয় বন্টন ইত্যাদির মধ্যে নিহিত। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বিস্তৃত অর্থে অর্থের কার্যাবলীকে দুই অংশে বিভক্ত করেছেন : (১) স্থিতিশীল কার্যাবলী ও (২) গতিশীল কার্যাবলী। আবার স্থিতিশীল কার্যাবলীকে তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) বাণিজ্যিক কার্যাবলী, ২) সামাজিক কার্যাবলী ও (৩) মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী।

অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলী নিম্নোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় :

"Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard and a store"

অর্থাৎ - "অর্থের কার্য হল চার,
মাধ্যম, পরিমাপক, মান ও ভান্ডার"।

নিম্নে অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচিত হলো :

১. **বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange) :** অর্থের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেন সম্পন্ন করা। অর্থ সর্বজন গৃহীত বলে এর মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন দ্রব্য বা সেবা যে কোন পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় করা যায়।

২. **মূল্যের পরিমাপক (Measure of Value) :** প্রতিটি দ্রব্য ও সেবার বিনিময় মূল্য অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। যেমন – এক মণ চালের দাম ৬০০ টাকা, ১ ভরি সোনার দাম ৬৫০০ টাকা, বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণেও অর্থের ভূমিকা রয়েছে।

৩. **স্থগিত লেনদেনের মান (Standand of Deferred Payments) :** ঋণ আদান প্রদানের বা স্থগিত লেন দেনের মান হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হয়। ঋণ দাতা অর্থের আকারে ঋণ দেয় এবং ঋণগ্রহীতা অর্থের আকারে তা পরিশোধ করে। তাই ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ কালে হিসাবগত কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। ধারে ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য ও অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এতে ক্রেতা বিক্রেতার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

৪. **সঞ্চয়ের ভান্ডার (Store of Value) :** অর্থ সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। মানুষ তার উদ্বৃত্ত দ্রব্য সামগ্রী সঞ্চয় করতে চায়। কিন্তু জায়গা ও দ্রব্যের স্থায়ীত্বের অভাবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঝুঁকি বহুল বলে মানুষ দ্রব্যাদি সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। কিন্তু অর্থের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ সহজে এবং নিরাপদে সঞ্চয় করা যায়। ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যায়। সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে অর্থ মূলধন হিসাবে সহায়তা করে।

৫. **মূল্য স্থানান্তরের (Means of Value Transfer) :** অর্থ সব ধরনের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য স্থানান্তরের বাহন হিসেবে কাজ করে। মানুষ তার সম্পত্তি একসাথে বিক্রি করে যে অর্থ পায় তা দিয়ে অন্যস্থানে তা ক্রয় করতে পারে। যা দ্রব্য বিনিময় প্রথায় অসম্ভব।

৬. **খণের ভিত্তি (Basls of Credit) :** বর্তমানকালে ব্যবসায়িক লেনদেনের অধিকাংশ বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রের (চেক, ব্যাংক ড্রাফ্‌ট, বিনিময়পত্র ইত্যাদি) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র ইস্যু করে এবং ঋণপত্রধারীদের অর্থের চাহিদা পূরণ করে।

৭. **তারল্যের মান (Stamdasd of Liquidity) :** অর্থের সাহায্যে যে কোন দ্রব্য যে কোন সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। সুতরাং এটি সর্বপেক্ষা তরল সম্পদরূপে বিবেচিত। অর্থের এ তারল্য গুণের জন্য দ্রব্য সামগ্রীকে যেমন সহজে অর্থে রূপান্তর করা যায়, তেমনি অর্থকেও দ্রব্যসামগ্রীতে পরিণত করা যায়।

৮. **তৃপ্তিবৃদ্ধির উপায় (Means of Maximizing Satisfaction) :** ভোক্তার প্রধান উদ্দেশ্য ক্রীত দ্রব্য থেকে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা। এ উদ্দেশ্যে ভোক্তা এমনভাবে তার নির্দিষ্ট আয় বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ব্যয় করে যাতে প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হয়।

অর্থের সামাজিক কার্যাবলী (Social Functions of Money)

সামাজিক জীবনে অর্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে বাণিজ্যিক ধরনের নয় এমন অনেক লেনদেনের বাহন

হিসেবে কাজ করে অর্থ। যেমন – উপহার, সাহায্য, জরিমানা, কর প্রদান ইত্যাদি লেনদেনে অর্থ ব্যবহৃত হয়। মানুষের সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

অর্থের মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী (Psychological Functions of Money)

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে মানুষ তার সম্পদের একাংশ সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় রাখতে চায়। অর্থই সবচেয়ে তরল সম্পদ হিসেবে তার এরূপ মনোবৃত্তিকে পূরণ করে। মানুষ ভবিষ্যতের বিপদ আপদ এবং অনিশ্চয়তা মোকাবেলার জন্য নগদ অর্থ হাতে রাখে এবং নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

অন্যান্য বা গতিশীল কার্যাবলী :

অর্থ উৎপাদন, ভোগ, সঞ্চয়, বন্টন, ব্যবসা বাণিজ্য, মূল্যের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থই সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রধান চালিকা শক্তি। বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম এবং মূল্যের পরিমাপক হিসেবে অর্থ বিনিময়ে ব্যবস্থাকে সহজ ও গতিশীল করেছে। সঞ্চয়ের বাহন এবং ঋণ আদান প্রদানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। অর্থের ব্যবহার জাতীয় আয় বন্টনকে সহজ করেছে। অর্থের ব্যবহার আভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বিস্তৃত করেছে। এক কথায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে শক্তিশালী উপাদান হলো অর্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. অর্থ কাকে বলে? আধুনিক অথনীতিতে অর্থের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৩ : অর্থের শ্রেণীভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অর্থের শ্রেণীভেদ বর্ণনা করতে পারবেন ;
- অর্থের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। আবার দেশে প্রচলিত অর্থের বিভিন্ন রূপও দেখা যায়। আমরা এ পাঠে অর্থের শেণীভেদ নিয়ে আলোচনা করব। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে অর্থকে শ্রেণীভেদ করা যায়।

অর্থের শ্রেণীভেদ (clasification of Money)

অর্থকে প্রথমতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন – হিসাবী অর্থ ও প্রকৃত অর্থ।

১. **হিসাবী অর্থ :** যে অর্থ বা মুদ্রার নামে জিনিসপত্রের দাম লেনদেন ও হিসাব নিকাশ রাখা হয় তাকে হিসাবী অর্থ বলা হয়। যেমন বাংলাদেশে টাকা, ভারতের রূপী, যুক্তরাষ্ট্রে ডলারের মাধ্যমে হিসাব নিকাশ ও বিনিময় চলে।

২. **প্রকৃত অর্থ :** যে অর্থের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ক্রয় বিক্রয় ও দেনা পাওনা সম্পন্ন হয় তাকে প্রকৃত অর্থ বলে। যেমন – বাংলাদেশের বিভিন্ন মানের ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট।

প্রকৃত অর্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – ধাতব মুদ্রা ও কাগজী অর্থ (নোট)।

ক) **ধাতব মুদ্রা :** যে প্রকৃত অর্থ ধাতু দ্বারা তৈরি তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। যেমন – বাংলাদেশের বিভিন্ন মানের ধাতব মুদ্রাগুলো। ধাতব মুদ্রাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয় ১) প্রামানিক ধাতব মুদ্রা ও ২) প্রতীক ধাতব মুদ্রা।

১) **প্রামাণিক মুদ্রা :** যে ধাতব মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য এবং অন্তর্নিহিত মূল্য সমান তাকে প্রামাণিক ধাতব মুদ্রা বলে। প্রামাণিক মুদ্রা গলিয়ে বিক্রি করলে মুদ্রার সমপরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়। যেমন – বৃটিশ আমলের ১ টাকার মুদ্রা।

২) **প্রতীক মুদ্রা :** যে ধাতব মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য তার অন্তর্নিহিত বা ধাতব মূল্যের চেয়ে বেশি তাকে প্রতীক মুদ্রা বলে। যেমন – বাংলাদেশের বিভিন্নমানের ধাতব মুদ্রাগুলো।

খ) **কাগজী অর্থ :** কাগজ দিয়ে যে অর্থ তৈরি তাকে কাগজী অর্থ বা কাগজী নোট বলে। দেশের সরকার তার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন মানের কাগজী নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে। কাগজী নোট ছাপানোর পেছনে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা/রূপা/বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে হয়। বাংলাদেশের ৫ টাকা, ১০ টাকা, ৫০০ টাকার নোট সমূহ কাগজী অর্থ।

কাগজী অর্থকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – ১) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী অর্থ, ২) পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ ও ৩) অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ।

১) **প্রতিনিধিত্ব মূলক কাগজী অর্থ :** সমমূল্যের সোনা, রূপা বা বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রেখে যে কাগজী নোটের প্রচলন করা হয় তাকে প্রতিনিধিত্ব মূলক কাগজী অর্থ বলে।

২) **পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ :** যে কাগজী নোটের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সোনা, রূপা বা বৈদেশিক মুদ্রা বাহককে দিতে বাধ্য থাকে তাকে পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ বলে। যেমন বাংলাদেশের ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ১০০ টাকা ও ৫০০ টাকার নোট সমূহ।

৩) **অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ :** যে কাগজী নোটের বিনিময়ে কোন ধাতব মুদ্রা, সোনা রূপা বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকে না এবং বাহককে প্রদান করে না তাকে অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ বলে। শুধু সরকারী আদেশেই এরকম নোট চালু থাকে। বাংলাদেশের ১ টাকা ও ২ টাকার নোট।

আইনগত দিক থেকে অর্থকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ১) বিহিত অর্থ ও ২) ঐচ্ছিক অর্থ।

১) **বিহিত অর্থ :** যে অর্থের গ্রহণযোগ্যতা আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং জনগণ তা গ্রহণ করতে বাধ্য, তাকে বিহিত অর্থ বলে। বিহিত অর্থকে সরকারী অর্থও বলা হয়। বিহিত অর্থ আবার দু'রকম : ক) সসীম বিহিত অর্থ ও খ) অসীম বিহিত অর্থ।

ক) **সসীম বিহিত অর্থ :** যে বিহিত অর্থ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি দেনা পরিশোধে গ্রহীতার আপত্তি থাকতে পারে তাকে সসীম বিহিত অর্থ বলে। যেমন – ১ টাকা, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ১০ পয়সা ও ৫ পয়সার মুদ্রা।

খ) **অসীম বিহিত অর্থ :** যে বিহিত অর্থ দ্বারা যে কোন পরিমাণ লেনদেন সম্পন্ন করা যায় এবং পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য তাকে অসীম বিহিত অর্থ বলে। যেমন – বাংলাদেশের ৫০০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০ টাকা, ২০ টাকা, ১০ টাকা, ৫ টাকার নোট সমূহ।

২) **ঐচ্ছিক মুদ্রা :** যে মুদ্রা গ্রহণ করার আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই বরং তা গ্রহণ করা গ্রহীতার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে তাকে ঐচ্ছিক মুদ্রা বলে। যেমন – চেক, ড্রাফ্‌ট, পে-অর্ডার, হুন্ডি, ট্রেজারী বিল ইত্যাদি।

উপরোক্ত শ্রেণীভেদ ছাড়া এ অর্থকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীভেদ করা যায় :

১) **আদিষ্ট অর্থ :** যে অর্থের কোন বস্তুগত মূল্য নেই এবং অন্য কোন ধাতু বা মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যায় না অথচ সরকারী নির্দেশে বিহিত অর্থ হিসেবে চালু আছে, তাকে আদিষ্ট অর্থ বলে। যেমন- ১ টাকার নোট।

২) **পরিচালিত মুদ্রা :** বাজারে দামস্তর স্থিতিশীল রাখা, পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকার মাঝে মাঝে বাজারে যে অর্থ চালু করে তাকে পরিচালিত মুদ্রা বলে। এটি পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় দুই-ই হতে পারে।

৩) **প্রায় মুদ্রা :** যে সকল সম্পদকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় না, তবে প্রয়োজনে অতি সহজে তরল মুদ্রায় প্রকাশ করা যায়, তাদেরকে প্রায় মুদ্রা বলে। যেমন- প্রাইজ বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারী বিল ইত্যাদি।

গ) **সরকারী অর্থ :** যে সকল মুদ্রা অল্প পরিমাণের এবং খুচরা ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাজারে চালু থাকে তাকে সরকারী মুদ্রা বলে। যেমন – বাংলাদেশের **১** টাকার নোটসহ বিভিন্ন মানের ধাতব মুদ্রাসমূহ।

নিচের চার্টের মাধ্যমে মুদ্রার শ্রেণীভেদ দেখান যায় :

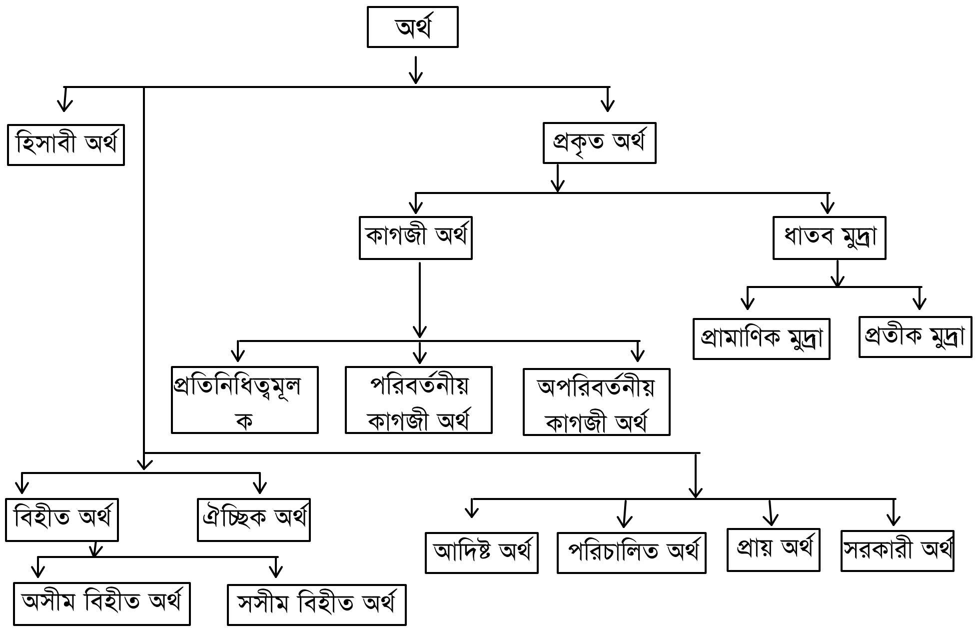

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে অর্থের শ্রেণীভেদ বর্ণনা করুন?
২. চার্টের মাধ্যমে অর্থের শ্রেণীভেদ উল্লেখ করুন?

পাঠ ৪ : অর্থের চাহিদা ও যোগান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অর্থের চাহিদা কি তা বলতে পারবেন ;
- অর্থের যোগান ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- অর্থের যোগানের উপাদানসমূহ কি কি তা বলতে পারবেন।

আমরা এ পাঠে অর্থের চাহিদা ও যোগান নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ কি কি কারণে অর্থের চাহিদা হয় এবং অর্থের যোগানের উপাদানসমূহ কি কি তা নিয়ে আলোচনা করব।

অর্থের চাহিদা (Demand for Money)

অর্থের নিজস্ব কোন চাহিদা নেই। ইহা বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে বলে মানুষ তা নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায়। আর এই ধরে রাখার প্রবণতাই তার চাহিদা নির্দেশ করে।

অর্থের চাহিদা সম্পর্কীয় অনেক তত্ত্ব ও গবেষণালব্ধ ফলাফল রয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনস্ এর তত্ত্বটিই আলোচনা করব। তার এই তত্ত্বটি 'নগদ পছন্দ তত্ত্ব' নামে খ্যাত। তার মতে, মানুষ নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় :

১. **লেনদেন উদ্দেশ্য :** মানুষ দৈনন্দিন লেনদেন মিটানোর জন্য কিছু নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়, কেননা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে অর্থ ধরে রাখাই হলো লেনদেনের উদ্দেশ্যজনীত অর্থের চাহিদা। এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদার পরিমাণ ব্যক্তিবর্গের লেনদেনের পরিমাণ ব্যয় অভ্যাস, আয় ব্যয়ের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান, আয়স্তর ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

২. **সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য :** সাবধানতার কারণে মানুষ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়। কোন জরুরী অবস্থা দেনা দিলে তা মোকাবেলার জন্য এ ধরনের অর্থ হাতে রাখে। এ উদ্দেশ্যে অর্থ হাতে ধরে রাখাকে বলা হয় সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (Precautionary demand for Money)। এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা আয়স্তর, তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ অনিশ্চয়তার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

মানুষের ব্যয় আচরণ, আয় প্রাপ্তির ব্যবধান ইত্যাদি স্থির অবস্থায় লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা মূলতঃ আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল। আর আয়স্তরের সাথে এদের সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ আয়স্তর বেশি হলে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা বেশি এবং আয়স্তর কম হলে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা কম হয়। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে লেখা যায়–

$M_1 = L_1 (y) = kY$ যেখানে M_1 = লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা, L_1 = তারল্য অপেক্ষক, Y = আয়স্তর, $k = M_1$ এবং y এর মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক প্রকাশকারী একটি ধনাত্মক স্থির রাশি। উপরোক্ত সমীকরণটি চিত্র ৩.১ এর মাধ্যমে দেখানো যায়। চিত্রে ভূমি অক্ষে আয়ের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে লেনদেনও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা দেখান হলো। দেখা যাচ্ছে আয় স্তর (y) বৃদ্ধির ফলে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (M_1) বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র ৩.১

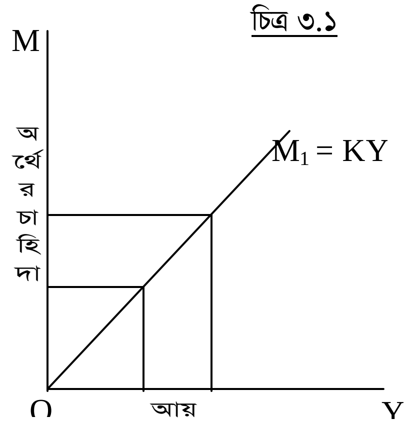

৩) **ফটকা উদ্দেশ্য :** বাজারের গতিবিধির সুযোগ গ্রহণ করে ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা লাভের আশায় মানুষ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়। এ উদ্দেশ্যে অর্থ হাতে রাখাকে ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (Speculative demand for money) বলে। এ উদ্দেশ্যে হাতে রাখা অর্থের পরিমাণ সুদের হারের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সুদের বেশি হলে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা কম এবং সুদের হার কম হলে অর্থের চাহিদা বেশী হয়। সমীকরণ সাহায্যে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা নিম্নরূপে দেখান যায় :

$M_2 = L_2(i)$ যেখানে M_2 = অর্থের ফটকা উদ্দেশ্য জনিত চাহিদা, L_2 = তারল্য অপেক্ষক i = সুদের যার। উপরোক্ত সম্পর্কটি চিত্র ৩.২ এর মাধ্যমে দেখান হলো :

চিত্র ৩.২

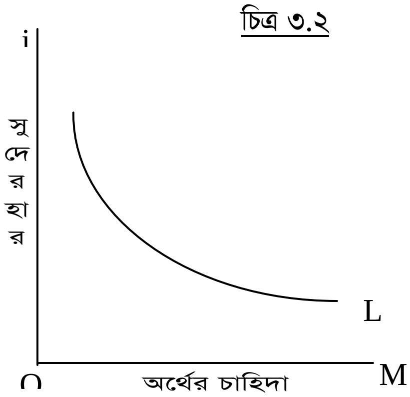

চিত্রে ভূমি অক্ষে অর্থের ফটকা উদ্দেশ্য জনিত চাহিদা এবং লম্ব অক্ষে সুদের হার প্রদর্শিত হলো। L_2 (i) রেখাটি ফটকা উদ্দেশ্যজনিত অর্থের চাহিদা রেখা যা ডানদিকে নিম্নগামী। এর অর্থ সুদের হারের সাথে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত।

অর্থের সামগ্রীক চাহিদাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করতে পারি : $M = M_1 + M_2 = L_1(y) + L_2(i)$। এখানে M হলো অর্থের সামগ্রীক চাহিদার পরিমাণ। এ চাহিদা অপেক্ষকের একটি দিক হচ্ছে সুদের হারের সাথে অর্থের চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং নিম্নতম সুদের হারে এ স্থিতিস্থাপকতা অসীম হতে পারে। ফলে অর্থের চাহিদা রেখাটি (LP) ডানদিকে নিম্নগামী এবং ন্যূনতম সুদের হারে তা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল (চিত্র ৩.৩)। এ সমান্তরাল অঞ্চলটিকে বলা হয় তারল্য ফাঁদ অঞ্চল।

চিত্র ৩.৩

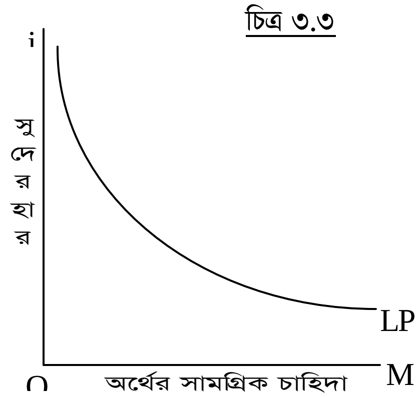

অর্থের যোগান (Supply of Money)

অর্থের যোগান বলতে বিহিত মুদ্রা, ব্যাংক মুদ্রা ও প্রায় মুদ্রার সমষ্টিকে বুঝায়। কারো কারো মতে অর্থের যোগান বলতে জনগণের নিকট রক্ষিত অর্থ, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত ও মেয়াদী আমানতের সমষ্টিকে বুঝায়। সমাজের মোট অর্থের যোগান বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত অর্থ, সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের আমানতকে বুঝায়।

অর্থের যোগানের উপাদান সমূহ :

১) **বিহিত মুদ্রা :** অর্থের যোগানের প্রধান উপাদান হলো বিহিত মুদ্রা। দেশের অভ্যন্তরে সকল লেন দেনের কাজে ব্যবহারের জন্য যে মুদ্রা সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত এবং যা সকলেই গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে, তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। দেশের অর্থের যোগানের বৃহতম অংশ এ বিহিত মুদ্রা।

২) **ব্যাংক মুদ্রা :** ব্যাংকের প্রকৃত আমানত ও সৃষ্ট আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারীগণ চেকের মাধ্যমে অর্থ উঠাতে পারেন। এ চেক নগদ অর্থের মতই তরল। ব্যাংক মুদ্রা অর্থের যোগানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩) **প্রায় মুদ্রা :** অর্থের যোগানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো প্রায় মুদ্রা। বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র (বিনিময় বিল, সরকারী বন্ড, ট্রেজারী বিল, পোষ্টাল ওর্ডার, প্রাইজবন্ড, সেভিংস সার্টিফিকেট ইত্যাদি) সহজেই নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। এগুলো অর্থ না হলেও অর্থের মত।

উপরোক্ত উপাদানসমূহের সমন্বয়ে অর্থের যোগান। এ উপাদান সমূহের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে অর্থের যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের যোগান স্থির বিবেচনা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অর্থের চাহিদা বলতে কি বুঝ ? মানুষ কি কি উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা অনুভব করে বর্ণনা কর।

২। অর্থের যোগান কি? অর্থের যোগানের উপাদানসমূহ উল্লেখ কর।

পাঠ ৫ : অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব কি তা বলতে পারবেন ;
- ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের দুর্বল দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে বুঝায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তা-ই অর্থের মূল্য। দামস্তর বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং দামস্তর হ্রাস পেলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আমরা এ পাঠে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity theory of Money)

অর্থের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন এবং অতি পরিচিত তত্ত্বটি হচ্ছে অর্থের পরিমাণতত্ত্ব যার প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক আরভিং ফিশার। অর্থের মূল্য নির্ভর করে অর্থের ক্রয় ক্ষমতার উপর। আবার ক্রয় ক্ষমতা নির্ভর করে দামস্তরের উপর। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তর সে হারে একই দিকে পরিবর্তিত হয় ফলে অর্থের মূল্য একই হারে বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং অর্থের মূল্য তার যোগান বা পরিমাণ এর উপর নির্ভর করছে। এটাই ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য।

ফিশারের মতে, সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর মত অর্থের মূল্যও তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে স্বল্পকালীন সময়ে মোট উৎপাদন ও সেবার পরিমাণ স্থির থাকে বলে অর্থের চাহিদার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। তাই অর্থের যোগানের হ্রাস বৃদ্ধির দরুন অর্থের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।

অর্থের চাহিদা : দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অর্থের চাহিদা হয়। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাকে অর্থের চাহিদা বলে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার দামের উপর অর্থের চাহিদা নির্ভর করে। মনে করি, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ T এবং দামস্তর P। এমতাবস্থায় অর্থের মোট চাহিদা $= PT$।

অর্থের যোগান : একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রচলিত মোট আয়ের পরিমাণকে অর্থের যোগান বলে। অর্থের যোগানের মধ্যে বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বা ঐচ্ছিক মূদ্রা (যেমন – চেক, ড্রাফ্‌ট বিনিময় বিল ইত্যাদি) অর্ন্তভুক্ত। অর্থের প্রচলন গতির উপর অর্থের যোগানের পরিমাণ নির্ভর করে। কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে এক একক অর্থ যতবার হাত বদলায় তা-ই হলো অর্থের প্রচলন গতি। মোট অর্থের পরিমাণ এবং এর প্রচলন গতির গুণফলের সমষ্টি হলো ঐ নিদিষ্ট সময়ে অর্থের যোগান। মনে করি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ M এবং এর প্রচলন গতি V। আবার ঐ সময়ে ঐচ্ছিক মুদ্রার পরিমান M' এবং এর প্রচলন গতি V' । এমতাবস্থায় অর্থের মোট যোগান হবে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ ও ঐচ্ছিক মুদ্রার পরিমাণকে স্বস্ব প্রচলন গতির গুণফলের সমষ্টি। অর্থাৎ অর্থের যোগান $= MV+M'V'$

ফিলারের মতে অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান পরস্পর সমান।

অর্থাৎ PT = MV+M’V’ (ফিলারের সমীকরণ)

$$\therefore P = \frac{MU + MV}{T}$$

ফিশারের মতে স্বল্পকালীন সময়ে T,V,V’ অপরিবর্তিত থকে। এমতাবস্থায় M ও M’ এর পরিবর্তনের কারণে দামস্তর (P) একই হারে একই দিকে পরিবর্তিত হয়। যেমন- M এবং M’ এর পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দামস্তর দ্বিগুণ হবে এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। আবার M ও M’ এর পরিমাণ অর্ধেক হলে দামস্তর অর্ধেক হবে এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। নিচে গাণিতিক উদাহরণের সাহয্যে তা ব্যাখ্যা করা হলো :-

মনে করি, M = ২০০ টাকা, M’ = ১০০ টাকা

V = ৫, V’ = ২, T = ৫০০ একক

$$\therefore P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{২০০০ \times ৫ + ১০০০ \times ২}{৫০০} \text{ টাকা (একক প্রতি)}$$

$$= \frac{১২০০}{৫০০} \text{ টাকা (একক প্রতি) = = ১২০ টাকা (একক প্রতি)}$$

এখন মনে করি, V,V’ ও T স্থির থেকে M ও M’ দ্বিগুণ হয়ে গেল, এমতাবস্থায় দামস্তরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{৪০০০ \times ৫ + ২০০০ \times ২}{৫০০} \text{ টাকা (একক প্রতি)}$$

$$= \frac{২৪০০}{৫০০} \text{ টাকা (একক প্রতি) = ২৪০ টাকা (একক প্রতি)}$$

সুতরাং অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ায় দামস্তর দ্বিগুণ হয়ে গেল। ফলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে অর্থের পরিমাণ অর্থাৎ M ও M’ অর্ধেক হলে P এর মান অর্ধেক হয়ে যাবে এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটির জ্যামিতিক বিশ্লেষণ চিত্র ৩.৪ এ দেয়া হলো।

চিত্র ৩.৪

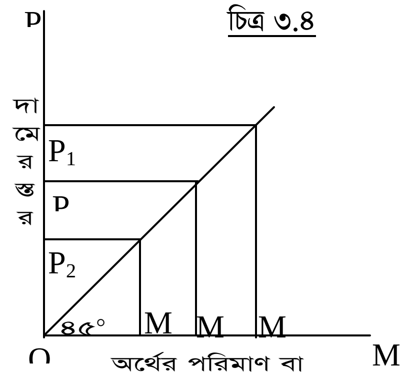

চিত্রে ভূমি অক্ষে অর্থের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর প্রমাণ করা হলো। অর্থের পরিমাণ OM হলে দামস্তর হবে OP। অর্থের পরিমাণ OM থেকে বৃদ্ধি পেয়ে $OM_1(OM_1 = 2OM)$ হওয়ায় দামস্তর বেড়ে হলো $OP_1(OP_1 = 2OP)$। আবার অর্থের পরিমাণ OM থেকে কমে $OM_2(OM_2 = {}^2/_1OM)$ হলে দামস্তর কমে $OP_2(OP_2 = {}^1/_2OP)$ হলো। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যে হারে বাড়ে দামস্তর একই হারে বাড়ে এবং বিপরীতক্রম। ফলে অর্থের মূল্য তখনই হারে বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। চিত্রে OA ৪৫° রেখা হওয়ায় অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে, সমানুপাতিক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

সমালোচনা :

১. ফিশারের তত্ত্বে অনুমান করা হয়েছে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ (T), বিহিত মুদ্রা ও ঐচ্ছিক মুদ্রার প্রচলন গতি M ও M′ স্থির। কিন্তু এ অনুমান বাস্তব সম্মত নয়। কেননা V ও V′ পরিবর্তিত হলে দ্রব্যের পরিমাণ ও অর্থের প্রচলন গতি অবশ্যই পরিবর্তিত হবে।

২. এই তত্ত্ব পূর্ণ নিয়োগস্তর অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পূর্ণনিয়োগস্তর কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

৩. এই তত্ত্বে সাধারণ দামস্তর বিবেচনা করা হয়েছে। বাজারে বিদ্যমান পাইকারী খুচরা নানা মূল্যকে বিবেচনা করা হয়নি।

৪. এই তত্ত্বে কেবলমাত্র লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা হয় বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু অর্থের চাহিদা সতর্কতামূলক ও ফটকা উদ্দেশ্যে হয়। তা এ তত্ত্বে বিবেচনা করা হয় নি।

৫. অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হলে কোন প্রক্রিয়ার দামস্তর পরিবর্তিত হবে তা আলোচিত হয় নি।

৬. অর্থের পরিমাণের পরিবর্তন ছাড়াও দামের পরিবর্তন হয়। যেমন- অর্থের পরিমাণ স্থির থেকে মজুরী বৃদ্ধি, পরোক্ষ কর হার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেও দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় এ তত্ত্বের কার্যকারিতা সীমিত হয়ে পড়ে।

৭. এই তত্ত্বে অর্থের চাহিদার চেয়ে যোগানের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৮. অর্থনীতিতে মন্দাভাব বিরাজ করলে অর্থের পরিমাণ বাড়ালেও দামস্তর তেমন বাড়ে না, আবার তেজীভাব দেখা দিলে অর্থের পরিমাণ কমলেও দামস্তর কমে না। এমতাবস্থায় ফিশারের তত্ত্বটি তার কার্যকারীতা হারায়।

৯. শুধু অর্থের পরিমাণের উপরই দামস্তর নির্ভরশীল নয়, আয়স্তর, ব্যয়স্তর, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি, বিনিয়োগ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ের উপরও দামস্তর নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায় ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নানা সমালোচনা থাকলেও তত্ত্বটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর বাড়ে এ সত্যতা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। অর্থের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে অন্যান্য তত্ত্বগুলোও সমালোচনা মুক্ত নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সমালোচনাসহ ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি বর্ণনা কর।

মুদ্রাস্ফীতি

ইউনিট
৪

পাঠ ১ : অর্থের মূল্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অর্থের মূল্য কি তা বলতে পারবেন ;
- অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- ফিশারের তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন ;
- কেইনসীয় তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা তো সবাই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে থাকি। এক বছরের আগে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারতেন, এক বছর পর আপনি সেই পরিমাণ দ্রব্য ঐ একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা কিনতে পারছেন না। এই ব্যাপারটি নিয়ে কি কখনও ভেবেছেন? এই যে দাম বৃদ্ধির বা হ্রাসের ফলে আপনি যে কম বা বেশী দ্রব্য পাচ্ছেন একেই আমরা অর্থের মূল্যের সাহায্যে দেখাতে পারি। চলুন বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

অর্থের মূল্য কি ?

অর্থের মূল্য হল অর্থের ক্রয় ক্ষমতা। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাই হল অর্থের মূল্য। অর্থের মূল্যের বহিঃপ্রকাশ ক্রয় ক্ষমতার মাধ্যমেই ঘটে। যখন দ্রব্য মূল্য বাড়ে তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায় আবার যখন দ্রব্যমূল্য কমে সেই সময় ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা আমরা বেশী পরিমাণ দ্রব্য পাই। অর্থাৎ দ্রব্য মূল্য কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং দ্রব্য মূল্য বাড়লে অর্থের মূল্য কমে। তাহলে আমরা বলতে পারি – দ্রব্য মূল্য ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন ধরুন, আপনি বাজারে গিয়ে দেখলেন যে, চালের মূল্য কেজি প্রতি ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা হয়েছে আর আপনার কাছে যদি ১২০ টাকা থাকে তবে আপনি পূর্বে ১২ কেজি চাল কিনতে পারলেও এখন ১০ কেজি চাল কিনতে পারছেন। তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনার ক্রয় ক্ষমতা ২ কেজি পরিমাণ কমে যাচ্ছে। আবার যদি বাজারে দেখা যায়, চালের মূল্য ১০ টাকা থেকে কমে ৮ টাকা হয়েছে তাহলে আপনার ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। অর্থাৎ আপনি বর্তমান অবস্থায় ১৫ কেজি চাল কিনতে পারছেন।

তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি (বা হ্রাসের) সাথে সাথে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে (বা বাড়ে)। বাজারে গিয়ে যদি দেখেন চা এর কেজি ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমেছে না বেড়েছে এবং তা কি পরিমাণে? চিন্তা করুন।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

অর্থের মূল্য নির্ধারণের জন্য যে কয়টি তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচলিত আছে এর মধ্যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আসল কথা হলো – অর্থের মূল্য সমাজের প্রচলিত মোট অর্থ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে মূল্যস্তর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের মূল্য সেই অনুপাতে কমে।

অন্যপক্ষে, অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে কমে মূল্যস্তর সেই অনুপাতে হ্রাস পায় কিন্তু অর্থের মূল্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে মূল্যস্তর দ্বিগুণ হয় এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। পক্ষান্তরে, অর্থের পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তাহলে মূল্যস্তরও অর্ধেক হবে কিন্তু অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে।

এখন আসুন আমরা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের শর্তগুলো জানার চেষ্টা করি। মূলতঃ এর অনুমিত শর্তসমূহ হচ্ছে –

১. সমাজের দ্রব্য সামগ্রীর জন্য মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মধ্যে সর্বদাই ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. সমাজে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। এর মধ্যে দুটি ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ক. নগদ – লেনদেন ভাষ্য বা বিনিময় সমীকরণ বা ফিশারীয় সমীকরণ
খ. নগদ ব্যালান্স তত্ত্ব বা ক্যামব্রীজ সমীকরণ বা নগদ তহবিল ভাষ্য।

ক. ফিশারিয় তত্ত্ব

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত অধ্যাপক ফিশার **১৯১১** সালে "Purchasing Power of Money" নামক পুস্তকে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এটি ফিশারীয় তত্ত্ব নামে পরিচিত। সাধারণ মূল্য তত্ত্বের মত অর্থের মূল্যও এর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অর্থের চাহিদা : ফিশারের মতে, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণকে অর্থের চাহিদা বলা হয়। কেননা দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্যই জনগণের কাছে অর্থের চাহিদা দেখা দেয়। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তাই হলো সে সময়ের অর্থের মোট চাহিদা। অর্থাৎ P যদি দামস্তর হয়, এবং T যদি ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী হয় তবে, অর্থের চাহিদা = "দামস্তর × ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ"

$= P \times T$

$= PT$

অর্থের যোগান

অধ্যাপক ফিশারের মতে, একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণকে অর্থের যোগান বলা হয়। অর্থের প্রচলিত গতির উপর অর্থের যোগান নির্ভরশীল। কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা যতবার হাত বদল হয় তাই হল মুদ্রার প্রচলন গতি। ফলে "কোন নির্দিষ্ট সময়ে মোট অর্থের পরিমাণ এবং এর প্রচলন গতির গুণফলের সমষ্টি হবে অর্থের মোট যোগান।"

অর্থাৎ অর্থের মোট যোগান = মোট অর্থের পরিমাণ (M) × অর্থের প্রচলন গতি (V)

$= M \times V$

$= MV$

$\therefore$ অর্থের মোট যোগান $= MV$

এতক্ষণ তো আমরা ফিশারের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থের চাহিদা ও যোগানের কথা বলেছি। এবার আমরা সমীকরণের সাহায্যে বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করব – সমীকরণটি হলো :

অর্থের মোট চাহিদা = অর্থের মোট যোগান

$PV = MV$

ফিশার তার সমীকরণে অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে শুধু মুদ্রার কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে ব্যাংক সৃষ্টি অর্থ (চেক, হুন্ডি ইত্যাদি) ফিশারের সমীকরণের সংশোধিত রূপটি হল :

$\therefore PT = MV + M'V'$

$$\therefore P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এখানে,

P	=	দামস্তর
M	=	বিহিত মুদ্রার পরিমাণ
V	=	বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি
M′	=	ব্যাংকের অর্থের (চেক) পরিমাণ
V′	=	ব্যাংকের অর্থের প্রচলন গতি
T	=	ক্রয় বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর (বস্তুগত ও সেবাগত) পরিমাণ

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অনুযায়ী, স্বল্পকালে V, V', T অপরিবর্তিত থাকে, ফলে দামস্তর (P) তথা অর্থের মূল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থের যোগানের $(M+M')$ উপর।

$M+M'$ দ্বিগুণ করা হলে P দ্বিগুণ হবে এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। আবার $(M+M')$ অর্ধেক করা হলে P অর্ধেক হবে এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। এটাই হচ্ছে ফিশারের সমীকরণের মূল কথা। আমরা এতক্ষণ আমরা ফিশারের তত্ত্বটি তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করেছি। এখন আমরা বিষয়টি গাণিতিকভাবে নিম্নরূপে দেখাতে পারি –

মনে করি,

$M = ৫০০$ $M' = ২৫০$

$V = ৫$ $V' = ৩$

$T = ৭০$

সমীকরণটি হলো

$$\therefore P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{৫০০ \times ৫ + ৭৫০}{৭০}$$

$$= \frac{৩২৫০}{৭০}$$

$= ৪৬.৪২$

অর্থাৎ $P = ৪৬.৪৬$

এখন যদি অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয় তবে P দ্বিগুণ হবে।

অর্থাৎ M = ১০০০ টাকা এবং M' = ৫০০ টাকা।

$$P = \frac{১০০০ \times ৫ + ৫০০ \times ৩}{৭০}$$

$$= \frac{৫০০০ + ১৫০০}{৭০}$$

$$= \frac{৬৫০০}{৭০}$$

অর্থাৎ P = ৯৩ (প্রায়)

বিপরীতক্রমে, যদি অর্থের পরিমাণ অর্ধেক অর্থাৎ M = ২৫০ এবং M' = ১২৫ টাকা) করা হয় তবে P অর্ধেক হবে।

অর্থাৎ $M\ M'$ এবং P সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

এখন আমরা এই ঘটনাটিকে চিত্রের সাহায্যে দেখাতে পারি –

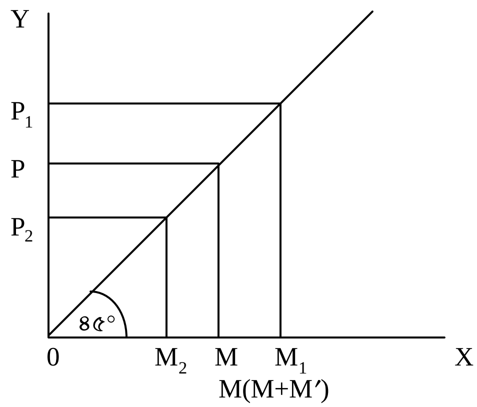

চিত্রে OX অক্ষে অর্থের পরিমাণ এবং OY অক্ষ দামস্তর নির্দেশ করে। অর্থের যোগান যদি OM হয় দামস্তর হয় OP। অর্থের যোগান যদি দ্বিগুণ অর্থাৎ OM_1 হয় তবে দামস্তরও দ্বিগুণ অর্থাৎ OP_1 হয়। এবং বিপরীতভাবে অর্থের যোগান যদি অর্ধেক হয় তবে দামস্তরও অর্ধেক হয়।

সমালোচনা : ফিশারের তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হওয়ার পরও এই তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে। নীচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **অবাস্তব অনুমান :** ফিশারের তত্ত্বে V, V' এবং T অপরিবর্তিত ধরা হয়েছে। কিন্তু এ অনুমান সত্য নয়। কারণ M ও M' পরিবর্তিত হলে T এবং V অবশ্যই পরিবর্তিত হবে এবং T অপরিবর্তিত হলে M, M', V, V'ও পরিবর্তিত হবে।

২. **পূর্ণ নিয়োগ অনুমান :** এই তত্ত্বটি পূর্ণ নিয়োগ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কদাচিৎই পূর্ণ নিয়োগ স্তর বিদ্যমান থাকে। জন মেনার্ড কেইনস বলেন : “কেবলমাত্র পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি আপন সত্তায় প্রকাশিত হয়।”

৩. **দামস্তর এবং দ্রব্যসামগ্রীর প্রকারভেদ :** দামস্তর P এর রয়েছে নানা শ্রেণী বিন্যাস (যেমন : পাইকারী, খুচরা ইত্যাদি)। আর দ্রব্য সামগ্রীর রয়েছে নানা ধরন। এই তত্ত্বে তাই সবগুলোকে একই আওতায় ফেলে দেখানো হয়েছে।

৪. **টাকার চাহিদার অপূর্ণতা :** এই তত্ত্বে শুধু লেনদেনের জন্য অর্থের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। ফটকা কারবারী ও পূর্ব-সতর্কতার (Precaution) জন্যও অর্থের দরকার হয় তা এই তত্ত্বে নাই।

৫. **নিস্ক্রিয় টাকার অস্তিত্ব :** এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, দামস্তর অর্থের যোগানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এটা ঠিক না। অর্থের একটা অংশ নিস্ক্রিয় (Idle) থাকে যা দামকে আদৌ প্রভাবিত করে না। মন্দার সময় এটা লক্ষ করা যায়।

৬. **অর্থের পরিমাণ ও মূল্যস্তরের কার্যকর সম্পর্ক :** অর্থের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটলে কোন পদ্ধতিতে ও কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা এই তত্ত্বে আলোচনা করা হয় নি।

৭. **অর্থের পরিবর্তন ছাড়াও দামস্তর পরিবর্তন :** অর্থের পরিমাণ ছাড়াও দামস্তর পরিবর্তন হয়।

ক. শ্রমিকের দক্ষতার পরিবর্তনের ফলে দামস্তরও উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন হয়।

খ. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হলে দামস্তর বাড়বে এবং ক্রমবর্ধমান বিধির ক্ষেত্রে দামস্তর হ্রাস পাবে ইত্যাদি।

৮. **অর্থের যোগানের উপর অধিক গুরুত্ব :** চাহিদা অপেক্ষা যোগানের গুরুত্ব এই তত্ত্বে বেশি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল।

৯. **অর্থের যোগানের অপূর্ণ ব্যাখ্যা :** সমীকরণে M দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়ের এবং V দ্বারা অর্থের নির্দিষ্ট কালের প্রচলন গতিকে বুঝানো হয়েছে। তাই দু'টি স্বতন্ত্র ধর্মীয় উপাদানের গুণফল ($M \times V$) নিয়ম বিরুদ্ধ।

ফিশারের তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হলেও এটি যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। অর্থের যোগান বাড়লে দাম বাড়ে, এর ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে। ডঃ মিল্টন ফ্রিডম্যান বলেন যে, "অর্থের পরিমাণের সরল তত্ত্বটি বাস্তবে কার্যকর রয়েছে এবং অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান।" স্বল্পকালে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও দীর্ঘকালে ফিশারের তত্ত্ব বেশী প্রযোজ্য।

অনুশীলন

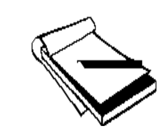

ধরুন, একটি অর্থনীতিতে ১৯৯৬-৯৭ বছরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ = ৫ মিলিয়ন একক, অর্থের মোট যোগান = ১০ মিলিয়ন টাকা, দাম স্তর = ৪ টাকা ছিল। এ বছর উৎপাদন বেড়ে ৬ মিলিয়ন একক ও দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ৫ টাকা হয়েছে। অর্থের যোগান স্থির রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থের গতিবেগের কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? চিন্তা করুন ও লিখুন।

ক্যামব্রীজ সমীকরণ

অধ্যাপক মার্শাল, পিগু, রবার্টসন প্রমুখ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের একটি বিকল্প ভাষ্য প্রচার করেন। এই সমীকরণগুলি একত্রে ক্যামব্রীজ সমীকরণ নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। ক্যামব্রীজ সমীকরণটি হলো :

$M = KY = KPQ$

এখানে M = অর্থের পরিমাণ

Y = জাতীয় আয় বা ফিশারের বিনিময় সমীকরণ PQ এর সমার্থক এবং

K = জনগণের আর্থিক আয়ের অনুপাত যা নগদ ব্যালান্স হিসেবে রাখতে চায়।

নগদ পছন্দ তত্ত্ব অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মোট উৎপাদন বা প্রকৃত জাতীয় আয় (Q) অপরিবর্তিত থাকে এবং আয়ের একটা অংশ মানুষ নগদ অর্থ হিসেবে হাতে রাখতে চায়

(K) যা অপরিবর্তিত থাকে, এই অবস্থায় P কেবল অর্থের পরিমাণ (M) দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু দ্রব্যসামগ্রী ও লেনদেনের অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া।

ফিশারের সমীকরণের মতো ক্যামব্রীজ সমীকরণকেও একটি অভেদ বা Identity হিসেবে বর্ণনা করা যায়। তাই আমরা লিখতে পারি :

$$K = \frac{M}{Y} \text{ বা } \frac{M}{PQ}$$

K এমন মান গ্রহণ করবে যা M এবং KY এর সমতা বিধান করতে সক্ষম।

ধরা যাক্, M = ৫০০ কোটি টাকা
Y = ১০০০ কোটি টাকা
K = .১

অতএব তত্ত্ব অনুযায়ী মূল্যস্তর হবে :

$$P = \frac{৫০০}{.১ \times ১০০০}$$
$$= \frac{৫০০}{১০০}$$
$$P = ৫$$

নগদ তহবিল তত্ত্ব অনুযায়ী Q ও K যদি অপরিবর্তিত থাকে তা হলে M বা "অর্থের পরিমাণ যে হারে বাড়ে মূল্যস্তরও সেই হারে বাড়বে" এই ভাবে মূল্যস্তর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

অর্থাৎ $P\uparrow \quad M\uparrow, \quad P\downarrow M\downarrow$

ক্যামব্রীজ সমীকরণের সমালোচনা :

ক্যামব্রীজ সমীকরণটি ফিশারের সমীকরণের অপেক্ষা অধিক বাস্তবসম্মত হলেও ইহা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। ক্যামব্রীজ সমীকরণের প্রধান ত্রুটিগুলো হল :

১. **চাহিদার অপূর্ণাঙ্গতা :** এই তত্ত্বে চাহিদার দিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলেও নগদ পছন্দ তত্ত্ব বিবেচনা করা হয় নি।

২. **সুদের সাথে সম্পর্ক :** নগদ তহবিল সমীকরণে অর্থের চাহিদার ব্যাপারে সুদের হারের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখে নাই। সুদের হারের সাথে নগদ তহবিলের একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে, অথচ এটা ক্যামব্রীজ সমীকরণে আলোচিত হয়নি।

৩. **K-এর উপর অনভিপ্রেত গুরুত্ব আরোপ :** প্রকৃত আয়ের উপর অনভিপ্রেত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু K-এর উপর অন্যান্য উপাদান যেমন আর্থিক আচরণ, দামস্তর প্রভৃতির যে প্রভাব ফেলতে পারে তা আলোচনা করা হয় নি।

৪. **দামস্তর পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ :** দামস্তর পরিবর্তনের কারণগুলি বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়েছে। আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এর মত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি এই তত্ত্বে উপেক্ষা করা হয়েছে।

৫. **দামস্তর পরিবর্তন :** বাণিজ্যচক্রের সময় মূল্যস্তরে যে পরিবর্তন হয়ে থাকে এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না, ১৯২৯ সালে সারা বিশ্বে যে মন্দা দেখা দেয় অর্থাৎ মূল্যস্তর হ্রাস পায়, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সমাধান হয়নি, তাই বোঝা যায় যে মূল্যস্তর কেবল অর্থ দ্বারাই নির্ধারিত হয় না।

ক্যামব্রীজ সমীকরণ সমালোচিত হলেও এই তত্ত্বটি কার্যক্ষেত্রে অধিক প্রয়োগের দাবিদার।

অনুশীলন

ধরুন, p = ৫ টাকা, Q = ২ মিলিয়ন একক, M = ৫ মিলিয়ন টাকা, K = ?, p = ১৫ টাকা, Q ও M স্থির থাকে তাহলে K = কি পরিবর্তন ঘটে? লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ফিশারীয় তত্ত্বটি প্রকাশিত হয় কত সালে?
   ক. ১৯৯২ খ. ১৯৩০
   গ. ১৯২০ ঘ. ১৯১১

২. ফিশারীয় সমীকরণ কোনটি
   ক. MV = PT খ. MV = PY
   গ. MV = PO ঘ. MV = PO

৩. ক্যামব্রীজীয় সমীকরণ হলো
   ক. M = KYY খ. M = KR
   গ. M = RO ঘ. KPY = O

৪. অর্থের মূল্য কি?
   ক. অর্থের ক্রয় ক্ষমতা খ. অর্থের বিক্রয়
   গ. অর্থের পরিমাণ ঘ. রাষ্ট্রীয় প্রতিফলন

৫. ফিশারীয় তত্ত্বে গুরুত্ব দেওয় হয়েছে,
   ক. অর্থের মূল্যের খ. চাহিদা যোগানের
   গ. দ্রব্যের উপর ঘ. উপরের কোনটাই নয়

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন

১. ফিশারীয় তত্ত্বটি চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারা আলোচিত হয়েছে।
২. ক্যামবীজ সমীকরণে K & P পরস্পর সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।
৩. (M & M_1) এর সাথে P বিপরীত সম্পর্কযুক্ত।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফিশারীয় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।
২. ক্যামব্রীজয় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব কি?

সমস্যা

ধরুন, একটি দেশের মোট অর্থের যোগান ১২ মিলিয়ন, টাকা, মোট উৎপাদন = ২ মিলিয়ন দামস্তর = ৭ টাকা, এক্ষেত্রে অর্থের গতিবেগ কত? এক্ষেত্রে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে যদি ১৩ মিলিয়ন টাকা, তাহলে সমান্তরের কি পরিবর্তন হবে?

পাঠ ২ : সূচক সংখ্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সূচক সংখ্যা কি তা বলতে পারবেন ;
- সূচক সংখ্যা গঠন করতে পারবেন ;
- সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেন ;
- ল্যাসপিয়ার্স, প্যাস, ফিশারের সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেন।

সূচনা

আমরা এর আগের পাঠে অর্থের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। একে আমরা অর্থের মূল্য হ্রাস হিসেবে দেখিয়েছি। এই ক্রয় ক্ষমতার পরিবর্তনের বিষয়টির সঠিক পরিমাপ আমরা যদি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এক বছরের মূল্যস্তরের সাথে অন্য বছরের মূল্যস্তরকে সমান পর্যায়ে এনে প্রকাশ করতে হবে। এই সমানভাবে প্রকাশ করার উপায়কেই আমরা সূচক সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। যেমন : ধরুন, ১৯৭৬ সালে এক কেজি চিনির দাম ছিল ১০ টাকা আর এখন এক কেজি চিনির দাম ৩৪ টাকা। এখন যদি আপনাকে দুটো দামের মধ্যে তুলনা করতে হয় তা সূচক সংখ্যার সাহায্যে করা যেতে পারে। এই যে তুলনা করার উপায় এটাই হলো সূচক সংখ্যার মূল শক্তি। এই অধ্যায় আমরা সূচক সংখ্যা কি এবং এর গঠন পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

সূচক সংখ্যা কি ?

এক বছরের গড় দামস্তর ওঠানামা তথা অর্থের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করার জন্য যে প্রতীক সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাকে দামস্তরের সূচক সংখ্যা (Price index number)। দামস্তর বা অর্থের মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপের উদ্দেশ্যে সূচক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। দামস্তর বাড়লে সূচক সংখ্যা বাড়বে এবং অর্থের মূল্য কমে যাবে। দামস্তর কমলে সূচক সংখ্যা কমবে এবং অর্থের মূল্য বাড়বে।

অধ্যাপক ব্লেয়ার এর মতে "সূচক সংখ্যা হল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গড়"।

অধ্যাপক এক্সটন এবং কাউডেন এর মতে "সূচক হলো পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত কতগুলো বিষয়ের পার্থক্যের ব্যবধান পরিমাপ করার কৌশল।"

একটি অর্থনীতিতে সব কয়টি দ্রব্যের দাম একত্রে বাড়ে বা কমে না। তাই দ্রব্যমূল্যের একটা গড় হিসাব করা হয়। এরূপ গড়পড়তা দামের সমষ্টিকে সূচক সংখ্যা বলা হয়।

সুতরাং দামস্তরের পরিবর্তন সময়ের ব্যবধানে প্রকাশ করার মাধ্যম হল সূচক সংখ্যা।

সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি

সূচক সংখ্যা গঠন করতে হলে কতগুলো বিশেষ বিষয়ের উপর নজর রাখতে হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো :

১. **ভিত্তি বছর :** সূচক সংখ্যা গঠন করতে হলে ভিত্তি বছর ঠিক করে নিতে হয়। যে বছরের সাথে অন্য বছরের দামস্তরের তুলনা করতে হয় তাই হলো ভিত্তি বছর। ভিত্তি বছরকে স্থিতিশীল বছর হতে হবে। যেমন ১৯৭২ সালকে ভিত্তি বছর বলা যাবে না। কারণ এ বছরে দেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি ধ্বংসস্তূপ। দামস্তরসহ প্রায় সকল অর্থনৈতিক চলক স্থিতিশীল ছিল না। তাই ১৯৭৬ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২. **দ্রব্য বিনিময় :** সূচক সংখ্যা গঠনের জন্য কতগুলো দ্রব্য নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত যে সব দ্রব্য মানুষ ভোগ করে সেই সব দ্রব্য বাছাই করতে হবে। সকল প্রকার দ্রব্য নিয়ে সূচক সংখ্যা গঠন করলে জটিলতা সৃষ্টি হবে তাই সঠিক দ্রব্য বেছে নিয়ে সূচক সংখ্যা গঠন করতে হবে।

৩. **দ্রব্যের দাম :** আমরা জানি যে, বাজার ব্যবস্থায় দুটি দাম প্রচলিত আছে। একটি হলো পাইকারী দাম আর অন্যটি হলো খুচরা দাম। কিন্তু সূচক সংখ্যার ক্ষেত্রে পাইকারী দাম ব্যবহার করা হয়।

৪. **আপেক্ষিক দাম নির্ণয় :** ভিত্তি বছর ও চলতি বছরের আপেক্ষিক দাম নির্ণয় করতে হয়। ভিত্তি বছরের দাম ১০০ টাকা ধরে হিসাবী বছরের দাম এর হ্রাস-বৃদ্ধি শতকরা প্রকাশ করা হয়। যেমন ভিত্তি বছরে চালের দাম ৬০ টাকা হলে তাকে আমরা ১০০ টাকা হিসেবে প্রকাশ করব। চলতি বছরের দাম ১২০ হলে ২০০% পরিবর্তন হিসেবে দেখাব ভিত্তি বছরের সাথে তুলনার জন্য।

৫. **আপেক্ষিক গড় দাম নির্ণয় :** ভিত্তি বছরের আপেক্ষিক দামের যোগফলকে দ্রব্যের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে গড় দাম বের করা হয়, এ গড় সর্বদা ১০০ হবে। আর হিসেবী বছরের আপেক্ষিক দামের যোগফলকে দ্রব্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে গড় সংখ্যা পাওয়া যাবে এটা ১০০ এর চেয়ে বেশি বা কম হবে।

সূচক সংখ্যা নির্ণয় : সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

সূচক সংখ্যা নির্ণয়

সাধারণ সূচক সংখ্যা — গুরুত্ব সংযুক্ত সূচক সংখ্যা

সাধারণ সূচক সংখ্যা : সকল শ্রেণীর দ্রব্যের সমান গুরুত্ব দিয়ে যে সূচক সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তাই হলো সাধারণ সূচক সংখ্যা। একটি উদাহরণের মাধ্যমে সাধারণ সূচক সংখ্যাকে প্রকাশ করা হলো যা আপনাদের শেখার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

	ভিত্তি বছর		চলতি বছর	
দ্রব্য	প্রতি কেজি	আপেক্ষিক দাম	প্রতি কেজি	শতকরা বাড়তি দাম
চিনি	২০	১০০	২৫	১২৫%
চাল	১০	১০০	১৫	১৫০%
তেল	৩০	১০০	৪০	১৩৩%
রসুন	২৫	১০০	৩০	১২০%
	গড় দাম = ৪০০ ÷ ৪ = ১০০		বাড়তি দামস্তর = ৫২৮ ÷ ৪ = ১৩২	

তালিকা অনুযায়ী, ১৯৮০ সালের দামস্তরের সূচক সংখ্যা ছিল ১০০ এবং ১৯৯৮ সালে দামস্তরের সূচক সংখ্যা ছিল ১২৮। দামস্তর শতকরা বেড়েছে = ১২৮-১০০ = ২৮। অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা ২৮ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

গুরুত্ব সংযুক্ত সূচক সংখ্যা : গুরুত্ব অনুসারে আপেক্ষিক দাম নির্ণয় করে গুরুত্বসংযুক্ত সূচক সংখ্যা বের করা হয়। যে দ্রব্যের গুরুত্ব যত তত দ্বারা গুণ করে সমষ্টিকে গুরুত্বের যোগফল দ্বারা ভাগ করে আমরা গুরুত্বারোপিত সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি।

	ভিত্তি বছর (১৯৮০ইং)	হিসাবী বছর (১৯৯৪ইং)

দ্রব্য	প্রতি কেজির দাম	আপেক্ষিক দাম (শতকরা হার)	প্রতি কেজির দাম	শতকরা হারে বাড়তি দাম × গুরুত্ব
চাল	১০টাকা	১০০×৪ = ৪০০	১৫ টাকা	১৫০×৪ = ৬০০
ময়দা	৮ টাকা	১০০×৩ = ৩০০	১২ টাকা	১৫০×৩ = ৪৫০
তেল	১৮ টাকা	১০০×২ = ২০০	৩৬ টাকা	২০০×২ = ৪০০
পিঁয়াজ	৫ টাকা	১০০×১ = ১০০	১০ টাকা	২০০×১ = ২০০
		১০ = ১০০০		১০ = ১৬৫০
	গড় দাম = ১০০০÷১০ = ১০০		বাড়তি দামস্তর = ১৬৫০÷১০ = ১৬৫	

উপরের উদাহরণে পিঁয়াজের তুলনায় চাল, ময়দা ও তেলের গুরুত্ব যথাক্রমে ৪, ৩, ২ গুণ ধরা হয়েছে এবং চাল, ময়দা, পিঁয়াজের শতকরা বাড়তি দামকে যথাক্রমে ৪, ৩, ২ এবং ১ দিয়ে গুণ করে বাড়তি দামস্তর নির্ণয় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা ছিল ১০০। ১৯৯৪ সালের সূচক সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬৫। অর্থাৎ ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে দামস্তর বেড়েছে ১৬৫-১০০ = ৬৫ ভাগ হারে।

সুতরাং সাধারণ সূচক সংখ্যার চেয়ে গুরুত্ব আরোপিত সূচক সংখ্যা দ্বারা দামস্তরের পরিবর্তন সঠিকভাবে জানা যায়।

সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে লেসপিয়ার্স, প্যাস, ফিশারের সূচক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

লেসপিয়ার্স সূচক সংখ্যা : ল্যাসপিয়ার্স সূচক সংখ্যা হলো ভার আরোপিত সূচক সংখ্যা। এই সূচক সংখ্যায় ভিত্তি বছরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ল্যাসপিয়ার্সের সূচক সংখ্যার সূত্র হলো :

$$p_L^n = \frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}$$

p_n = চলতি বছরের দ্রব্য মূল্য

p_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্য মূল্য

q_n = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ

দ্রব্য	ভিত্তি বছর		চলতি বছর	
দ্রব্য	দাম, p_o	পরিমাণ, q_o	দাম, p_n	পরিমাণ, q_n
চাল	১০ টাকা	২০	১২ টাকা	২০
তেল	৩০ টাকা	১৫	৩৫ টাকা	১৫
লবণ	১০ টাকা	১০	১২ টাকা	১০
পিঁয়াজ	১২ টাকা	৭	১০ টাকা	৭

সূচী – ১

তাহলে ল্যাসপিয়ার্সের সূচক সংখ্যা হবে –

$\Sigma p_o q_o$ = ১০×২০ + ৩০×১৫ + ১০×১০ + ১২×৭

= ২০০ + ৪৫০ + ১০০ + ৮৪

= ৮৩৪

$$\Sigma p_n q_o = ১২\times১০ + ৩৫\times১৫ + ১২\times১০ + ৭\times১০$$
$$= ১২০ + ৫২৫ + ১২০ + ৭০$$
$$= ৮৩৫$$

সুতরাং $p_L^n = \dfrac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}\times ১০০$

$$= \frac{৮৩৫}{৮৩৪}\times১০০$$

ল্যাসপিয়ার্স সূচক সংখ্যায় ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণকে গুরুত্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয় বলে এ সূচক সংখ্যার নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প্যাসের সূচক সংখ্যা : প্যাসের সূচক সংখ্যায় চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্যাসের মতে

$$p_p^n = \frac{\sum p_n q_n}{\sum p_o q_n}\times 100$$

এখানে , p_n = চলতি বছরের দ্রব্যমূল্য

q_u = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ

p_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্যমূল্য

$$\Sigma p_o q_n = ১২ \times ২০ + ৩৫ \times ২৫ + ১২ \times ১০ + ১০ \times ৭$$
$$= ২৪০ + ৫২৫ + ১২০ + ৭০$$
$$= ৯৫৫$$

$$\Sigma p_o q_u = ১০ \times ২০ + ৩০ \times ২৫ + ১০ \times ১০ + ১২ \times ৭$$
$$= ২০০ + ৪৫০ + ১০০ + ৮৪$$
$$= ৮৩৪$$

$$p_p^o = \frac{৯৫৫}{৮৩৪}\times১০০ = ?$$

আর প্যাসের সূচক সংখ্যায় চলতি বছরের উপর বেশী গুরুত্বারোপ করা হয় বলে এর উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
কাজেই, উপরোক্ত দু'ধরনের সূচক সংখ্যাই দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য ফিশারের সূত্রটি ব্যবহার করা হয় –

ফিশারের সূত্র : ফিশারের সূচক সংখ্যায় ল্যাসপিয়ার্স ও প্যাসের সূত্রের সমন্বয় করা হয়েছে। ফিশারের সূচক সংখ্যাটিকে আদর্শ সূচক সংখ্যা বলা হয়। ফিশারের সূচক সংখ্যাটি হলো –

$$p_F = \sqrt{\frac{\sum p_q q_o}{\sum p_o q_o}\times\frac{\sum p_q q_u}{\sum p_o q_u}}\times ১০০$$

এখানে

p_o = ভিত্তি বছরের দাম স্তর
p_n = চলতি বছরের দাম স্তর
q_o = ভিত্তি বছরের দাম স্তর
q_n = চলতি বছরের দাম স্তর

এখন উপরের সরণীর মানগুলো ব্যবহার করে আমরা পাই,

$$p_F = \sqrt{\frac{৮৩৫}{৮৩৪} \times \frac{৯৫৫}{৮৩৪}} \times ১০০$$

$\Sigma p_o q_o$ = ৮৩৪
$\Sigma p_q q_o$ = ৮৩৫
$\Sigma p_o q_u$ = ৯৫৫
$\Sigma p_o q_u$ = ৮৩৪

তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, সূচক সংখ্যাগুলোর মধ্যে ফিশারের সূচক সংখ্যাটি থেকে তুলনামূলকভাবে ভাল ফল দিচ্ছে। এটি অনেকটা উর্ধ্বমুখীতা বা নিম্নমুখীতার দোষমুক্ত।

১. নিচে চারটি দ্রব্যের দাম ও পরিমাণ (চলতি ও ভিত্তি বছরের) উল্লেখ করা হলো :

	চলতি বছর		ভিত্তি বছর	
দ্রব্য	দাম	পরিমাণ	দাম	পরিমাণ
চাল	১০	২০	৮	২০
তেল	৫০	২	৪৫	১
রোশন	১০০	১	৭০	১
পিয়াজ	১৫	৫	১০	৪

উপরোক্ত তথ্য থেকে আপনি কি সাধারণ সূচক সংখ্যা, ল্যাসপিয়ার্স, প্যাস ও ফিশারের সূচক সংখ্যা বের করুন।

২. সূচক সংখ্যা কাকে বলে? সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।
৩. সাধারণ সূচক সংখ্যা ও ভারারোপিত সূচক সংখ্যা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ : মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ, কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মুদ্রাস্ফীতি কি তা বলতে পারবেন ;
- মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন ;
- মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির একটি ব্যাধি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। যার ফলে আমরা বাজারে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ক্রয় করতে বেশি পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয়। যেমন ধরুন, আপনি ১ বছর আগে বাজারে গিয়ে দেখেছেন যে একটি দ্রব্যের মূল্য ছিল ১০ টাকা। কিন্তু এক বছর পর আপনি দেখলেন, সেই দ্রব্যটির মূল্য ১২ টাকা হয়ে গেছে। এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি – একেই আমরা সহজ কথায় মুদ্রাস্ফীতি বলি। আমরা এই পাঠে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা, মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও একটি দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সম্পর্কে জানব।

মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতি একটি অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। সাধারণতঃ মুদ্রাস্ফীতি বলেতে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিকে বুঝায়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। তাহলে মুদ্রাস্ফীতি আসলে কি? আসলে মুদ্রাস্ফীতি হলো সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা কম পরিমাণ দ্রব্য একই টাকায় কিনতে পারি। ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ "মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্যে ক্রমাগত হ্রাস পায়।" বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন।

অর্থনীতিবিদ কেমারার (kemerer) এর মতে, "যখন দেশে মোট মুদ্রার যোগান চাহিদার তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।" অর্থনীতিবিদ পল আইন জিন এর মতে "মুদ্রাস্ফীতি" হল ক্রয় ক্ষমতার প্রসারমুখী গতি যাতে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটে।" অর্থনীতিবিদ কুলবর্ণ এর মতে "মুদ্রাস্ফীতি হল এইরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ অতি সামান্য পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়।" অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পিলুর মতে "যখন আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।"

সুতরাং "মুদ্রাস্ফীতি" হলো দেশে প্রচলিত দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার হয় তার চেয়ে যদি বেশি মুদ্রার যোগান অর্থনীতিতে প্রচলিত থাকে যা দ্রব্যমূল্যকে ক্রমাগত হারে বাড়ায় ঠিক সেই অবস্থা। অবশ্য দেশে অর্থের যোগান বাড়লেই যে মুদ্রাস্ফীতি হয় এমনটা বলা যাবে না। লর্ড কেইনসের মতে – পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পূর্ব পর্যন্ত সত্যিকারের মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত দেশে প্রচুর পরিমাণে অব্যবহৃত সম্পদ থাকে ততদিন অর্থের যোগান বাড়লে দেশে বাড়তি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। ফলে আয় ও উৎপাদন বাড়বে। তাই মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু কোন সময় যোগানের অসুবিধা থাকলে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে, তবে সাধারণতঃ পূর্ণ নিয়োগস্তরের পূর্বে সত্যিকার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় না।

মুদ্রাস্ফীতির গাণিতিক বহিঃপ্রকাশকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যেতে পারে ঃ

$$t \text{ বছরের মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{t \text{ বছরের দামস্তর} - t\text{-}1 \text{ বছরের দামস্তর}}{t\text{-}1 \text{ বছরের দামস্তর}} \times ১০০$$

$$\frac{p_t - p_{t-1}}{p_{t-1}} \times ১০০$$

এখানে, p_t = বর্তমান বছরের দ্রব্যমূল্য

p_{t-1} = ভিত্তি বছরের দ্রব্যমূল্য

যেমন ধরুন একটি দ্রব্যের দাম ১৯৮০ সালে ছিল ১০ টাকা। ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সেই জিনিসটির দাম ২০০০ সালে হয়েছে ১৫ টাকা। তবে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে

এখন ২০০০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার $= \frac{p_{00} - p_{80}}{p_{80}} \times ১০০$

$= \frac{১৫ - ১০}{১০} \times ১০০$

$= \frac{৫}{১০} \times ১০০$

$= ৫০$

অতএব ২০০০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ৫০%।

অনুশীলনী

ধরুন এক কেজি চিনির দাম ১৯৯০ সনে ছিল ৩০ টাকা। আর সেই চিনির দাম ১৯৯৮ হয়েছে ৩৪ টাকা। ১৯৯৮ সনে মুদ্রাস্ফীতির হার কত ছিল এবং কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ?

একটা দেশে মুদ্রাস্ফীতির কতটুকু কাম্য তা সেদেশের অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে ৫% পর্যন্ত মুদ্রস্ফীতিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ :

এতক্ষণ আমরা মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞাগত দিক বিবেচনা করেছি। এখন আমরা মূল্যস্তরের বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতিকে কয়েকটিভাবে ভাগ করব :

১. **হামাগুড়ি (Creeping inflation) :** মুদ্রাস্ফীতির হার ২% এর কম হলে আমরা একে হামাগুড়ি বা ধীর চলা মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি। বাংলাদেশে ১৯৯২-৯৩ সালের এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের মুদ্রাস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ১.৪% এবং ২%-একে আমরা Creeping inflation বলতে পারি।

২. **Walking inflation :** মুদ্রস্ফীতি বৃদ্ধির হার যদি ৮-১০% হয় একে আমরা walking inflation বলতে পারি।

   Walking এবং creeping inflation কে আমরা স্বাভাবিক (moderate) মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি।

৩. **ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি (Running inflation) :** মুদ্রাস্ফীতির হার যদি দুই বা তিন সংখ্যার L অর্থাৎ ২০%, ৫০% বা ১০০%) হয় তবে তাকে আমরা ধাবমান বা Running inflation বলি। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫০% থেকে ৭০০% এর মধ্যে।

৪. **আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতি (Hyper inflation) :** যখন ক্রয় ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে যায়, তখন তাকে আমরা Hyper inflation বলি। ১৯২২ এর জানুয়ারি থেকে ১৯২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১ থেকে ১০,০০০,০০০,০০০। যার ফলে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে। বিভিন্ন ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :

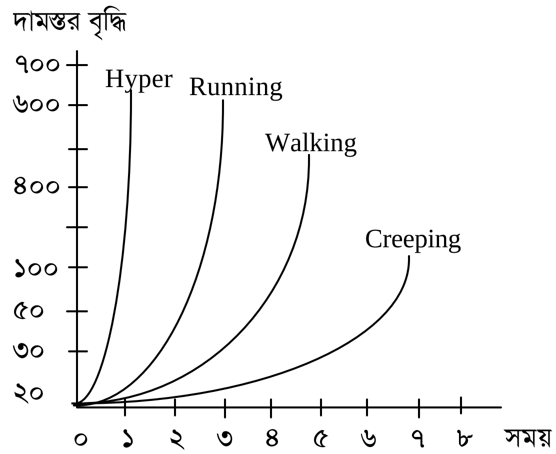

চিত্র : মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ।

অনুশীলন

কয়েকটি মুদ্রাস্ফীতির হলো ৫%, ১০%, ১০০% ৫০০%। এদের কোন্‌টি কোন্‌ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করুন?

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

এত সময় আমরা মুদ্রাস্ফীতি কি ও এর ধরন ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন আসতে পারে মুদ্রাস্ফীতি কেন ঘটে ? এর বহুবিধ কারণ আছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থের যোগান বৃদ্ধি :** মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বাড়ে কারণ অর্থের যোগান বাড়া এবং দ্রব্যের যোগান বাড়ার মধ্যে সব সময় সমতা রক্ষা সম্ভব হয় না। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পূর্বে অর্থের যোগান বাড়লে সাধারণতঃ দামস্তর বৃদ্ধি স্থায়ী হয় না। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগ স্তরে অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে পায়।

২. **সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় :** সরকার সাধারণতঃ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি করে। সরকার যদি জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণের মাধ্যমে তা গ্রহণ করে তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং দেশের অভ্যন্তরে উহা খরচ করে তবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অধিক ঋণ দান :** দেশের অর্থের যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তবে ব্যাংকের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে এবং ব্যাংকসমূহ ঋণ দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। ঋণদান ব্যবস্থা সহজ হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

৪. **অর্থের প্রচলন গতি :** অর্থের প্রচলন গতি বাড়লে দামস্তর বাড়বে। ভোগ প্রবণতা কমলে অর্থের প্রচলন গতি বাড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৫. **দামস্তর বৃদ্ধির প্রত্যাশা :** দাম বাড়বে বলে প্রত্যাশা করলে চাহিদা বেড়ে মুদ্রাস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করে। অথবা ভবিষ্যত আয় বা মজুরী বাড়বে এই প্রত্যাশা করলে ব্যবসায়ীগণ দামস্তর বাড়াতে পারে বা বিদেশে দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে এই আশা করে মূল্যস্তর বাড়াতে পারে।

৬. **যুদ্ধের ব্যয় :** যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের প্রচুর অর্থের দরকার হয়। এই ব্যয় মিটানের জন্য সরকার কাগজী নোট ছাপিয়ে এই অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয় ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৭. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং অর্থের যোগান নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৮. **উৎপাদন ব্যয় :** উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি সাধারণতঃ ঘটে উৎপাদনের উপাদানের ঘাটতি, মজুরি বৃদ্ধি ও খাজনা বৃদ্ধি পেলে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৯. **শ্রমের প্রভাব :** শ্রমিক সংঘ অনেক সময় মজুরি বৃদ্ধির করার জন্য চাপ দেয় যার ফলে মজুরি বৃদ্ধি করতে হয়। এতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে।

১০. **চোরাচাল ও মজুতদারী :** কালোবাজারী ও চোরাচালান ইত্যাদি দুর্নীতিপরায়ণ কাজের জন্য কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় যা যোগান সংকট সৃষ্টি করে মূল্যস্তরকে বাড়ায়।

ফলাফল

মুদ্রাস্ফীতি একটি মন্দ ধারণা বলে পরিচিত। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কম। যেমন ধরুন, বাজার মূল্য ১০% হারে বেড়েছে এবং আপনার বেতন বা মজুরিও একই অনুপাতে বেড়েছে। তবে সে ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির কোন প্রভাব পড়বে না। যে অবস্থাটাকে বিশুদ্ধ (Pure inflation) মুদ্রাস্ফীতির বেলায় দেখা যায়। বাস্তবে এ অবস্থা অনুপস্থিত। মুদ্রাস্ফীতি আসলে নানা রকম প্রভাব ফেলে। চলুন এগুলো জেনে নেয়া যাক :

১. **উৎপাদনকারীর উপর প্রভাব :** দামস্তর বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ অর্থের মূল্য হ্রাস পেলে উৎপাদনকারী লাভবান হয়। এতে উৎপাদিত দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রি করে অধিক আয়, মুনাফা ও সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে নতুন কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়বে।

২. **ভোগকারীদের উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে ক্রেতা সমপরিমাণ টাকা দিয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য পায়। যার ফলে ক্রয় ও ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে জীবনযাত্রার মান ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং এতে জীবনে অভাব-অনটন, রোগ-শোক, অশান্তি নেমে আসে।

৩. **ঋণদাতা ও গ্রহীতার উপর প্রভাব :** দামস্তর বাড়লে বা অর্থের মূল্য কমলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঋণ গ্রহীতা লাভবান হবে। যদিও একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ হয় তবুও পূর্বের তুলনায় ঋণ পরিশোধকালে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা কম থাকে। দ্রব্যের আকারে কম পরিমাণ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করায় ঋণ গ্রহীতা লাভবান হয়।

৪. **শ্রমিক ও সীমিত আয়ের লোকের উপর প্রভাব :** শ্রমিক, বেতনভুক্ত কর্মচারী ও সীমিত আয়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে মজুরি বাড়বে না। ফলে তাদের নির্দিষ্ট আয় দিয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে। যা তাদের ভোগ, ক্রয় ও জীবনযাত্রার মান কমায়।

৫. **করদাতা ও কর গ্রহীতার উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় কর দাতা সুবিধা এবং কর গ্রহীতার অসুবিধা হয়। স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে করদাতা কর দিতে পারে এবং কর গ্রহীতা কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে উক্ত টাকা দ্বারা।

৬. **কৃষকের উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষক লাভবান হয় এবং সে তার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে বেশি পরিমাণ দামে বিক্রি করলে আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বেশি হবে।

৭. **বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রভাব :** দামস্তর বাড়লে রপ্তানীজাত দ্রব্যের দাম বাড়বে। ফলে রপ্তানী কমবে এবং আমদানী বাড়বে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করবে।

৮. **আয় বন্টনের প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে আয়ের অধিকাংশ অংশ উৎপাদনকারী, বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের নিকট জমা হবে। যার ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট ও সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হবে।

৯. **বিনিয়োগকারীর উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ঋণপত্র বা বন্ড ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগকারীগণ লাভবান হবে। কারণ শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব :** অর্থের মূল্য হ্রাস পেলে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। কারণ এতে সমাজের আয়, নিয়োগ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক।

মুদ্রাস্ফীতির অনেক কুফলও আছে। তাই লর্ড কেইনস বলেন "মুদ্রাস্ফীতি অন্যায়", তাই দরকার স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা। যা হতে পারে সুস্থিতিশীলতা, ভারসাম্য উৎপাদন ও অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। হামাগুড়ী মুদ্রাস্ফীতি কি?

২। অর্থের যোগান বাড়লে কি ঘটে?

৩। চোরাচালানী মুদ্রাস্ফীতির সাথে কি সম্পর্কযুক্ত?

৪। মুদ্রাস্ফীতি করদাতার উপর কি প্রভাব ফেলে?

৫। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর কি প্রভাব ফেলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুদ্রাস্ফীতি কি কি কারণে ঘটে ?

২। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায় কি কি ?

৩। মুদ্রাস্ফীতি কয় ধরনের ?

সমস্যা

কয়েক ধরনের দ্রব্য নির্বাচন করে মুদ্রস্ফীতি বের করুন। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি কোন ধরনের? প্রতিকারের জন্য কি কি দরকার।

পাঠ - ৪ : মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ♦ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ;
- ♦ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ;
- ♦ মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

এর আগে আমরা মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ, কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছি। মুদ্রাস্ফীতির অনেকগুলো সুফল ও কুফল আমাদের চোখে পড়েছে। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলি নিম্নের ছকে দেখানো হলো :

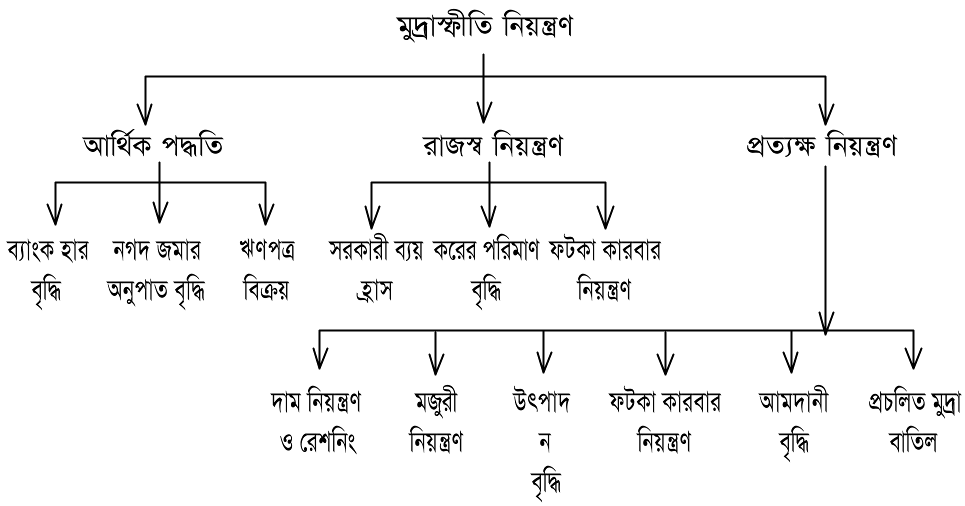

আর্থিক পদ্ধতি

মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ হলো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হলে অর্থের পরিমাণ কমাতে হবে। অর্থের পরিমাণ কমাতে হলে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কমাতে হবে। কারণ ব্যাংক ঋণ অর্থের পরিমাণ বাড়ায়। তাই ব্যাংক ঋণ ও অর্থের যোগান কমানোই হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। তাই মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য এই পদ্ধতিসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করে।

১. **ব্যাংক হার বৃদ্ধি :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দেয় তাকে বলে ব্যাংক হার। ব্যাংক হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকক সুদ হার বাড়িয়ে দেয়। এতে বিনিয়োগ ঋণ ও ভোগ ঋণের পরিমাণ কমে যাবে।

২. **নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নগদ জমার অনুপাত বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দানের পরিমাণ কমে যায়।

৩. **ঋণপত্র বিক্রি :** সরকার খোলা বাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণপত্র বিক্রয় করে জনসাধারণের নিকট হতে নগদ অর্থ তুলে নিতে পারে। নগদ অর্থ কমে যাওয়ার ফলে ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়।

৪ **নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** এ পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ না দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দেশ দেয়।

রাজস্ব পদ্ধতি

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ব্যয় ব্যবস্থার চেয়ে মুদ্রা ব্যবস্থা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা সর্বপ্রথম বলেছেলন লর্ড কেইনস। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। তাই রাজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাজস্বনীতির উপাদান হল :

১. **সরকারী ব্যয় হ্রাস :** মুদ্রাস্ফীতির আসল কারণ হলো সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়। দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বাড়ে তখন সরকারকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ খরচ বাদ দিতে হয়। এবং সম্ভব হলে সরকার সমতা বাজেট বা উদ্বৃত্ত বাজেট অবলম্বন করতে হয়।

২. **করের পরিমাণ বৃদ্ধি :** মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য সরকারী ব্যয়ের সাথে সাথে বেসরকারী ব্যয়ও হ্রাস করতে হয়। জনসাধারণের উপর আরোপিত করের মাত্রা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কর আরোপ করলে জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ কমে যাবে। রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি এবং আমদানী শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে বাজারে দ্রব্যের যোগান বাড়ানো যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কমবে।

৩. **সরকারী ঋণ :** করের হার বৃদ্ধির পরও জনসাধারণের নিকট বাড়তি ব্যয়যোগ্য অর্থ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

৪. **সঞ্চয় বৃদ্ধি :** সুদের হার বৃদ্ধি এবং প্রচারাভিযান জোরদার করলে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে। প্রয়োজনবোধে সরকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় চালু করে জনসাধারণের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ

উপরে আপনি আর্থিক পদ্ধতি ও রাজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা জেনেছেন। তাছাড়াও অন্য একটি পদ্ধতিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে তা হলো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। নিম্নের পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় :

১. **দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং :** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার দ্রব্য মূল্যের সর্বোচ্চসীমা বেধে দিতে পারে এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ ও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে পারে।

২. **মজুরি নিয়ন্ত্রণ :** মুদ্রাস্ফীতির সময়ে শ্রমিকরা বেশি মজুরি পেতে চায়। এতে উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদন খরচ বাড়ে। এক্ষেত্রে সরকার আইন করে মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩. **উৎপাদন বৃদ্ধি :** উৎপাদনের স্বল্পতার কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তাই ব্যবহৃত সম্পদের উৎকৃষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় এবং কম উৎপাদন ক্ষেত্র হতে সম্পদ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তর করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

৪. **ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ :** মুদ্রস্ফীতিতে ফটকা কারবার বাড়ে এবং এতে মূল্যস্তরও বাড়ে। ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দামস্তর হ্রাস পাবে।

৫. **আমদানী বৃদ্ধি :** চাহিদার তুলনায় যোগান খুব কম হলে বাজারের চাহিদা আমদানী দ্বারা মিটানো যায়। এর দ্বারা যোগান বাড়ানোর মাধ্যমে দাম কমানো যাবে।

৬. **প্রচলিত মুদ্রা বাতিল :** বিভিন্ন পন্থায় মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা না গেলে সরকার প্রচলিত নোট বাতিল করে দিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কিছু প্রচলিত নোট বাতিল করা হয়েছে।

এই সব পদ্ধতি যৌথভাবে প্রয়োগ করলে মুদ্রস্ফীতি রোধ করা যায়। কিন্তু এককভাবে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুগৎপৎভাবে রাজস্ব পদ্ধতি, আর্থিক পদ্ধতি ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আর্থিক পদ্ধতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির উপাদান কয়টি ?
ক. ৫ ; খ. ৪ ; গ. ৭ ; ঘ. ৩

২। সরকারী ঋণ মুদ্রাস্ফীতিকে কি করে ?
ক. কমায় ; খ. বাড়ায় ; গ. কিছুই করে না ; ঘ. উপরের সবগুলো

৩। রাজস্বনীতি অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কয়টি ?
ক. ৫ ; খ. ৩ ; গ. ৪ ; ঘ. ১

৪। করের পরিমাণ বাড়ালো মুদ্রাস্ফীতিতে কি ঘটে ?
ক. কমে ; খ. বাড়ে ; গ. নিয়ন্ত্রণে আসে ; ঘ. কিছুই ঘটে না

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১। রাজস্বনীতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায় লিখুন।

২। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের উপর কি প্রভাব ফেলে ?

৩। রাজস্বনীতির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করুন।

সমস্যা

১। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি করণীয় তা বলুন ও লিখুন।

পাঠ - ৫ : বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

আপনি এর আগের পাঠে অর্থাৎ পাঠ-৩ এ আপনি মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফলাফল জেনেছেন। এই পাঠে আপনি বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও এর প্রভাব জানতে পারবেন। যে সব কারণে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি হয় তা নিম্নরূপ :

অর্থের যোগান

অর্থের চাহিদার তুলনায় যোগান বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। যেমন ধরুন, আপনি বাজারে গিয়ে একটি মাছ কিনতে চাচ্ছেন এবং দর দাম করছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আর একজন লোক সেই মাছটি আপনার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেলেন তখন কি অনুভূতি সৃষ্টি হয় না যে, লোকটার টাকা বেশি আছে। এই অবস্থাটাকে আমরা অর্থের অতিরিক্ত যোগান বলতে পারি।

সরকার অতিরিক্ত ব্যয়

আধুনিক কালে, সর্ব ব্যবস্থায় সরকার আয়ের তুলনায় বেশী ব্যয় করে। এই আয় সরকারী আয়ের উৎসের চেয়ে অনেক বেশি। এই অতিরিক্ত ব্যয় সরকার নোট ছাপায়ে, কিংবা জনসাধারণ ও বিদেশিদের নিকট হতে ঋণ নেয়। যখন ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে আয় বাড়ে না, তখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকার ব্যয় মিটানোর জন্য নতুন করে টাকা ছাপিয়েছে – যেমন নতুন ১০ টাকা, ১ টাকা ও ৫ টাকার মুদ্রা। আরও উল্লেখযোগ্য ১৯৯৭-৯৮ সালের ব্যয় মিটানোর জন্য সরকার ১.৮৯ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য নিয়েছে এবং সরকার ব্যয় মিটানোর জন্য ১৯৯৭-৯৮ সালে ৬০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে।

দামস্তর বৃদ্ধির প্রত্যাশা

দামস্তর বাড়ার প্রত্যাশা অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করে। ভবিষ্যতে আয় ও মজুরি বেড়ে যেতে পারে এ ধারণা পোষণ করে ব্যবসায়ীগণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াতে পারে। বিদেশে দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে পারে এই প্রত্যাশায় এই দ্রব্যমূল্য বাড়ে। যেমন ধরুন, এ বছর চালের উৎপাদন কম হয়েছে এ কথা শুনে যদি লোকজন বেশি পরিমাণ চাল কিনতে চায় তবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। আবার ধরুন, নতুন পে-স্কেলের (১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে) প্রস্তাব দেখে ব্যবসায়ী মহল দাম বাড়িয়েছে কারণ সরকারী কর্মজীবিদের বেতন প্রচুর বেড়ে যাবে এই আশংকায়। আবার ধরুন, বিশ্বে চা এর উৎপাদন কম হয়েছে শুনে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণ চা এর মূল্য আভ্যন্তরীণ বাজারে বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পায়। তাই অর্থের সরবরাহ নির্দিষ্ট থাকায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯০ সালের বন্যার পর দামস্তর কিছুটা বেড়েছিল।

উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি

উৎপাদনের উপাদানের দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। যেমন ধরুন, ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে তেলের মূল্য ১৩ টাকা থেকে ২১ টাকায় উন্নীত হওয়ার ফলে যেসব কারখানায় উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে তেল ব্যবহার করা হয় সেসব ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে যা মূল্যস্তরকে বাড়ায়।

শ্রমিক সংঘের প্রভাব

শ্রমিক সংঘের প্রভাবে মজুরী, মহার্ঘ ভাতা, বিনোদন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয় এবং কাজের পরিমাণ কমানো হয়। তাই শ্রমিকের আয় বাড়ে, উৎপাদন কমে যায় ও মজুরী বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রমিকদের দাবীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য "মজুরী কমিশন" গঠন করেছে। কমিশন যথারীতি তাদের প্রস্তাব পেশ করেছে। প্রস্তাবটির সরকারী অনুমোদনের পর থেকে শ্রমিকরা নতুন স্কেলে মজুরী পাচ্ছেন। নতুন মজুরী কমিশন ঘোষণা করেছেন যারা শ্রমিকদের দাবি দাওয়া পরীক্ষা করে দেখবেন।

চোরাচালানী ও মজুতদারী

কালোবাজারী ও চোরাচালানী ইত্যাদি দুর্নীতিপরায়ণ কাজের মাধ্যমে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের দেশে সারের দাম চোরাচালান ও মজুতদারীর মাধ্যমে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব একত্রে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই আমরা কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কের উপর এই প্রভাব দেখব। যেমন ধরুন :

১. **ভোগকারীর উপর প্রভাব :** মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্রেতারা সমপরিমাণ দ্রব্য দিয়ে পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ কিনতে ও ভোগ করতে পারে। এতে জীবনযাত্রার মান কর্মক্ষমতা ও কর্মোদ্দীপনা হ্রাস পায়। তাই জনজীবনে অভাব-অনটন নেমে আসে।

২. **ঋণ দাতা ও গ্রহীতার উপর প্রভাব :** ঋণদাতা মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঋণ গ্রহীতা লাভবান হয়। কারণ সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা সে আগের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে।

৩. **শ্রমিক ও সীমিত আয়ের লোকের উপর প্রভাব :** শ্রমিক ও সীমিত আয়ের লোকেরা মুদ্রাস্ফীতির কারণে কম পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে যার ফলে তাদের জীবনের অভাব আরও বাড়ে। যেমন দ্রব্য মূল্য যখন বাড়ে তখন আমাদের দেশের লোকজন প্রায়ই বলে কম টাকা দিয়ে কি সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনা যায় ?

করদাতার উপর প্রভাব

করদাতা মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়। কারণ সে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে সে উক্ত পরিমাণ কর পরিশোধ করতে পারে। ফলে করদাতা লাভবান হয়।

উৎপাদনকারীর উপর প্রভাব

উৎপাদককারী মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়। কারণ সে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করে বেশি মুনাফা, সুদ ও সঞ্চয় পায়। ফলে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও আয় বাড়বে।

কৃষকের উপর প্রভাব

উৎপাদনকারী যেমন মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয় তেমনি কৃষকও লাভবান হয়। কৃষক তার দ্রব্য বিক্রি করে আগের তুলনায় বেশি অর্থ লাভ করে যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

আয় বন্টনের প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতির ফলে ধনী ও উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হয়। আর গরীব শ্রেণী আরও গরীব হয়। তাই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য বাড়ে যা সমাজের বিশৃঙ্খলা বাড়ায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

মুদ্রাস্ফীতির ফলে যেহেতু উৎপাদন বাড়ে, আয় বাড়ে, তাই মুদ্রাস্ফীতি আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক।

বিনিয়োগকারীর উপর প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতির ফলে বন্ড, ইকুইটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীরা লাভবান হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় কি?

২। আয়স্তর বৃদ্ধির প্রত্যাশা কি মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়?

৩। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি কি মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব ফেলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো কি কি?

২। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায় আলোচনা করুন।

আর্থিক খাত ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ইউনিট
৫

পাঠ - ১ : মূলধন বাজার ও মুদ্রাবাজারের উপাদান শেয়ার বাজার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শেয়ার বাজার কি তা বলতে পারবেন।
- দেশের অর্থায়নে এটি কি ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে একটি আলোচনা করতে পারবেন।

শেয়ার বাজার বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাবলীর একটি। আমরা টেলিভিশন খবরে বা সংবাদপত্রে শেয়ার সূচকের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটেছে দেখতে পাই। আমরা কি কখনও ভেবেছি শেয়ার বাজার কি? কেনইবা এর সূচকের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে?

সংজ্ঞা

স্বচ্ছ আয়নায় যেমন লোকের চেহারা দেখা যায় তেমনি শেয়ার বাজারের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায় তাহলে এখন প্রশ্ন উঠে শেয়ার বাজার কি? "শেয়ার বাজার হল যে বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ার ও ইকুইটি ক্রয়-বিক্রয় হয়।"

কোন কোম্পানি মূলধন বাড়ানোর জন্য বাজারে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ বিক্রি করে দিয়ে টাকা বা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। এই যে টাকা সংগ্রহ করার উপায় এটা হল শেয়ার বাজার। তাই শিল্পের মূলধন সংগ্রহের জন্য কোম্পানি তার অংশ বিক্রি করার জন্য বাজারে আসে। তাই একটা দেশের শেয়ার বাজার যত বড় সে দেশের উৎপাদন কর্মকান্ড তত বড়। আর যে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যত ছোট সে দেশের শেয়ার বাজার তত ছোট। একটি দেশের উৎপাদন যত বাড়বে সে দেশের শেয়ার তত দ্রুত বাড়বে। তাই শেয়ার বাজারকে বলা যেতে পারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রাণ।

শেয়ার বাজারে মূল্যস্তর বাড়া বা কমা চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশী থাকে তবে মূল্যস্তর বাড়বে। অর্থাৎ সূচকের বৃদ্ধি ঘটবে। আর যদি যোগান চাহিদার তুলনায় বেশী হয় তবে সঙ্গত কারণেই দাম কমবে। কিন্তু শেয়ারের চাহিদা বাড়াটা নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানের অধিক মুনাফা অর্জন, অধিক হারে মুনাফা বিতরণ, নতুন করে রাইট শেয়ার ও বোনাস শেয়ার বিতরণ করা। শেয়ার এর এই দাম বৃদ্ধির প্রবণতাকে বলা হয় তেজী ভাব বা Bullish। আর শেয়াররের চাহিদা কমে যাবে যদি ঐ কোম্পানির দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি ধরা পড়ে এবং তা প্রকাশিত হয়। শেয়ারের দুটি বাজার আছে একটি হল মূল শেয়ার বাজার আর অন্যটি হল কার্ব (Curb) মার্কেট। মূল শেয়ার বাজার কতগুলো নিয়ম-কানুন মেনে

চলে শেয়ারের কেনা-বেচা হয়। আর কার্ব মার্কেটে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট ব্যক্তিগত পর্যায়ে শেয়ার বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে। তবে মূল বাজারের তুলনায় কার্ব মার্কেটে শেয়ারের দাম কম বা বেশী হয়। তেজী ভাবের সময় কার্ব মার্কেটের শেয়ারের মূল্য মূল শেয়ার বাজার থেকে বেশী হয়। আর মন্দাভাবের সময় মূল বাজারের তুলনায় কার্ব মার্কেটে শেয়ার মূল্য কম থাকে। প্রতিটি শেয়ারের বাজারে শেয়ারের একবার করে বিনিময় হয় তবে বিশেষ কারণে শেয়ারের বিনিময় বন্ধ থাকতে পারে। যেসব শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে কম উঠানামা করে সেই সব শেয়ারকে বলা হয় blue chip শেয়ার।

অনুশীলন :

কয়েকটি blue chip শেয়ারের নাম বলুন ও লিখুন।

তুলনামূলকভাবে যারা কম ঝুঁকি নিতে চায় তারা blue chip শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারে।

বাংলাদেশের শেয়ার বাজার তুলনামূলকভাবে নতুন ও ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা অত্যন্ত কম। যার সংখ্যা ২০০ এর কাছাকাছি। বাংলাদেশে দুটি শেয়ার বাজার আছে। একটি হল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আর অন্যটি হল চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। ১৯৯৫ সালে ১০ অক্টোবর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ চালু হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২০০ এর মত সদস্য আছে। যার অর্ধেকেরও বেশী অকার্যকর। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য হতে ১ কোটি টাকা দরকার হয়। তাই নতুন সদস্য এই বাজারে অংশ নিতে পারে না। তাই সরকারের উচিত নতুন কিছু সদস্য সংগ্রহ করা। যার ফলে সদস্যের সংখ্যা বাড়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় ব্যবস্থা চালু হয়।

বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের আয়তন ছোট ও বড় সদস্যের সংখ্যা কম বলে Manipulate করে মূল্য বাড়ানো হয়। এর ফলে কখনো হঠাৎ করে মূল্য বাড়ে কোন কারণ ছাড়াই। অথচ ঐ শেয়ারের মূল্য বাড়ার কথা নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এক্সিলজ সু কোম্পানি দুই সদস্যের সাথে যোগ করে মূল্য বাড়ায়। পরে এটা ধরা পড়ার পর সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দুই সদস্যের বিরদ্ধে জরিমানা করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সদস্য পদ বাতিল করে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হল শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান।

আমরা নতুন সদস্য গ্রহণের নিয়মকানুন যুগোপযোগী করা, আধুনিকায়ন করা প্রভৃতির মাধ্যমে স্টক বাজারকে আরও বেশী গতিশীল ও স্থিতি অবস্থায় নিয়ে আসতে পারি।

পাঠ - ২ : স্বর্ণের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ♦ স্বর্ণমান কি তা বলতে পারবেন।
- ♦ স্বর্ণমানের সুবিধাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- ♦ স্বর্ণমানের অসুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্বর্ণ কার কাছে মূল্যবান নয়। স্বর্ণ কাঙ্ক্ষিত নয় – এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু কখনও চিন্তা করেছেন কি, স্বর্ণ কেন এত মূল্যবান! অথচ লৌহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজে আসে। আবার, স্বর্ণ দিয়ে তৈরী জিনিসের চাইতে লৌহনির্মিত জিনিস বেশি মজবুত। তারপরও স্বর্ণ কেন সকলের কাছে কাঙ্ক্ষিত? স্বর্ণের এই মূল্যের কারণ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে স্বর্ণমান কি।

স্বর্ণমান :

যখন কোন দেশে প্রামাণিক মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত করা হয় অথবা মুদ্রা যদি এরূপ হয় যার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা দপ্তর হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায় তখন সে মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলা হয়। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও অর্থের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, সম্পর্কটি কি?

এর উত্তরে বলা যায়, মুদ্রার আর্থিক মূল্য এর স্বর্ণমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং স্বর্ণের মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে আর্থিক মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে।

স্বর্ণের সাথে অর্থের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বর্ণমানকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. পূর্ণ স্বর্ণমান
২. স্বর্ণপিন্ডমান
৩. স্বর্ণ বিনিময় মান
৪. স্বর্ণ সমতামান

নিম্নে একটি আলোচনা তুলে ধরা হল।

১. পূর্ণ স্বর্ণমান : এটি এমন একটি মুদ্রাব্যবস্থা যাতে দেশের প্রামাণিক মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণ দিয়ে তৈরি হয় এবং মুদ্রার আর্থিক মূল্য এর ধাতব মূল্যের সমান থাকে। এ ছাড়া, বাজারে প্রচলিত কাগজী নোট ও অন্যান্য সকল প্রকার মুদ্রা নির্ধারিত হারে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা চলে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের জন্য স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা তৈরি করে দিতে সর্বদা আইনত প্রস্তুত থাকেন। ১৯১৪ সালের আগে ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং আরও কয়েকটি দেশে এরূপ মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

২. স্বর্ণপিন্ডমান : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন উঠে যায় এবং তার পরিবর্তে যে নতুন ধরনের স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে স্বর্ণপিন্ডমান বলা হয়। এ ব্যবস্থায় স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত কোন মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকে না। তবে কাগজী মুদ্রা বা অন্য যে সকল মুদ্রা বাজারে চালু থাকে তা একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণপিন্ডে পরিবর্তিত করা চলে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রয়োজনে দেশের মুদ্রাকর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ক্রয় ও বিক্রয় করতে বাধ্য থাকেন। এ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল স্বর্ণের ব্যবহারের মিতব্যয়িতা আনয়ন করা। ইংল্যান্ডে ১৯২৫ সাল হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এবং ভারতবর্ষে ১৯২৭ সাল হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

৩. স্বর্ণ বিনিময় মান : এই ব্যবস্থায়ও বাজারে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না। অভ্যন্তরীণ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কাগজী মুদ্রা ও অন্যান্য মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। মুদ্রা কর্তৃপক্ষ কাগজী বা অন্য মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত থাকেন না। তবে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্য মুদ্রা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট হারে অন্যান্য দেশে স্বর্ণভিত্তিক মূল্য পাওয়া যায়। ১৮৯৮ সাল হতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

৪. স্বর্ণ সমতামান : এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণের ব্যবহার করা হয় না। তবে মুদ্রা কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ রেখে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বিধান করেন। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলযুক্ত দেশগুলির মধ্যে এই ধরনের একটি স্বর্ণমান প্রচলিত আছে।

অনুশীলন :
স্বর্ণের অর্থের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বর্ণমানের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
এখন স্বর্ণমানের গুরুত্ব জানার জন্য আসুন আমরা এর সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করি।

স্বর্ণমানের সুবিধা

১. আন্তর্জাতিক মুদ্রা : স্বর্ণমানের প্রথম সুবিধা হল – এর ফলে দেশের প্রচলিত মুদ্রা পৃথিবীর সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয়। স্বর্ণই হল একমাত্র বিনিময় মাধ্যম যা সকল দেশে অবাধে এবং আগ্রহ সহকারে গৃহীত হয়। এই মুদ্রার সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন দেশে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। সুতরাং, এটি একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব : পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তাহলে সকল দেশে একই মুদ্রামান প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর ফলে বৈদেশিক বিনিময় সহজ হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক বেশি সহজে এবং অবাধে চলতে পারে।

৩. লেনদেনের ভারসাম্য সমতা : যদি কোন কারণে একটি দেশের বৈদেশিক দেনা বৈদেশিক পাওনা অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে দেশ হতে স্বর্ণ রপ্তানি হবে। এর ফলে দেশের মুদ্রার পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে মূল্যস্তরও কমে যাবে। মূল্যস্তর কমে গেলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি কমে যাবে। এভাবে একদিকে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং অপরদিকে আমদানি হ্রাসের ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা দূর হবে।

৪. বিনিময় হার স্থির থাকে : এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক দেশের মুদ্রার মূল্য এর স্বর্ণমূল্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমুদ্রার অনুপাতে বৈদেশিক বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়। এজন্য স্বর্ণমান প্রবর্তনকারী দেশগুলির বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির থাকে।

৫. মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা : স্বর্ণের মোট যোগান মোটামুটি স্থির থাকে বলে মুদ্রার পরিমাণ স্থির থাকে। ফলে মূল্যস্তর ও স্থির থাকে। দেশের মুদ্রাব্যবস্থা স্বর্ণের সাথে সংযুক্ত থাকে বলে ইচ্ছামত অতিরিক্ত পরিমাণে মুদ্রার প্রচলন করা চলে না। এজন্য মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে না।

স্বর্ণমানের অসুবিধা

১. স্বর্ণমান স্বয়ংক্রিয় নয় : স্বর্ণমান ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়তা প্রধান দুইটি শর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, স্বর্ণের অবাধ আমদানি ও রপ্তানির উপর। দ্বিতীয়ত, মূল্যস্তরের উপর এর পূর্ণ প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্যের উপর। এই সকল নিয়মকে 'স্বর্ণমান ক্রীড়ার নিয়মাবলী' বলা

হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোন দেশই এই সকল নিয়ম পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে না। যেমন – স্বর্ণ রপ্তানি হতে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সাধারণতঃ ব্যাংক হার বাড়িয়ে স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করতে চেষ্টা করে। আবার স্বর্ণের আমদানি হতে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বর্ধিত স্বর্ণের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ না বাড়িয়ে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়ে থাকে। এ সকল কারণে স্বর্ণমানকে স্বয়ংক্রিয় না বলে 'পরিচালিত মান' হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে।

২. আর্থিক স্বাধীনতা খর্ব হয় : স্বর্ণমানের আর একটি প্রধান অসুবিধা হল যে, এতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন স্বাধীন নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার খাতিরে দেশের আভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে, অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব অপেক্ষা বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্বের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এমনকি, বৈদেশিক বিনিয়োগের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য অনেক সময় দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। যেমন – বিনিময় হার প্রতিকূল হলে স্বর্ণমানের নিয়ম অনুযায়ী মুদ্রাসংকোচন করতে হয়। মুদ্রাসংকোচনের ফলে উৎপাদন, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিমাণ কমে যায়।

৩. মুদ্রাসংকোচন ও বেকারত্ব : অর্থনীতিবিদ কেইন্স-এর মতে স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসংকোচন ও বেকারত্বের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যে সকল দেশের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হবে সে সমস্ত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকের হার বাড়িয়ে স্বর্ণ রপ্তানি বন্ধ করার চেষ্টা করবে। ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিলে বিনিয়োগ কমে যায় এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয়। ফলে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিবে।

৪. আন্তর্জাতিক অরাজকতা : স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে কোন দেশে মুদ্রা ব্যবস্থাকে বিদেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সাথে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়। এর ফলে পৃথিবীর কোন দেশে যদি কোন কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় তবে এর ফলাফল স্বরূপ স্বর্ণমানের আওতাধীন অন্যান্য সকল দেশকেই এর অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

৫. মূল্যস্তর স্থির থাকে না : স্বর্ণমান ব্যবস্থা বাস্তবক্ষেত্রে কখনই কোন দেশের মূল্যস্তর স্থির রাখতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন স্বর্ণখনি আবিস্কারের ফলে স্বর্ণের উৎপাদন অনেক পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে মূল্যস্তরও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষভাগে স্বর্ণের যোগান কমে যাওয়ার ফলে মূল্যস্তর কমে যায়।

৬. মূল্যবান ধাতুর অপচয় : পরিশেষে, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুব ব্যয়বহুল। যেক্ষেত্রে কাগজী অর্থের দ্বারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অসুবিধাজনক নয়, সেক্ষেত্রে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান ধাতু মুদ্রা ব্যবস্থার মান হিসেবে ব্যবহার করা অপচয় মাত্র।
আর এ ধরনের নানা অসুবিধার জন্য বর্তমানে স্বর্ণমানের প্রচলন নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অনেক দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে। যুদ্ধ শেষ হবার পর বিভিন্ন দেশ পুনরায় স্বর্ণমানে ফিরে আসতে থাকে। ১৯২৯ সালের মধ্যে প্রায় সকল দেশই পুণরায় স্বর্ণমান প্রবর্তন করে। কিন্তু এই নতুন 'স্বর্ণযুগ' অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। ১৯৩১ সালে পুণরায় বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৩৩ সালে আমেরিকা স্বর্ণমান ত্যাগ করার সাথে সাথে স্বর্ণমানের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্বর্ণমান কি? স্বর্ণমান কত প্রকার ও কি কি? আলোচনা করুন।
২. স্বর্ণমানের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. স্বর্ণমানের অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. অর্থের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বর্ণমানকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
   ক. ৩ ভাগে   খ. ৪ ভাগে
   গ. ৫ ভাগে   ঘ. ৬ ভাগে

২. কোন মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকে?
   ক. পূর্ণ স্বর্ণমান   খ. স্বর্ণ পিন্ডমান
   গ. স্বর্ণ বিনিময় মান   ঘ. স্বর্ণ সমতামান

৩. ভারতবর্ষে ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কোন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু ছিল?
   ক. পূর্ণ স্বর্ণমান   খ. স্বর্ণ পিন্ডমান
   গ. স্বর্ণ বিনিময় মান   ঘ. স্বর্ণ সমতামান

৪. স্বর্ণ হল একমাত্র বিনিময় মাধ্যম যা পৃথিবীর
   ক. সর্বত্র গৃহীত হয়   খ. কোথাও গৃহীত হয় না
   গ. অধিকাংশ জায়গায় গৃহীত হয়   ঘ. অধিকাংশ জায়গায় গৃহীত হয় না

৫. পৃথিবী থেকে স্বর্ণমানের পুরোপুরি অবসান কত সালে ঘটে?
   ক. ১৯২৭ সালে   খ. ১৯২৯ সালে
   গ. ১৯৩১ সালে   ঘ. ১৯৩৩ সালে

সমস্যা

ধরুন বাংলাদেশ সরকার কাগজী নোটের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা চালু করল। এক্ষেত্রে অর্থনীতিতে কিরূপ প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

পাঠ - ৩ : ঋণের উৎস - প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ঋণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- ঋণের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- কোন্ অবস্থায় কোন্ ধরনের ঋণ নেয়া সুবিধাজনক তা নির্ণয় করতে পারবেন

ব্যবসা বিনিয়োগ :

ধরুন, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আপনার হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আপনার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। অথবা কোন কিছু কিনতে আপনার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। তখন আপনি কি করবেন? এক্ষেত্রে আপনি বিশেষ কিছু বন্ধক রেখে টাকা ধার নিতে পারেন বা বিশেষ কিছু শর্তের বিনিময়ে টাকা বাকী রেখে জিনিস নিতে পারেন।

এ ব্যবস্থাকেই ঋণ বলে। অর্থাৎ এক কথায়,

১. **গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতে :** যে অর্থ গ্রহণের সাথে ফেরৎ দেয়ার শর্ত জড়িত থাকে তাকে ঋণ বলে।

২. **প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গিতে :** ভবিষ্যতে ফেরত পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অর্থের বর্তমান মালিকানা পরিত্যাগ করাকেই ঋণ বলে।

একে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি –

দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাথে সাথে তার মূল্য পরিশোধ না করে কিংবা নগদ অর্থ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ তা ফেরত না দিয়ে ভবিষ্যতে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরিশোধ করার অঙ্গীকারকে ঋণ বলে।

অধ্যাপক গাইডের মতে – "আদান-প্রদানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকলে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হয়।"

মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঋণ সৃষ্টি হয়।

যথা – ১. বিশ্বাস
২. সামর্থ্য
৩. সময়ের ব্যবধান

ঋণগ্রহীতা বিশ্বাসী ও সৎ না হলে তার সাথে ঋণের কারবার চলতে পারে না ; কারণ সেক্ষেত্রে ঋণ প্রত্যার্পনের সম্ভাবনা কমে যায়। আর ঋণ নেয়া ও ফেরত দেওয়ার মধ্যে সবসময়ই সময়ের ব্যবধান থাকে। ভবিষ্যতে কখন ঋণ পরিশোধ করা হবে সে সম্পর্কে ঋণদাতাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

অনুশীলনী :

কি কি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঋণ সৃষ্টি হয় এবং কেন?

ঋণের প্রকারভেদ :

ব্যবহার ও সময়ের প্রেক্ষিতে ঋণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। কি কারণে ঋণ ব্যবহার করা হয় এবং কত সময় ধরে তা ব্যবহৃত হয় এ বিষয়গুলির প্রেক্ষিতেই ঋণের এ শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

ক. প্রথমতঃ, ব্যবহারের ভিত্তিতে ঋণকে তিনভাগে ভাগ করা হয় ; যথা – বাণিজ্যিক ঋণ, ভোক্তার ঋণ ও উৎপাদকের ঋণ।

বাণিজ্যিক ঋণ

বাণিজ্যিক বা গ্রামীন ব্যাংক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদেরকে যে ঋণ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ঋণ বলে।

ভোক্তার ঋণ
টেলিভিশন, মটরগাড়ী, ফ্রিজ ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ভোক্তাদেরকে যে ঋণ দেওয়া হয় তাকে ভোক্তার ঋণ বলে। কিস্তিতে জিনিস বিক্রি করে এমন প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক এ ধরনের ঋণ দেয়।

উৎপাদকের ঋণ
কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারীদেরকে যে ঋণ দেয় তাকে উৎপাদকের ঋণ বলে।

খ. দ্বিতীয়তঃ, সময়ের ভিত্তিতে ঋণকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা – স্বল্পমেয়াদী ঋণ, মধ্যম মেয়াদী ঋণ ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।

স্বল্প মেয়াদী ঋণ
যে ঋণ অত্যন্ত অল্প সময় যেমন, কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রদান করা হয় তাকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ বলে।

মধ্যম মেয়াদী ঋণ
যে ঋণ নাতি-দীর্ঘ সময় যেমন, কয়েক মাস কিংবা এক-দুই বছরের জন্য দেওয়া হয় তাকে মধ্যম মেয়াদী ঋণ বলে। কৃষিঋণ ও ক্ষুদ্রশিল্প ঋণ মধ্যম মেয়াদী ঋণের পর্যায়ভুক্ত।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ
যে ঋণ দীর্ঘমেয়াদ যেমন, কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বলে। কৃষিক্ষেত্রে স্থায়ী উন্নতি বিধান, গৃহ নির্মাণ, বৃহৎ শিল্প-কারখানা স্থাপন ইত্যাদির জন্য গৃহীত ঋণ হল দীর্ঘমেয়াদী।

অনুশীলনী :
ব্যবহার ও সময়ের প্রেক্ষিতে ঋণের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

ঋণ গ্রহীতারা বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এই উৎসগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

ক. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস
খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস

ক. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস
সাধারণতঃ একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। বৃহৎ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি এ ধরনের উৎস। যেমন –

১. বাংলাদেশ ব্যাংক : প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যতম। এটি সরাসরি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ দিয়ে থাকে। যে সমস্ত ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এরূপ ঋণ দেয়, বাংলাদেশ ব্যাংক সে সমস্ত সংস্থাকে প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা কম হারে সুদে ঋণ প্রদান করে এবং পরোক্ষভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। যেমন – বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা ২% কম সুদে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংককে ঋণ

প্রদান করে থাকে। এই উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি কৃষি বিভাগ নামে একটি বিভাগ চালু করেছে। এটি কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধানে নিয়োজিত।

২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক : প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সবচেয়ে বেশি কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে। সাধারণত কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচের জন্য গভীর, অগভীর নলকূপ, পাম্পিং মেশিন, হালের গরু ক্রয়, সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিপণ্যের বিপণন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৩. রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ : বর্তমানে, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শিল্পোন্নয়নে এক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলছে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিভিন্ন পর্যায়ে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এ ধরনের ব্যাংকসমূহ দেশের অর্থনীতিতে এক ব্যাপক অবদান রাখছে।

৪. ভূমি বন্ধকী ব্যাংক : এ ধরনের ব্যাংক গ্রাহকদের জমি বন্ধক রেখে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে।

৫. গৃহনির্মাণ অর্থায়ন কর্পোরেশন : এ প্রতিষ্ঠান গৃহনির্মাণে ঋণদান করে থাকে। সাধারণতঃ বাড়ি নির্মাণে এককালীন অনেক টাকা খরচ হয়। গ্রাহকদের দ্বারা সবসময় একসাথে এত অর্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৬. ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান : সাধারণতঃ এন.জি.ও সমূহ ও অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রকারভেদে পড়ে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। এছাড়া অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

অনুশীলনী :
কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করে?

খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সাধারণতঃ এ ধরনের উৎস হতে ঋণ নেয়া হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ঋণপ্রাপ্তির কঠিন শর্তসমূহ ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহিত হয় ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের দ্বারস্থ হয়।
এভাবেই গড়ে উঠে এমন সব প্রতিষ্ঠান যাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা তৈরি। নিম্নে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

১. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব : অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে এটি একটি বড় উৎস। ঋণ গ্রহীতারা নানা প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাদের এ ধরনের ঋণের জন্য সাধারণতঃ কোন জামানত বা সুদ দিতে হয় না, বা হলেও তা নিতান্তই কম।

২. গ্রাম্য মহাজন : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামের লোকজন এদের থেকেই ঋণ গ্রহণ করে। কৃষিকাজ, পারিবারিক অনুষ্ঠান, বিয়ে-শাদী এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ঋণ শোধের জন্য গ্রামের সাধারণ জনগণ এ ধরনের মহাজনদের শরণাপন্ন হয়। তবে এ ধরনের ঋণ গ্রহীতাদের চড়া হারে সুদ দিতে হয়। এ ধরনের ঋণ উসুলের প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠোর। তাই আপাতঃ অর্থে ঋণগ্রহীতা কিছু টাকা পেলেও এ ধরনের ঋণ সমাজ কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে না।

৩. ভূ-স্বামী ও গ্রামীণ ধনী লোক : গ্রামের ধনী লোক ও ভূ-স্বামীগণ কৃষকদের ঋণ প্রদান করে থাকে। অনেক সময় এ ধরনের ঋণের জন্য মূল্যবান জিনিসপত্র অথবা ফসল বাঁধা রাখতে হয়।

অনুশীলনী :

কেন মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নেয়?

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ নেয়া দরিদ্র ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বেশ দুঃসাধ্য ও জটিল। তাই তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে যেন তাদের ঋণপ্রাপ্তির শর্তাবলী সহজবোধ্য ও সরল হয়। তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং সমাজ ও জাতি উন্নয়নের ধারায় আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ঋণ কাকে বলে? ঋণের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২. ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ উল্লেখ করুন।

৩. ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কোন্‌টি ঋণ সৃষ্টির ভিত্তি নয়?
   ক. বিশ্বাস — খ. সামর্থ্য
   গ. সময়ের ব্যবধান — ঘ. গ্রহীতার ব্যক্তি মালিকানা

২. কোন্‌টি ব্যবহারের ভিত্তিতে ঋণ নয়?
   ক. বাণিজ্যিক ঋণ — খ. উৎপাদকের ঋণ
   গ. সরকারী ঋণ — ঘ. ভোক্তার ঋণ

৩. কোনটি সময়ের ভিত্তিতে ঋণ নয়?
   ক. স্বল্পমেয়াদী ঋণ — খ. পঞ্চবার্ষিক ঋণ
   গ. মধ্যমমেয়াদী ঋণ — ঘ. দীর্ঘমেয়াদী ঋণ

৪. নিচের কোন্‌টি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস?
   ক. এন.জি.ও — খ. গ্রাম্য মহাজন
   গ. ভূ-স্বামী — ঘ. আত্মীয়-স্বজন

৫. নিম্নের কোন্‌টি অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস?
   ক. গ্রাম্য মহাজন — খ. গৃহনির্মাণ অর্থায়ন কর্পোরেশন
   গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক — ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

সমস্যা

ধারণা করুন, আপনি আপনার গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন। সেখানে হঠাৎ লক্ষ করলেন আপনার বেশ কিছু পৈর্তৃক জমি অনাবাদী পড়ে আছে। এর পাশে একটি পুকুরও আছে, যত্নের অভাবে যেখানে কচুরিপানা জমে আছে। আপনি ঠিক করলেন এগুলো সংস্কার করবেন এবং চাষ শুরু করবেন। কিন্তু এতকিছু করার মত পর্যাপ্ত অর্থ আপনার কাছে নেই। এক্ষেত্রে আপনি কিভাবে অর্থের সংস্থান করবেন তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ৪ : ব্যাংক-এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ব্যাংক-এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কি ধরনের ব্যাংকে আপনি মূলধন সঞ্চয় করতে ইচ্ছুক সে সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ করতে পারবেন।

ভূমিকা

ব্যাংক-এর প্রকারভেদ সম্বন্ধে জানবার আগে আসুন আমরা জেনে নিই ব্যাংক কি এবং এর উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই বা কি।

ব্যাংক কি

আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যাংক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যাংক হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা একদিকে জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জনসাধারণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রয়োজনমত ঋণ প্রদান করে। জনসাধারণ তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে রাখার জন্য ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাংক এই গচ্ছিত অর্থ পুণরায় জনসাধারণকে ধার দেয়। এভাবে ব্যাংক এক শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ জমা রাখে এবং অন্য এক শ্রেণীর লোককে ঋণ প্রদান করে।

ব্যাংকের উৎপত্তি

ঠিক কোন সময় হতে ব্যাংক-এর উৎপত্তি হয়েছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে তবে ধারণা করা হয়, ইতালীয় শব্দ 'Banco' হতে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি। ইতালীতে 'Banco' শব্দের অর্থ লম্বা টুল। সেখানে লোম্বাডি নামক স্থানে ইহুদী মহাজনেরা লম্বা টুল বা বেঞ্চের উপর বসে টাকা-পয়সা লেনদেন করত।

মানব সভ্যতার সূচনায় মানুষের অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ খুব কম ছিল। তাই মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস নিজেরাই তৈরি করত। ক্রমে লোকসংখ্যা যতই বাড়তে থাকে মানুষ ততই নিজস্ব প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে দ্রব্য বিনিময় প্রথার সৃষ্টি হয়। এ প্রথার অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে অর্থের আবিষ্কার ও ব্যবহার হয়। মানুষ তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বিক্রি করে অর্থ জমা করতে লাগল। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিপত্তি – মানুষ ভুগতে লাগল নিরাপত্তাহীনতায়। উদ্বৃত্ত অর্থ নিজের কাছে রাখা নিরাপদ ছিল না বলে মানুষ সৎ, বিশ্বস্ত ও অবস্থাশালী আমানতদারের শরণাপন্ন হয়। এক্ষেত্রে এগিয়ে আসে স্বর্ণকাররা। তারা ব্যাংক হিসেবে কাজ করত এবং অর্থ, সোনা, রূপা, অলংকারাদি ইত্যাদি আমানত হিসেবে জমা রাখত। এভাবে ব্যাংকের প্রথম কাজ হিসেবে আমানত গ্রহণের সূত্রপাত হয়।

স্বর্ণকারগণ তাদের অভিজ্ঞতা হতে বুঝল যে, আমানতকারীগণ তাদের গচ্ছিত অর্থ একই সময় উত্তোলন করে না। তাই স্বর্ণকারেরা গচ্ছিত অর্থের একটা অংশ অন্যদেরকে সুদে ধার দিত। দেখা গেল যে, সুদের ব্যবসা হতে প্রচুর মুনাফা আসতে লাগল। ফলে আমানত বৃদ্ধি করার জন্য স্বর্ণকারেরা আমানতকারীদের কিছু সুদ দেওয়া আরম্ভ করল। স্বর্ণকারেরা আমানতকারীদেরকে যে হারে সুদ দিত তা অপেক্ষা বেশি সুদের হারে অন্যদেরকে ঋণ দিত। এভাবে সুদ দেয়া-নেয়ার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বর্ণকারদের মুনাফা এবং এ মুনাফা অর্জন পদ্ধতি ব্যাংকের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূত্রপাত ঘটায়।

ক্রমান্বয়ে আমানত এবং ঋণ ও মুনাফার পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংক ব্যবসার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অনুশীলন :

কেন মানুষ ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল?

ব্যাংক-এর প্রকারভেদ

প্রগতিশীল সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের তাগিদে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটে। অতীতে একই ব্যাংক মুদ্রা তৈরী, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আমানত গ্রহণ এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান ইত্যাদি কাজ করত। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভবপর নয়। এজন্য কাজের শ্রেণীভেদে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক। বর্তমানে অর্থনীতির প্রতিটি শাখার জন্য পৃথক পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কার্যক্রমের ভিন্নতাভেদে প্রাথমিক দৃষ্টিতে ব্যাংক যে রকম হতে পারে, তা হল –

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
২. বাণিজ্যিক ব্যাংক
৩. শিল্প ব্যাংক
৪. কৃষি ব্যাংক
৫. সমবায় ব্যাংক
৬. বিনিময় ব্যাংক
৭. সঞ্চয় ব্যাংক
৮. বন্ধকী ব্যাংক
৯. ইসলামী ব্যাংক
১০. বিশ্ব ব্যাংক

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

অর্থ ও ঋণের বাজারকে সুষ্ঠু এবং বিধিগতভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি স্বাধীন দেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে। এটি ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষে অবস্থান করে তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ – বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক', জাপানে 'ব্যাংক অব জাপান' যুক্তরাষ্ট্রে 'ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম', ভারতে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া', বৃটেনে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট প্রচলন ক্ষমতা রয়েছে। এটি সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংকার। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অর্থের চাহিদা অনুযায়ী তার যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা, অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃর্মূল্য স্থিতিশীল রাখা, ঋণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পন্থা কার্যকর করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারক করা এবং সরকারের আর্থিক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই মুনাফা অর্জন এর প্রধান লক্ষ্য নয়।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক

এ সকল ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, তারা কিভাবে এ ঋণ প্রদান করে। জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে এ ব্যাংক তাদেরকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। উদাহরণ – বাংলাদেশে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি।

অনুশীলনী :
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. শিল্প ব্যাংক

এ ধরনের ব্যাংক বিভিন্ন আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। দেশের শিল্পায়নে এ ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন, পুরাতন কারখানা মেরামত ও সংস্কার সাধন, উৎপাদন কাজ অব্যাহত রাখা ইত্যাদিতে শিল্প ব্যাংক উদ্যোক্তাদের স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন যোগান দিয়ে থাকে। উদাহরণ – বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক'।

৪. কৃষি ব্যাংক

আমাদের মত কৃষি প্রধান দেশে এই ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এটি কৃষকদের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। সাধারণতঃ বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদী, হালের গরু ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সেচ, কূপ খনন ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদী এবং ট্রাকটর, গভীর নলকূপ স্থাপন, ভূমি সংস্কার ইত্যাদির জন্য কৃষি ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। উদাহরণ – বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক'।

৫. সমবায় ব্যাংক

আমরা জানি, সাধারণতঃ ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা মুনাফা অর্জনের জন্য তাদের সঞ্চয় একত্রিত করে বিনিয়োগের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সকল সমবায়কে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা সমবায় ব্যাংকের কাজ। এ ব্যাংক দরিদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, বিভিন্ন যানবাহনের মালিক এবং সমবায় সমিতিগুলোকে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ দেয়। উদাহরণ – বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক।

৬. বিনিময় ব্যাংক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনা পরিশোধ পদ্ধতিকে সহজতর করার জন্য বিনিময় ব্যাংক গঠিত হয়। এটি দেশীয় মুদ্রাকে বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকও অনেক সময় বিনিময় ব্যাংকের কাজ করে। উদাহরণ – বাংলাদেশে অবস্থিত স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক ইত্যাদি।

৭. সঞ্চয় ব্যাংক

আমি, আপনি–আমরা সবাইতো ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করি। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল সঞ্চয় ব্যাংক। এ ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা। এটি সাধারণতঃ উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে জনসাধারণকে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে উৎসাহ প্রদান করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সঞ্চয় ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশে পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক মূলতঃ সঞ্চয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।

৮. বন্ধকী ব্যাংক

আপনার যদি জরুরী প্রয়োজনে টাকার দরকার হয় তবে আপনি কোথায় যাবেন? আত্মীয়-স্বজনের কাছে চাইলে হয়ত ধার পেতে পারেন – কিন্তু আপনার যদি আরও বেশি টাকার প্রয়োজন থাকে তবে এক্ষেত্রে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বন্ধকী ব্যাংক। আপনার যদি নিজস্ব জমি থেকে থাকে, তাহলে জমি বন্ধক রেখে আপনি দীর্ঘকালীন ঋণ পেতে পারেন। এ সকল ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রেই ঋণ প্রদান করে থাকে।

৯. ইসলামী ব্যাংক

সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক জেদ্দায় 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যাংক।

উদাহরণস্বরূপ – সুদানের ‘ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক’, বাহরাইনের ‘বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক’, জর্ডানের ‘জর্ডান ইসলামী ব্যাংক’ প্রভৃতি। আপনি যদি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক অর্থ সঞ্চয় করতে চান, তবে এখানে তা পারবেন, কারণ এরা আপনার জমাকৃত অর্থের ওপর সুদ নয়, মুনাফা দেয়। বাংলাদেশেও ১৯৮৩ সালে ‘ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ’ নামে দেশের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১০. বিশ্ব ব্যাংক

বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংক গঠিত। মূলতঃ বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এ ব্যাংকের মূলধন যোগান দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক সদস্য দেশগুলোর পুনর্গঠন কাজে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যাংক কি? ব্যাংকের উৎপত্তি কিভাবে হল লিখুন।

২. ব্যাংক কত প্রকার ও কি কি? সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ব্যাংকের প্রথম কাজ কি ছিল?
ক. আমানত গ্রহণ খ. ঋণদান
গ. স্বর্ণমুদ্রা তৈরী ঘ. স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন

২. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?
ক. শিল্প ব্যাংক খ. সোনালী ব্যাংক
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. কৃষি ব্যাংক

৩. কোন ব্যাংক দেশে মুদ্রার প্রচলন করে?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. শিল্প ব্যাংক ঘ. বিশ্ব ব্যাংক

৪. নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?
ক. ঋণদান করা খ. আমানত গ্রহণ করা
গ. অর্থের যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি করা ঘ. মুদ্রার প্রচলন করা

সমস্যা

ধরুন, আপনারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলেন, পড়ালেখা শেষ করে চাকরির খোঁজে না বেরিয়ে একটি আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করবেন। আপনাদের মেধা রয়েছে, রয়েছে এগিয়ে যাবার পথে দৃঢ় মনোবল। কিন্তু এমন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও আপনাদের পথে যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল মূলধন। নগদ অর্থের অভাবে হয়ত আপনাদের এত সুন্দর প্রচেষ্টা ব্যাহত হবার উপক্রম। এ ক্ষেত্রে আপনারা কোন্ ধরনের ব্যাংকের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন? কিভাবে ঋণ পেতে পারেন।

পাঠ - ৫ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমাদের জীবনের সাথে অর্থের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ দৈনন্দিন জীবন-যাপনে লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিক থেকে আপনি নিশ্চয়ই সকলের সঙ্গে একমত হবেন যে, বর্তমান বিশ্বে প্রাত্যহিক জীবনে অর্থ ছাড়া পৃথিবী অচল। আর এই অর্থের লেনদেনে আমরা যে প্রতিষ্ঠানের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তার নাম ব্যাংক। সাধারণভাবে যে সকল ব্যাংকে আমরা যাতায়াত করি সেগুলো হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ সকল ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে আমরা সুদ/মুনাফা পাই। কাজেই মনে হয়, এ সকল ব্যাংক আমাদের অনেক উপকার করছে – তাই না! হ্যাঁ, এ সকল ব্যাংক নানা দিক দিয়ে আমাদের উপকার করছে ঠিকই, কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন, এ সকল ব্যাংক যেন আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে পারে, সেজন্য এদের কার্যকলাপের উপর যে প্রতিষ্ঠানটি সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখছে, তার নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নানাভাবে এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের সহায়তা করছে। কিভাবে বিনিয়োগ করলে আপনি বেশি সুবিধা পাবেন – এ সম্পর্কে উপদেশ দেয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমাকৃত আপনার অর্থের যেন সদ্ব্যবহার হয়, তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এ ব্যাংক। সে অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য সকল ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণই এ ব্যাংকের প্রধান কাজ। দেশের ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাণ এবং গতি সঞ্চার করে থাকে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাদি পর্যালোচনার আগে আসুন সংক্ষেপে জেনে নিই এর ইতিহাস।

কবে থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

মজার ব্যাপার কি জানেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্ভবের অনেক পরে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ১৬৬৮ সালে সুইডেনের Riks Bank প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গোড়াপত্তন হয়। এটি বিশ্বের সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বয়স যদিও তিন শতাব্দীরও বেশি, এর সত্যিকার কার্যক্রম এবং বিকাশ সাধিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

উদাহরণস্বরূপ, Bank of England প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৪ সালে কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে এর প্রকৃত কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৪৪ সালে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম দিকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সূচনা হয় মূলতঃ একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৮২ সালে Bank of Japan প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের মুদ্রাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে Bank of England-এর প্রতিষ্ঠা পাওয়া ছিল একটি দৈব ঘটনা। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেকের সাহায্যে তাদের ব্যালান্স মীমাংসা (clearing the balances) করার জন্য Bank of England-কে সুবিধাজনক মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়ার পর থেকেই এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। আধুনিককালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীকে তাই কতগুলো সাধারণ

শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। এ পাঠে আমরা সংক্ষেপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা ও প্রধান কার্যাবলী সম্পর্কে জানব।

অনুশীলনী :

বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরে মানুষ কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল?

এক কথায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করলে এর সম্পর্কে একটি সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা যাবে। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য।

Paul A. Samuelson ও William D. Nordhaus প্রদত্ত নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে আমরা একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারব :

কেন্দ্রীয় ব্যাংক “সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সংস্থা যা একটি দেশের অর্থের যোগান ও ঋণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে পরিচালনা করে থাকে। ("A government established agency responsible for controlling the nation's money supply and credit conditions and for supervising the financial system, especially commercial banks")।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলতঃ আর্থিক ব্যাপারে সরকারের প্রতিনিধি। এটি একটি সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়তা করে জনসাধারণ ও সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধন করে।

নিম্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর পরিধি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

১. নোট প্রচলন করা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে নোট প্রচলন করা। কাগজী ও ধাতব মুদ্রা ছাপানোর অধিকার শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরই আছে। সে কারণেই, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণভাবে নোট প্রচলনের ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ছিল। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এককভাবে দেওয়া হল কেন। এর উত্তরে বলা যায়, ইস্যুকৃত নোটের সমজাতীয়তা রক্ষা করা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টি এ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২. সরকারের ব্যাংকার

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। সরকারের সকল আয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের সকল স্তর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করে। এছাড়া, সরকারী ঋণের পরিচালনা করা, সরকারকে প্রয়োজনমত স্বল্পকালীন ঋণ দেয়া, সরকারকে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এবং আর্থিক ব্যাপারে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া আর্থিক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের উত্তম পরামর্শক হিসেবে কাজ করে।

৩. ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাংক তাদের নগদ আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন অন্যান্য ব্যাংক এ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখে। এর উত্তরে বলতে হয়, এ জমা রাখার ফলে ব্যাংকগুলি প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ পায়। কোন কোন দেশে, যেমন – ইংল্যান্ডে, এটি প্রথা হিসেবে প্রচলিত। আবার, কোন কোন দেশে এটি আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে আইনতঃ এদের মোট আমানতের শতকরা ৫ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকসমূহের প্রদেয় ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। যদি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে তাহলে মোট অর্থের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। আবার যদি ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তাহলে মুদ্রা সংকোচন দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কমে যাবে। সুতরাং কখন, কি পরিমাণ ঋণ প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এখন প্রশ্ন জাগে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক-হার পরিবর্তন, খোলা বাজারী কারবার, নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন – অনুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলির ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অনুশীলনী :
কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে একটি দেশের অর্থনীতিতে অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, আলোচনা করুন।

৫. ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের সর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। সাধারণতঃ ব্যাংকগুলি আমানতকারীদের অর্থ নিয়ে কাজ করে। আমানতকারী দাবী করলে ব্যাংক তাদের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এজন্য ব্যাংক সব সময় কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগণ তাদের আমানতের একটি বড় অংশ উঠিয়ে নিতে পারে (দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহের বা সূত্রপাত, শেয়ার বাজারের সূচকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিস্থিতিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে)। এই অবস্থায় ব্যাংক বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়। এই প্রকার সাময়িক অর্থ সংকট কাটানোর জন্য ব্যাংক যখন অন্য কোন উৎস হতে ঋণ পায় না, তখন একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক একে ঋণদান করে থাকে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

৬. বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা

মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ। দেশের মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিরতা না থাকলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এজন্য বর্তমানে প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক-বিনিময় হার ধার্য্য করে দেয় এবং এই হার যাতে অযথা পরিবর্তিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখে।

৭. ক্লিয়ারিং হাউজ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে।

৮. অন্যান্য

উপরোক্ত সাধারণ কাজগুলো ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ কতগুলো কাজ সমাধা করে থাকে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ ঋণ কাঠামো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার অভ্যন্তরীণ মূল্য অপরিবর্তিত রাখে। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের জন্য শিল্প ঋণ সংস্থা এবং কৃষি ঋণ সংস্থার মত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে এবং ক্ষেত্রভেদে সরাসরি ঋণ প্রদান করে থাকে। শেষোক্ত বিষয়টি বাংলাদেশের মত উন্নয়শীল দেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা লিখুন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলীসমূহ আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কোন ব্যাংককে সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক বলা হয়?
   ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক   খ. কৃষি ব্যাংক
   গ. শিল্প ব্যাংক   ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২. বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?
   ক. Risk Bank   খ. Federal Reserve Bank
   গ. Bangladesh Bank   ঘ. World Bank

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ কি?
   ক. মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা   খ. ক্লিয়ারিং হাউজ
   গ. নোট প্রচলন করা   ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা

৪. কোন ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে?
   ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক   খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
   গ. সমবায় ব্যাংক   ঘ. বিশ্ব ব্যাংক

৫. বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত ব্যাংকগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আমানতের শতকরা হার কত?
   ক. ৫%   খ. ১০%
   গ. ৭%   ঘ. ৯%

সমস্যা

ধরুন, আপনাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ করা হল। এমতাবস্থায় বর্তমানে প্রচলিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যধারাগুলোকে কি আপনি পর্যাপ্ত মনে করেন? যদি না করেন তাহলে এক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের সংযোজন বা বিয়োজন বা উভয়ই ঘটাবেন? আর যদি বর্তমান কার্যধারাকে পর্যাপ্ত মনে করেন তবে এর আলোকে কিভাবে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবেন? বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিন্তা করুন।

পাঠ - ৬ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী সম্বন্ধে বলতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন

'বাণিজ্যিক ব্যাংক' শব্দটি পড়েই আপনি নিশ্চয়ই একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে শব্দটি শুনলে মনে হয় – যে ব্যাংক বাণিজ্য করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। আসলেই কিন্তু তাই। মূলতঃ বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককেই বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

সংজ্ঞাটি এভাবে দেয়া যায় – যে ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হতে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক কম সুদে ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের ঋণ প্রদান করে। সুদ দেয়া ও সুদ নেয়া ও এ দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তাই ব্যাংকের মুনাফা।

আসুন এবার বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী জেনে নেয়া যাক।

আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর কার্যাবলীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী
খ. জনহিতকর কার্যাবলী
গ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

নিচে এগুলো আলোচনা করা হল।

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর প্রাথমিক ও মৌলিক কার্যাবলীকে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী বলে। নিম্নের আলোচনা থেকে আমরা এ সম্বন্ধে একটি ধারণা পেতে পারি।

১. আমানত গ্রহণ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে সাধারণতঃ তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে। যথা –

i. চলতি আমানত
ii. স্থায়ী আমানত
iii. সঞ্চয়ী আমানত

যে আমানত হতে আমানতকারী ইচ্ছামত যে কোন সময় টাকা তুলতে পারে তাকে চলতি আমানত বলা হয়। চলতি আমানতের উপর সাধারণতঃ কোন সুদ দেয়া হয়না। যে আমানত হতে আমানতকারী একটি নির্দিষ্ট সময় পর টাকা তুলতে পারে তাকে স্থায়ী আমানত বলা হয়। এক্ষেত্রে আমানতকারী আমানত রাখার তারিখ হতে নির্দিষ্ট সময় পরে (যেমন ৬ মাস) যথোপযুক্ত নোটিশ দিয়ে টাকা তুলতে পারে। কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদ শেষ হবার পর টাকা তোলা যায় বলে একে মেয়াদী আমানতও বলা হয়।

সঞ্চয়ী আমানত হতে সপ্তাহে একবার বা দু'বার টাকা তোলা যায় এবং এর সুদ মেয়াদী আমানত অপেক্ষা কম। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অধিকাংশ লোকই এরূপ আমানত করে থাকে।

২. ঋণদান

ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হল ঋণ দান করা। লোকে যে অর্থ ব্যাংকের আমানত হিসেবে জমা রাখে তার সবটাই ব্যাংক কখনও নগদ অর্থ হিসেবে হাতে রাখে না। ব্যাংক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ হাতে রেখে অপর অংশ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি শ্রেণীর লোককে ধার দেয় এবং তাদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে। এভাবে তারা মুনাফা অর্জন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করে। ব্যাংক সাধারণতঃ তিন প্রকারে টাকা দেয়। প্রথমত, জিনিসপত্র বা অন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য বন্ধক রেখে সরাসরি নগদ টাকা ধার দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমানতকারীর আমানতের অতিরিক্ত পরিমাণ অগ্রিম দিতে পারে। তৃতীয়ত, হুন্ডি বা প্রতিশ্রুতি পত্রের বিনিময়ে টাকা ধার দিতে পারে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ঋণদান করে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৩. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করে। ব্যাংক চেক বিহিত মুদ্রার মতই লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

৪. ঋণ আমানত সৃষ্টি

বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করতে পারে। যারা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেক সময় ঋণের টাকা নগদ না উঠিয়ে ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখে। পরে প্রয়োজনবোধে ঋণ গ্রহীতা চেকের মাধ্যমে সে টাকা উঠাতে পারে। এক্ষেত্রে ঋণ হতেই আমানত সৃষ্টি করে।

৫. ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা

মুদ্রাবাজারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহায়তা করে।

অনুশীলনী :

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী আলোচনা করুন।

খ. জনহিতকর কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্য করলেও এর পাশাপাশি কিছু জনহিতকর কাজ করে। যেমন –

৬. হুন্ডি বাট্টা করা

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আরও একটি প্রধান কাজ হচ্ছে হুন্ডি বাট্টা করা। হুন্ডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই যদি অর্থের প্রয়োজন হয় তবে হুন্ডির মালিক তা ব্যাংকে ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা পেতে পারে। তবে হুন্ডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের সুদ অগ্রিম কেটে বাকী টাকা হুন্ডির মালিককে দেয়া হয়। একে হুন্ডির বাট্টাকরণ বলে।

৭. অর্থ প্রেরণ

বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ পদ্ধতিতে মক্কেলের অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরণের সুযোগ করে দেয়। ব্যাংকের দেয়া চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারী চেক প্রভৃতির মাধ্যমে মক্কেলগণ বিভিন্ন স্থানের পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে পারে।

৮. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। হুন্ডি বাট্টা করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এভাবে বাণিজ্যে গতি সঞ্চারিত হয়।

৯. মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ

বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের মূল্যবান দলিল, অলংকার, গয়না ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করে। এর বিনিময়ে ব্যাংক মক্কেলদের কাছ থেকে কিছু অর্থ গ্রহণ করে ঠিকই, কিন্তু এতে মক্কেলগণই বেশি লাভবান হন।

গ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

১০. মক্কেলদের পক্ষ হয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ঋণপত্র এবং নিরাপত্তা ক্রয়-বিক্রয় করে।

১১. বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের বাড়ী ভাড়া, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি পরিশোধ করে থাকে।

১২. অছি (Trustee) হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের সম্পত্তি দেখাশোনা করে।

১৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের জন্য টিকিট, পাসপোর্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

১৪. মক্কেলদেরকে প্রয়োজনবোধে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, দেশের বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিন।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলীকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক. দুই   খ. তিন
গ. চার   ঘ. পাঁচ

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ কি?

ক. ঋণদান করা   খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা
গ. মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা   ঘ. আমনত গ্রহণ করা

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের নিকট থেকে কয় ধরনের আমানত গ্রহণ করে?

ক. তিন   খ. চার
গ. পাঁচ   ঘ. ছয়

৪. নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত?

ক. হুন্ডি বাট্টা করা
খ. অর্থ প্রেরণ করা

গ. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা
ঘ. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা

৫. নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের জনহিতকর কাজ নয়?
ক. আমানত গ্রহণ খ. ঋণ দান
গ. অর্থ প্রেরণ ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা

সমস্যা

ধরুন, আপনি বিদেশ থেকে আপনার ভাইকে অর্থ পাঠাচ্ছেন, কারণ সে একটি ব্যবসা শুরু করতে চায়। এ ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বিদেশ থেকে টাকা পাঠাবেন? আর ব্যবসা শুরুর জন্য আপনার পাঠানো অর্থ পর্যাপ্ত না হলে আপনার ভাই বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কি ধরনের সাহায্য পেতে পারেন?

পাঠ - ৭ : বীমা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বীমা কি তা বলতে পারবেন।
- বীমা কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীমার কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বীমা কি ?

প্রতিটি ব্যবসায়ের সাথেই ঝুঁকি জড়িত। আর ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে একটি আপেক্ষিক বিষয়। এটা হতে পারে লোকসানের ঝুঁকি অথবা সম্পত্তি, গাড়ি, আগুন বন্যা, দুর্ঘটনা এমনকি চুরিজনিত ঝুঁকি। এখন এরকম ঝুঁকির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে দোষারোপ করাও যায় না। আবার ক্ষতিপূরণও করা যায় না। ব্যবসায়ের এ জাতীয় ঝুঁকি বহনের এই অসুবিধার দরুনই বীমা প্রতিষ্ঠান মানুষের সকল ঝুঁকির বীমা করে থাকে।

তাহলে বীমা হচ্ছে এমন একটি দলিল যাতে বীমাকৃত সম্পত্তির বা দ্রব্যের বা ব্যক্তির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এবং যার বিপরীতে বীমা হচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ দেয়া থাকে।

এখন কথা হচ্ছে, সব ঝুঁকির তো আর বীমা করা সম্ভব নয়। যেমন ধরুন যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ হলে ক্ষতি হবেই। এই জাতীয় ঝুঁকির বীমা করা সম্ভব নয়। তাহলে দু'রকমের ঝুঁকি পাওয়া যাচ্ছে –

ক. নিশ্চিত ঝুঁকি ও

খ. অনিশ্চিত ঝুঁকি

নিশ্চিত ঝুঁকি হচ্ছে যে সব দ্রব্যের ঝুঁকি বীমা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পূরণ করা যায়। যে সমস্ত দ্রব্যের পরিবর্তন গাণিতিকভাবে গণনা করা যায় এবং কোন ক্ষতি হলে তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় তা-ই নিশ্চিত ঝুঁকি। এই ঝুঁকির মূল্য নির্ধারণই হচ্ছে বীমার কিস্তির ভিত্তি। বীমা প্রতিষ্ঠান এই জাতীয় ঝুঁকি বহন করে কারণ –

ক. ঝুঁকি বহনকারী বহুলোক তাদের ঝুঁকি দূর করার জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হয়।

খ. শুধু অল্পসংখ্যকই ক্ষতির স্বীকার হয়।

গ. দীর্ঘমেয়াদে বীমার দাবী ঐ সময়ে এদের কিস্তির চেয়ে কম হয়।

উদাহরণস্বরূপ আগুন, গাড়ী দুর্ঘটনা প্রভৃতির কথা বলা যায়।

আবার কিছু কিছু ঝুঁকি অনিশ্চিত, কারণ এই জাতীয় ঝুঁকির ক্ষতির পরিমাণ গণনা করা যায় না। তাই বীমার কিস্তির পরিমাণও নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বন্যা, ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবসায়ের ক্ষতি, দামের ঝুঁকি, মানুষের রুচি বা স্বাদের পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রভৃতির কথা বলা যায়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, এত ঝুঁকি বহন করে বীমা প্রতিষ্ঠান কিভাবে মুনাফা তৈরি করে?

বীমা প্রতিষ্ঠান জনগণের একটি অপরিহার্য সেবা প্রদান করে। এর মাধ্যমেই তারা তাদের ব্যবসা করে। বিনিময়ে তারা তাদের অংশীদারের মুনাফা বৃদ্ধি করার প্রত্যাশা করে। বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের কাছে বীমা-বিক্রি করে বীমার কিস্তি পায়। বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করার জন্য একই রকম মানসম্পন্ন শুল্ক, কিস্তির হার, মানসম্পন্ন নীতি গ্রহণ করে। যেমন – অগ্নিবীণা। অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রচুর তরল অর্থের

সংস্থান করা যায়, যার দ্বারা গ্রাহকের দাবী মিটানো হয়। বাকী টাকা দক্ষভাবে অন্য ব্যবসায় খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা যায়।

আর এভাবেই বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করে থাকে।

উচ্চ বীমা ও নিম্ন বীমা (Over Insurance and Under Insurance) :

একজন লোক যদি তার সম্পত্তির জন্য ১২,০০০ টাকার বীমা করে এবং যদি তার সম্পত্তির মূল্য হয় ১০,০০০ টাকা তবে তা হবে উচ্চসীমা। এই জাতীয় বীমা গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক নয়। কারণ –

১. তাকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কিস্তি প্রদান করতে হয়।
২. যদি তার সম্পত্তি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় তবে সে কখনই ১২,০০০ টাকা পাবে না। সে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে কারণ বীমা হচ্ছে নিরাপত্তার চুক্তি।
৩. সে তার জ্ঞানমতে তার সম্পত্তির মূল্যের অতিরিক্ত স্ফিতি ঘটাবে না। কারণ বীমা হচ্ছে সর্বাধিক নির্ভরতার চুক্তি।

আবার যদি একজন লোক তার সম্পত্তির ৮,০০০ টাকার বীমা করে এবং যদি তার সম্পত্তির মূল্য ১০,০০০ টাকা হয় তবে তা নিম্ন বীমা। এ জাতীয় ব্যক্তি তার বীমাকৃত কিস্তি হতে সঞ্চয়ের প্রত্যাশা করে কারণ সে কম কিস্তি প্রদান করছে। এখন কথা হচ্ছে নিম্ন বীমা থেকেও সে কোন সুবিধা পায় না। কারণ –

১. তার সম্পত্তি পুরোপুরি আওতাভুক্ত নয়। যদি সম্পত্তি পুরোপুরি নষ্ট হয় তবে সে সর্বোচ্চ ৮,০০০ টাকা পেতে পারে। কারণ তার কিস্তির পরিমাণ হচ্ছে শুধু ৮,০০০ টাকা। যদি তার সম্পত্তির অর্ধেক নষ্ট হয় তবে সে $\frac{১}{২} \times ৮,০০০ = ৪,০০০$ টাকা ক্ষতিপূরণ পায়। এক্ষেত্রে তার সম্পত্তির প্রতিস্থাপন মূল্য ৫,০০০ টাকা। এর কারণ বীমা হচ্ছে নিরাপত্তার চুক্তি।
২. সে তার জ্ঞানমতে তার সম্পত্তির মূল্যের সংকোচন ঘটাবে না। কারণ বীমা সর্বাধিক নির্ভরতার চুক্তি।
   তাহলে দাড়ায় যে, বীমাকৃত সম্পত্তির মূল্য বীমার কিস্তির চেয়ে কম হলে তা উচ্চ বীমা এবং সম্পত্তির মূল্য বীমার কিস্তির চেয়ে বেশি হলে তা নিম্ন বীমা বলে।

বীমার প্রকারভেদ :

এখন আসুন আমরা বীমার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করি। বীমা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন –

নৌ-বীমা

এ জাতীয় বীমা জাহাজ এবং দ্রব্যাদির সমুদ্রের ভয়ানক বিপদের জন্য হয়ে থাকে। এই ভয়ানক বিপদসমূহের মধ্যে আগুন, চুরি, দস্যুবৃত্তি, ভার কমানোর জন্য পানিতে ফেলে দেয়া দ্রব্যাদি, বাজেয়াপ্তকরণ, আটকাবস্থা, খারাপ আবহাওয়া, নিমজ্জিত হওয়া এবং সংঘর্ষ ইত্যাদি।

চার রকম নৌ-বীমা রয়েছে। যেমন –

ক. **জাহাজের কাঠামো ও যন্ত্রপাতি :** এই জাতীয় নৌ-বীমা জাহাজের ক্ষতির জন্য উপকারী। এটা ১২ মাসের জন্য সময়-বীমা হতে পারে। আবার স্থানান্তর-বীমাও হতে পারে। অর্থাৎ স্থানান্তর বীমা যাত্রার বন্দর থেকে শুরু করে পৌঁছানোর বন্দর পর্যন্ত কার্যকরী।

খ. **জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি :** এ জাতীয় বীমায় জাহাজের মালিক তার জাহাজে বহনকৃত দ্রব্যাদি নষ্ট হওয়ার জন্য দাবী করতে পারে। এ জাতীয় বীমার ক্ষেত্রে দ্রব্যের মালিক দ্রব্য নষ্ট হবার জন্য যে ক্ষতিপূরণ পায় তার একটা অংশ আমদানীকারককে প্রদান করে। কারণ আমদানীকারক দ্রব্যাদি না পেলেও তার কিছু ব্যবস্থাপনা খরচ হয়। এই খরচ মিটানো এবং ব্যবসায়ের সুখ্যাতি বজায় রাখার জন্য এ জাতীয় ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। এটা যদি F.O.B (Free on Board) চুক্তি হয় তবে রপ্তানীকারক বহনকারী জাহাজে মালামাল তুলে দেয়ার খরচ বহন করে। আবার এটা যদি C.I.F (Cost, Insurance, Freight) অর্থাৎ দাম, বীমা ও পরিবহন মাশুল-চুক্তি হয় তাহলে রপ্তানীকারক দ্রব্যটি উহার গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার সকল দায়িত্ব বহন করে।

গ. **মালামাল :** জাহাজের মালিক সাধারণতঃ মালামালের বহনের খরচ অগ্রিম আদায় করে। জাহাজ হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে বহনের খরচ ফেরত দিতে হয়। এই জাতীয় দায়বদ্ধতার জন্য তাকে বীমা করতে হয়।

ঘ. **জাহাজের মালিকদের দায়বদ্ধতা :** জাহাজের মালিক জাহাজ, যাত্রী, নাবিক, ক্রু অন্যান্য বাহন, জাহাজের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষতি, তেল নিঃসরণ ইত্যাদির জন্য বীমা এই পর্যায়ের আওতাভুক্ত। নৌ-বীমার প্রধান বাজার হল Joyper Loyads।

অগ্নিবীমা :

কোন ঘর-বাড়ী, দালান, অফিস আদালত প্রভৃতি স্থানে আগুন লাগলে যে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তার বিপরীতে যে বীমা করা হয় তা অগ্নিবীমা। এই জাতীয় বীমার আরও সম্প্রসারিত কয়েকটি দিক রয়েছে। অগ্নিবীমা সিঁদ কেটে চুরি, বাড়ির ধ্বস, চুরি, গৃহপরিচারক বা পরিচারিকার দুর্ঘটনা, তৃতীয় পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা, কাঁচ ভাঙ্গা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে।
দালানের অবস্থা, স্থায়িত্ব, দহন ক্ষমতা, অগ্নি-নিরোধক ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর কিস্তির পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণতঃ অগ্নিবীমা প্রভাবজনিত লোকসানেরও বীমা অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এটা হল আগুনের জন্য দালান বা যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য মুনাফার যে লোকসান হয়। সম্প্রসারিত অগ্নিবীমা বয়লার ও যন্ত্রপাতির বীমাকে অন্তর্ভুক্ত করে। বন্যা নীতিও অগ্নিবীমার একটি সম্প্রসারিত কার্যক্রম।

জীবন বীমা :

এই জাতীয় বীমা কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর বা বীমার পলিসির পূর্ণতা সম্পন্ন হওয়ার পর দেয়া হয়। এর দুটি প্রধান শাখা হল –

সাধারণ : এটা শুধু পলিসির মালিক বা তার উত্তরাধিকারদের নিয়ে পর্যালোচনা করে।
শিল্পজনিত : এই জাতীয় বীমা কম উপার্জনকারীদের নিয়ে পর্যালোচনা করে।

জীবন বীমার বিভিন্ন ধরন :

পূর্ণ-জীবন পলিসি : এই জাতীয় পলিসিতে কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে অথবা নির্দিষ্ট কোন বয়সের শেষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পায়। কিস্তির পরিমাণ Endowment পলিসির চেয়ে কম হয় কারণ এটা দীর্ঘ সময় ধরে দেয়া হয়।

Endowment পলিসি : পলিসির পূর্ণতা অথবা মৃত্যু যেটি আগে ঘটে তার জন্য যে বীমা করা হয় তা Endowment পলিসি। এটা মুনাফা যুক্ত বা মুনাফাবিহীন হতে পারে।

পারিবারিক আয় পলিসি : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী বা নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ এই পলিসির অর্থ পায়। এই পলিসির অর্থ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়।

বন্ধক নিরাপত্তা পলিসি : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার বন্ধককৃত সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য এই বীমা করা হয়। ব্যক্তির মৃত্যুর পর বীমা প্রতিষ্ঠান অপ্রদেয় অর্থ প্রদান করে থাকে।

সমষ্টিগত জীবন-বীমা পলিসি : এক জাতীয় কয়েকজন চাকুরীজীবি মিলে এটা করে। এই জাতীয় পলিসিকে পেনশন বীমাও বলা হয়। পেনসন বীমা একটি সমবায় সমিতির মাধ্যমে করা যায়।

দুর্ঘটনাজনিত বীমা : বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকির জন্য যে বীমা করা হয় তাই দুর্ঘটনাজনিত বীমা। এই জাতীয় বীমার প্রকারভেদ হল –

ক. দায়বদ্ধতা বীমা :

১. কর্মচারীদের অবহেলার দরুন কাজের সময় তাদের কোন দুর্ঘটনার দায়বদ্ধতা।

২. পেশাজীবিদের নিরাপত্তা। আইনবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট ইত্যাদি পেশাজীবিদের অবহেলা ও ত্রুটি ইত্যাদির বিপরীতে বীমা।

৩. **সমষ্টিগত দায়বদ্ধতা :** যদি কখনও তৃতীয় পক্ষের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ ক্ষতি বীমাকারীর দ্বারা অথবা তার কোন কর্মচারী দ্বারা সংগঠিত হয় তাহলে এই জাতীয় বীমা কার্যকর হয়।

৪. **ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা :** কোন ব্যক্তির নিজের বা তার প্রতিষ্ঠান বা তার কোন কর্মচারী দ্বারা অন্য কারোর বা তার প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়ক্ষতি সংগঠিত হলে তা এই জাতীয় বীমার আওতায় পড়ে।

খ. সম্পত্তি বীমা : এই জাতীয় বীমার আওতায় একটি প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য বীমা করা হয়ে থাকে।

গ. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা : কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী আহত বা মৃত্যুর সম্মুখীন হলে এই জাতীয় বীমার দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

ঘ. মহিলা কল্যাণ বীমা : যদি কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলা শ্রমিক সংখ্যা ৫ জনের কম হয় এবং তাদের বেতন ১০০০ ডলারের কম হয় তবে তাদেরকে এই বীমার আওতায় ফেলা হয়। এই বীমা সাধারণত মালয়েশিয়ায় কার্যকরী।

ঙ. টাকার ক্ষতিজনিত বীমা : হস্তান্তরের সময় টাকা হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে এই বীমা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করা যায়।

চ. সুদ বীমা : ব্যাংকে বা অন্য যে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা যে কারো শঠতা বা প্রতারণা থেকে নিরাপত্তার জন্য এই জাতীয় বীমা করা হয়।

ছ. অসুস্থতা বীমা : একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী বা তাদের পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার জন্য আর্থিক বরাদ্দের জন্য এ জাতীয় বীমা করা যায়।

বাহন বীমা :

বাহন বীমা গাড়ির দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি, অপর পক্ষের সম্পদের ক্ষতি, নিজের সম্পদের ক্ষতি, গাড়ি চুরি বা গাড়িতে আগুন লাগা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বীমা করে থাকে। গাড়ি আরোহীদের সম্পদের

নিরাপত্তা ও তাদের দুর্ঘটনাজনিত অসুস্থতা ইত্যাদি এর আওতায়। বিশ্বের প্রায় অনেক দেশেই গাড়ি সার্বিক বীমা অথবা তৃতীয় পক্ষ বীমা নিশ্চিত।

বিমান বীমা :

এ জাতীয় বীমা আকাশ পথে বিমান, হেলিকপ্টার প্রভৃতি আকাশযানের ক্ষয়ক্ষতির নিরাপত্তার জন্য বীমা করে থাকে। এই জাতীয় বীমা যাত্রীদের দুর্ঘটনা, তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি, সম্পত্তি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে। বিমানের কর্মীরাও সমষ্টিগতভাবে এ বীমার আওতায়।

নিউক্লিয়ার বীমা :

এ জাতীয় বীমা বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশে প্রচলিত। এ জাতীয় বীমার আওতায় নিউক্লিয়ার যে কোন বিস্ফোরণের জন্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের জীবন, তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি প্রভৃতি। নিউক্লিয়ার বীমা পুলস-এর আওতাধীন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো এ জাতীয় বীমা পরিচালনা করে।

বীমা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব :

এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন প্রকারের বীমা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আসা যাক্ এর গুরুত্ব কি –

১. আমাদের জীবনের বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনার নিরাপত্তা বিধান করছে বীমা প্রতিষ্ঠান। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারদের একটা নির্দিষ্ট অর্থের নিশ্চয়তা বীমা প্রদান করছে।

২. এ ছাড়া সাধারণ বীমাসমূহ আমাদের বিভিন্নরকম ব্যবসায় উৎসাহিত করছে এবং এতে করে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জাতীয় আয় বাড়ছে, দেশের উন্নতি হচ্ছে।

৩. নৌ বা বিমান বীমা দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আরও ত্বরান্বিত করছে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে ও দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে।

৪. বীমা প্রতিষ্ঠা অল্প কিস্তি (Premium) নিয়ে অনেক বেশি মুনাফা দিচ্ছে।

৫. এর দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি নিরাপদ ও রক্ষণশীল।

সুতরাং দেশের সার্বিক উন্নয়নে বীমা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনী ১ :

নীচের অগ্নিবীমাগুলোর মধ্যে কোনটি কোন প্রকার বীমা লিখুন।
গাড়ীতে আগুন লাগা,
বাড়ীতে আগুন লাগা,
শরীরে আগুন লাগা,
জাহাজে আগুন লাগা,
বিমানে আগুন লাগা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বীমার সংজ্ঞা লিখুন। উচ্চ বীমা ও নিম্ন বীমা কি লিখুন।
২. বীমার প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৩. বীমার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিশ্চিত ঝুঁকিতে কোন ক্ষতির মূল্য –
ক. সম্পূর্ণ নির্ধারণ করা যায় খ. সম্পূর্ণ মোটেই নির্ধারণ করা যায় না
গ. আংশিক নির্ধারণ করা যায় ঘ. বেশির ভাগ নির্ধারণ করা যায়

২. উচ্চ বীমাতে গ্রাহককে সম্পত্তির মূল্যের তুলনায় –
ক. কম কিস্তি প্রদান করতে হয় খ. সমান কিস্তি প্রদান করতে হয়
গ. বেশি কিস্তি প্রদান করহেত হয় ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়

৩. নৌ-বীমা কত প্রকার?
ক. তিন প্রকার খ. চার প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার ঘ. ছয় প্রকার

৪. নিম্নের কোনটি জীবন বীমার অন্তর্ভুক্ত?
ক. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা খ. সম্পত্তি বীমা
গ. অসুস্থতা বীমা ঘ. Endowment পলিসি।

সমস্যা ৮ :
"বীমা মানুষের সকল প্রকার ঝুঁকির নিয়ন্ত্রক।" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

পাঠ ২ : ১. খ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. ক ; ৫. খ

পাঠ ৩ : ১. ঘ ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ক ; ৫. ক

পাঠ ৪ : ১. ক ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ঘ

পাঠ ৫ : ১. ঘ ; ২. ক ; ৩. গ ; ৪. খ ; ৫. ক

পাঠ ৬ : ১. খ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. গ ; ৫. গ

পাঠ ৭ : ১. ক ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. ঘ

সরকারী অর্থব্যবস্থা

ইউনিট ৬

পাঠ ১ : প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি তা বলতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধাসমূহ দূরীকরণের উপায় বলতে পারবেন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন :

মনে করুন, আপনি বাংলাদেশের অবস্থা এবং উন্নয়ন নিয়ে ভাবছেন। আপনি বিগত বৎসরগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাবেন মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু উৎপাদন, বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উন্নয়নগুলোর মধ্যেই রয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আসুন এখন আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আলাদাভাবে জানার চেষ্টা করি।

অনেক অর্থনীতিবিদ প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই দু'টি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধারণা দু'টি এক নয়। অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই একটি অংশ। সাধারণভাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনুন্নত দেশের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যবহৃত হয় উন্নত দেশের জন্য। কারণ, অনুসৃত দেশের যে কোন ধরনের উন্নয়নকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা চলে। কিন্তু উন্নত দেশের সকল খাতই উন্নত অবস্থায় বিরাজমান। তাই বিভিন্নখাতের উন্নয়ন সেখানে উন্নয়নস্বরূপ বিবেচিত না হয়ে প্রবৃদ্ধিরূপে বিবেচিত হয়।

এবার আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের দেয়া সংজ্ঞাগুলো দেখি –

১. এ মডিসন এর মতে, "উন্নত দেশগুলোতে মানুষের আয়সীমা বৃদ্ধি পেলে তাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে এবং অনুন্নত দেশে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়।" A. Maddison – Economic Progress and Policy in Developing Countries.

২. কিন্ডলবার্গার এর মতে, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হল অধিক উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অধিক উৎপাদন এবং যে সব কারিগরী কৌশল ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ উৎপাদন বিতরণ ও সম্পাদিত হয় তাদের পরিবর্তন উভয়কেই বুঝায়।" C. P. Kindleberger – Economic Development.

৩. ফ্রিজম জন ফ্রিডম্যান বলেন, "সামাজিক ব্যবস্থাকে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন না করে এক বা একাধিক মাত্রায় প্রসার ঘটানোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার নতুন কোন কাঠামোগত পরিবর্তন আনা।" – John Friedmann – Growth Centres in Regional Economic Development. উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ইত্যাদির বাৎসরিক বৃদ্ধি বোঝায়।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতির এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়াকে বুঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয় এবং সমাজে নতুনতর গতিবেগ সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন শুধুমাত্র উৎপাদনের পরিমাণবাচক পরিবর্তনই আনয়ন করেনা, সাথে সাথে গুণবাচক পরিবর্তনও আনয়ন করে।

উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি এবং হ্রাস দু'টোকেই ধারণ করে। একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেও তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হতে পারে কারণ দারিদ্র, বেকারত্ব, অসম বন্টন ইত্যাদি কারিগরী ও কাঠামোগত পরিবর্তনের অনুপস্থিতির কারণে দেশ আগের অবস্থানেই থাকতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পনা করা অসম্ভব। অতএব, এ আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হল অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই একটি অংশ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি তা জানলাম। এবার আসুন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানগুলো সম্পর্কে জানি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহ :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া দুই ধরনের উপাদানের উপর নির্ভরশীল : অর্থনৈতিক উপাদান (Economic Factor) ও অ-অর্থনৈতিক উপাদান (Non-economic Factor)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি, মূলধন, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এগুলোকেই বলা হয় অর্থনৈতিক উপাদান। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয় যদি না দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের নৈতিকতা ইত্যাদি দেশের উন্নয়নে সহায়তা না করে। এই উপাদানগুলোকেই অ-অথনৈতিক উপাদান বলা হয়। এবার অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাক —

অর্থনৈতিক উপাদান :

অর্থনীতিবিদগণ উৎপাদনের উপকরণকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তিরূপে নির্দেশ করেন। দেশের প্রবৃদ্ধির হারের উঠানামা এগুলোরই ফলাফল। নিম্নে কয়েকটি অর্থনৈতিক উপাদান আলোচনা করা হল –

প্রাকৃতিক সম্পদ :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল উপাদান হল প্রাকৃতিক সম্পদ, বা ভূমি। অর্থনীতিতে 'ভূমি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জমির উর্বরতা, অবস্থান, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, পানি সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ সবগুলোই 'ভূমি' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। প্রবৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতি আবশ্যক। যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয় সে দেশের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে না। অনুন্নত দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ হয় অব্যবহৃত, না হয় অর্ধ ব্যবহৃত অথবা ভুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইহা তাদের পশ্চাৎপদের একটি কারণ। একটি

দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকাই তার প্রবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয় যদি না তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। অনেক অনুন্নত দেশ তাদের প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং আর্থিক বিনিয়োগের স্বল্পতার জন্য তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেনা।

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা থাকা সত্ত্বেও কোন দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। ইহা সম্ভব হয় তাদের সীমিত সম্পদের নতুন ব্যবহার আবিষ্কারের মাধ্যমে। এর উদারহণরূপ, আমরা জাপানের কথা বলতে পারি। জাপান প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও তারা তাদের সীমিত সম্পদের নতুন ধরনের ব্যবহার আবিষ্কার, বিদেশ হতে কাঁচামাল এবং কিছু খনিজ আমদানীর মাধ্যমে উন্নত জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে।

মূলধন গঠন (Capital Accountation) :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মূলধন গঠন। বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে যে সব দ্রব্য মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃত মূলধন দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধিকে মূলধন গঠন বলে। মূলধন গঠন প্রাথমিকভাবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। মূলধন গঠন তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধাপে সম্পন্ন হয় –

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি এবং তাদের বৃদ্ধি
২. সঞ্চিত অর্থকে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা সঠিক স্থানে যোগান দেয়া
৩. এই আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগের জন্য মূলধন দ্রব্যে রূপান্তর।

মূলধন গঠনের হারকে বৃদ্ধি করার অনেক ধরনের উপায় রয়েছে। অনুন্নত দেশগুলোতে সঞ্চয় প্রবণতার হার কম বলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের আশ্রয় নেয়া দরকার। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ভোগ কমায় এবং ফলশ্রুতিতে মূলধন গঠনে সম্পদ যুক্ত হয়। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি হল করারোপ, ঋণ ইত্যাদি। অনুন্নত দেশে গ্রামাঞ্চল থেকে বেকার লোকের শহরে স্থানান্তরের মাধ্যমেও মূলধন গঠিত হয়। মূলধন গঠন প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। অনুন্নত দেশে মূলধন গঠনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া জাতীয় উৎপাদন বিভিন্ন উপায়ে বৃদ্ধি করে। অনুন্নত অর্থনীতিতে মূলধন গঠন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মোকাবেলার জন্য আবশ্যিক। মূলধন দ্রব্যে বিনিয়োগ শুধু উৎপাদনই বৃদ্ধি করে না, চাকুরীর সুযোগও সৃষ্টি করে। প্রযুক্তিগত উন্নতি মূলধন গঠন দ্বারা চালিত হয় যা দেশকে বৃহদায়তন উৎপাদনে যেতে সহায়তা করে। মূলধন গঠনের মাধ্যমেই দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ, শক্তি, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নয়ন সম্ভব। মূলধন গঠনই প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু উত্তোলন ও ব্যবহার, দেশের শিল্পায়ন, বাজারের বিস্তৃতি ইত্যাদি নিশ্চিত করে যেগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যিক।

উদ্যোক্তা :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল উদ্যোক্তা। সংগঠক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন উপাদানের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে। সংগঠক মূলধন এবং শ্রমের পরিপূরক এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আধুনিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে, উদ্যোক্তা সংগঠকের ভূমিকা পালন করছে এবং সে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি গ্রহণ করছে। একজন উদ্যোক্তা একজন অর্থনৈতিক নেতা হিসেবে কাজ করে। কারণ সে নতুন দ্রব্য, নতুন প্রযুক্তি, যোগানের নতুন উৎস ইত্যাদির সুযোগ গ্রহণ করছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা, শ্রমশক্তি ইত্যাদি এক জায়গায় জড় করছে এবং তাদের সংগঠিত করছে। অনুন্নত দেশে উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। অনুন্নত দেশের বাজারের আকার ছোট, মূলধন ঘাটতি, প্রযুক্তিগত

অভাব, কাঁচামালের অভাব, অবকাঠামোগত অসুবিধা ইত্যাদি ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় বলে সেখানে উদ্যোক্তার অভাব তীব্র।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি :

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রযুক্তিগত প্রবৃদ্ধি কিছু নতুন গবেষণা বা আবিষ্কারের কৌশলের ফলাফলের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রযুক্তির উন্নতি শ্রমিক, মূলধন এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

প্রযুক্তির উন্নয়নের পাঁচটি উপাদান রয়েছে –

১. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (Scientific discovery)
২. আবিষ্কার (Invention)
৩. নতুন আবিষ্কার (Innovation)
৪. উন্নতি (Improvement)
৫. উন্নতির সহায়ক হিসেবে আবিষ্কারের বিস্তৃতি।

এর মধ্যে প্রবৃদ্ধির জন্য নতুন আবিষ্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উপাদান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এই পাঁচটি উপাদান সহায়তা করে। অনুন্নত দেশগুলোর তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিদেশ হতে আধুনিক প্রযুক্তি আমদানী করা উচিত। কারণ তাদের নিজেদের আবিষ্কার করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না। তবে তাদের প্রযুক্তি আমদানী করার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী দক্ষতাও বাড়াতে হবে।

শ্রমের বিভাজন ও উৎপাদনের মাত্রা :

বিশেষায়ন এবং শ্রমের বিভাজন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। ইহা অর্থনীতিকে বৃহদায়তন উৎপাদনে চালিত করে যা পরবর্তীতে শিল্পোন্নতিতে সহায়তা করে। ইহা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করে। শ্রমের বিভাজন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে প্রত্যেক শ্রমিকেরই পূর্বের চেয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যা তার সময় বাঁচায়। এতে শ্রমিক নতুন মেশিন এবং উৎপাদনের উপায় আবিষ্কারে সক্ষম হয়। শ্রমের বিভাজন বাজারের আকারের উপর নির্ভর করে। আবার বাজারের আকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

যখন উৎপাদনের মাত্রা বেশি হয় হয় তখন বিশেষায়ন এবং শ্রমের বিভাজন বেশি হয়। ফলস্বরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিসম্পন্ন হয়।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে পরিবহন খরচ কমে যায় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত সাধিত হয়।

কাঠামোগত পরিবর্তন :

কাঠামোগত পরিবর্তন হল দেশের সনাতন পদ্ধতির কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে স্থানান্তরিত হওয়া। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে দেশে চাকরির ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের নতুন ধরনের ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়। আর এগুলোই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

অনুশীলন :

অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে

করেন। পদক্ষেপগুলো তালিকাবদ্ধ করুন।

অ-অর্থনৈতিক উপাদান :

অ-অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উপাদানের পাশাপাশি প্রভাবিত করে। সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি উপাদানসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে এগুলো কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবার আসুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাক –

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্তসমূহ

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। দেশ ও সময়ভেদে এ শর্তগুলির বিভিন্নতা থাকলেও উন্নয়নের পিছনে শর্তগুলি সব দেশেই প্রযোজ্য। নিম্নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান শর্তসমূহ আলোচনা করা হল –

প্রাকৃতিক সম্পদ :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভূমির উর্বরতা, নদ-নদী, অনূকূল আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত, বনজ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা তত বেশি।

দক্ষ জনশক্তি :

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেবল প্রাকৃতিক সম্পদই যথেষ্ট নয়। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য জনশক্তির দক্ষতা ও গুণগতমান বিশেষভাবে দরকার। দক্ষ জনশক্তির দ্বারা শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়, প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

মূলধন গঠন :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধনের ভূমিকা অপরিহার্য। মূলধন উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি এবং উন্নত কলাকৌশলের সুযোগ সৃষ্টি করে। মূলধন গঠনের হার বেশি হলে বৃহদায়তন উৎপাদন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। যে দেশে মূলধন গঠনের হার যত বেশি সে দেশ তত দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে।

শ্রম বিভাগ ও বিশেষীকরণ :

শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার আবার শ্রমবিভাগ, বিশেষীকরণ ও উৎপাদনের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো :

অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই দরকার শক্তিশালী অবকাঠামো। উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, শক্তি সম্পদের উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার সম্প্রসারণ প্রভৃতির ফলে সমাজের শ্রমবিভাগ বৃদ্ধি পায়। শ্রমের গতিশীলতার পথে অন্তরায়গুলি দূর হয় এবং উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়।

মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা বেশি হলে উৎপাদনের উপাদান ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পায়।

উন্নত প্রযুক্তি :

আধুনিক বিশ্বে নিত্য নতুন কলাকৌশল আবিস্কৃত হচ্ছে এবং প্রযুক্তির উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সেই নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান অনেক বৃদ্ধি পায়। আর উৎপাদনের উপরই উন্নয়ন নির্ভরশীল।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান গতি রোধ না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাত্রা শুরু করা দুঃসাধ্য। এজন্য জনসংখ্যা ও জনশক্তির আয়তন দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

উন্নত কারিগরী জ্ঞান :

উন্নত কারিগরী জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কারে ব্রতী হবে। এতে মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত কারিগরী জ্ঞান আবশ্যক।

উদ্যোক্তা :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ উদ্যোক্তাশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা অভিজ্ঞতার আলোকে উৎপাদন কার্য পরিচালনার মাধ্যমে দ্রব্যের উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষা বিস্তার :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। একটি দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া উন্নয়ন চিন্তা করা যায় না। জনগণের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসার না ঘটলে জনশক্তি দেশের কোন কাজে আসে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটানো আবশ্যক।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার :

প্রতিযোগিতামূলক বাজার থাকলে উদ্যোক্তারা দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করে যা দ্রব্যের বাজার বিস্তৃতিতে সহায়তা করে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। আর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত না হলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হতে পারে না।

সামাজিক মূল্যবোধ :

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের দ্বারা জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অদৃষ্টবাদিতা, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলো দূরীভূত হয়ে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয় এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের পথ সুগম করে।

অনুশীলন :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরও পাঁচটি পূর্ব শর্ত উল্লেখ করুন।

এবার আমরা দেখি উপরের আলোচনার পূর্বশর্তগুলি বাংলাদেশে কতটুকু বিদ্যমান –
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নত দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তগুলি বাংলাদেশে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান নয়। তবে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল, বনজ সম্পদ, মৎস্য ও শক্তিসম্পদ রয়েছে। তাছাড়া আমাদের জমি কৃষি কাজের জন্য খুবই উপযোগী। এরপরও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা খুব একটা সফল নয়।
এবার আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্তগুলো বাংলাদেশে কতটুকু বিদ্যমান সে বিষয়ে আলোচনা করব –

১. বাংলাদেশের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষির উপযোগী আবহাওয়া থাকলেও জনসংখ্যার তুলনায় জমির সংখ্যা অপ্রতুল। এছাড়া তেল, কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের অভাবে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। এছাড়া দেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। শিক্ষার অভাবে জনসংখ্যার গুণগত মানও অত্যন্ত নীচু। দক্ষ জনসংখ্যা ও শিক্ষার অভাবে দেশ উন্নতির কাঙ্ক্ষিত সীমায় পৌঁছতে পারছে না।

৩. বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে জনগণের সঞ্চয় কম এবং সর্বোপরি তারা প্রয়োজনীয় মূলধন গঠনে অক্ষম। আবার দেশের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় রপ্তানি আয় অনেক কম। তাই এদেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৪. বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত। এই অনুন্নতির ফলে দেশে শ্রমবিভাগ এবং বিশেষীকরণের মাত্রা অনেক কম। উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারে অদক্ষতা, বাজার ব্যবস্থার অপূর্ণতা, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলোও এদেশে উন্নয়নের গতিকে রোধ করে রেখেছে।

৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শক্তি সম্পদের স্বল্পতা, শিক্ষার অভাব, অনুন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য এদেশের উন্নয়নের গতি শ্লথ।

৬. বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এজন্য দেশে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব ঘটে না। তাই উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এবং কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দেশ পৌঁছতে পারছে না।

৭. বাংলাদেশের আয় ও সম্পদের বন্টন সুষম নয়। ফলে বিনিয়োগ ব্যবস্থা যথাযথভাবে সংঘটিত হয় না।

৮. শিক্ষার অভাবে এদেশের সমাজে কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি বিদ্যমান। এছাড়া আরও কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা রয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা স্বরূপ।

৯. বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ও ঝুঁকি গ্রহণকারী উদ্যোক্তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। ফলে শিল্পোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

১০. বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এমনকি দেশ পিছনে চলে যাচ্ছে।

১১. তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূলে নয়।

উপরের আলোচনায় অনেক সমস্যা বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেশ কিছু উপাদানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বলা যায় যে, এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এদেশে রয়েছে বিপুল জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনার সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

অনুশীলন :
বাংলাদেশ কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ? সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু উত্তোলন ও ব্যবহার হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?

আমাদের এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের বাধাসমূহ।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ :
বাংলাদেশ একটি অনুন্নত কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাসমূহ উন্নয়নের পূর্ব শর্তগুলোর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। চলুন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান বাধাসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করি –

দারিদ্রের দুষ্টচক্র :
বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের বেশিরভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্রের জন্য একটি অনুন্নত দেশ অনুন্নতই থেকে যায়। বাংলাদেশে দারিদ্রতার জন্য জনগণের আয়স্তর নীচু। এজন্য দেশে সঞ্চয়ের হার কম। আবার সঞ্চয় কম বলে মূলধন গঠনের হারও কম। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ এবং মাথাপিছু উৎপাদনও কম। আবার মাথাপিছু উৎপাদন কম বলে আয়স্তরও কম। এভাবেই দেখা যায় বাংলাদেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ :
বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই উঁচু। দেশের আয়তন ও প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক এই অত্যধিক জনসংখ্যা দেশের জমি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে দেখা দেয় মাথাপিছু উৎপাদন ও আয়ের নিম্নহার, সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের নিম্নহার, বেকারত্ব এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা। এগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :
বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু অন্যান্য অনুন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক বেশি। তবে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তা ব্যবহার করার দিকটি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নত কলাকৌশলের অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, সঠিক বিনিয়োগের অভাব এবং সর্বোপরি কার্যকর পরিকল্পনার অভাবে পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে দেশ শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হতে পারছে না এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব :

অবকাঠামো, বিনিয়োগ, জ্ঞান ইত্যাদিসহ আরও অনেক কারণে উন্নত দেশের সকল প্রযুক্তি একটি অনুন্নত দেশে প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্ভব নয়। এজন্য অনুন্নত দেশে এমন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যাতে অধিক শ্রম, অল্প মূলধন এবং অদক্ষ সংগঠক স্থান পায়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রযুক্তির মান এখনও অনেক নীচু যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে মন্থর করে রাখছে।

দক্ষ জনশক্তির অভাব :

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশ যদিও একটি জনবহুল দেশ কিন্তু এদেশে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব তীব্র। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান নিম্ন, দারিদ্র্যতা, অপুষ্টি, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগতমান অত্যন্ত নিম্ন। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তির অভাবে সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

মূলধন গঠনের নিম্নহার :

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র। তাছাড়া দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কারণে দেশের আয়স্তর নিম্ন। এজন্য সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হারও নিম্ন। তাছাড়া দেশের আমদানির চেয়ে রপ্তানি কম। তাই দেশের মূলধন গঠনের হার খুবই নিম্ন যা উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত হতে বাধা দেয়।

উদ্যোক্তার অভাব :

দেশকে উন্নয়নের স্রোতে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে প্রয়োজন দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তার। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কোন দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা আহরণ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থায় দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে ঝুঁকি বহন করার মত সাহসী উদ্যোক্তার সংখ্যা দেশে খুব কম।

কারিগরী জ্ঞানের অভাব :

উন্নয়নের ধাপে ধাপে কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পর্যাপ্ত কারিগরী জ্ঞান ছাড়া উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং তার যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ পর্যাপ্ত কারিগরী জ্ঞানের অভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে পিছিয়ে আছে।

অবকাঠামোর অভাব :

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন। বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত, শক্তি সম্পদের ঘাটতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব তীব্র। এজন্য এদেশে উৎপাদনের উপকরণের গতিশীলতা, উৎপাদনশীলতা কম এবং বাজার সীমিত। তাই দেশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে।

শিক্ষার অভাব :

শিক্ষার অভাব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। একটি দেশের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার অভাব থাকলে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটলে দেশের উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে যায়। বাংলাদেশের জনগণের পথও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা :

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা পশ্চাৎপদ ও গতিহীন। বাংলাদেশের কৃষি আজও প্রাচীন পদ্ধতিতে

পরিচালিত হয় যার ফলে কৃষি ফলন কম হচ্ছে। এজন্য দেশের বৃহত্তম খাত কৃষি থেকে কোন উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা যাচ্ছে না যা মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। ফলে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে না।

বৈদেশিক মুদ্রার অভাব :
দেশকে অগ্রসর করতে হলে প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দ্রুত শিল্পায়ন। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্য শক্তিশালী না হওয়ায় দেশে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব রয়েছে। তাই বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে দেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

খাদ্য ঘাটতি :
বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। এজন্য প্রতি বৎসর দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হয় বলে দেশের উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ কম থাকে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রতিকূল ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ :
বাংলাদেশে শিক্ষার নিম্নহারের জন্য সমাজে অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি বিরাজমান। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন দেশের উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :
একটি দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে দরকার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্থিতিশীলতা। কিন্তু বাংলাদেশসহ অন্যান্য অনুন্নত দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র বিরাজ না করায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্য দীর্ঘমেয়াদী কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। ফলে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থবিরতা দেখা দেয়।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান পাঁচটি বাধা চিহ্নিত করুন।

এবার আসুন দেখা যাক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের বাধাসমূহ দূর করার উপায়গুলো –

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাগুলি দূর করার উপায় :

মূলধন গঠন :

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গার অন্যতম প্রধান উপায় হল দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা। আবার দেশকে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হতে হলে দরকার পর্যাপ্ত মূলধন। তাই ভোগের পরিমাণ কমিয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা যায়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি যা দেশের জন্য নানা সমস্যা বয়ে আনছে। দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়ার জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। উন্নয়নের হারের চেয়ে যাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তা সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে পারলে জনগণের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত গতি লাভ করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার :

যথাযথ উৎপাদন কৌশল ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের পর্যাপ্ত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দেশে নতুন খনিজ সম্পদের আবিষ্কার ও তা সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রযুক্তির উন্নয়ন :

উন্নত দেশের মূলধন-নির্ভর প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ অনুন্নত দেশে সম্ভব নয়। আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈদেশিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য অনুন্নত দেশের শ্রম আধিক্য ও মূলধন স্বল্পতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার বিস্তার :

দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। আবার বাংলাদেশে উন্নয়নমুখী সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে ব্যাপক হারে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষারও প্রসার ঘটাতে হবে। এতে শ্রমিকেরা নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও উদ্ভাবনে সক্ষম এবং দক্ষ হয়ে উঠবে যা উন্নয়ন কাজকে গতিসম্পন্ন করবে।

খাদ্যে স্বয়ংস্পূর্ণতা অর্জন :

বাংলাদেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করতে হয়। এজন্য বিদেশ হতে খাদ্য আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। ফলে অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের জন্য মূলধন কমে যায়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বৈদেশিক মুদ্রা শিল্প মূলধন হিসেবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি :

বাংলাদেশ কারিগরী বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে হবে। এতে দেশে দক্ষ জনশক্তির সৃষ্টি হবে এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি :

দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তা শ্রেণী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ :
দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং দেশের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হবে।

উন্নত অবকাঠামো সৃষ্টি :
দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শক্তি সম্পদের ঘাটতি পূরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ করতে হবে। এতে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রব্যের বাজারের সম্প্রসারণ ঘটবে।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন :
দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বিদেশী সাহায্যে ও কারিগরী নির্ভর পরিকল্পনা পরিহার করে দেশীয় প্রযুক্তি ও সম্পদ নির্ভর সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর বলে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

দক্ষ প্রশাসন :
অদক্ষ প্রশাসন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অবহেলা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি কারণে অনেক সময় দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয় এমনকি অনেক সময় উদ্যোক্তা বিনিয়োগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অথচ বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।

রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং স্থিতিশীলতা :
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সকল রাজনৈতিক দলের গঠনমূলক ও অনুকূল মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। তাই দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকা জরুরী।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য আরও পাঁচটি পদক্ষেপের কথা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।
২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ বাংলাদেশ কতটুকু বিদ্যমান আছে বলে মনে হয়?
৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন।
৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য কোন্ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১. আধুনিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির উপাদান নয় কোনটি?
ক. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার খ. নতুন আবিষ্কার
গ. উন্নতি ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত নয় কোনটি?
ক. মূলধন গঠন খ. মুনাফা অর্জন
গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঘ. প্রতিযোগিতামূলক বাজার

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা নয় কোনটি?
ক. মূলধন গঠনের নিম্নহার খ. নির্দিষ্ট জমির সুষ্ঠু ব্যবহার
গ. দক্ষ জনশক্তির অভাব ঘ. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা

৪. কি কারণে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হয়?
ক. অদক্ষ প্রশাসন খ. দীর্ঘ সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
গ. সুষ্ঠু বিনিয়োগ ঘ. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

৫. কোনটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে না?
ক. অশিক্ষা খ. কুসংস্কার
গ. ধর্মান্ধতা ঘ. কম সঞ্চয়

পাঠ - ২ : বাংলাদেশের অর্থনীতি : উন্নত, অনুন্নত নাকি উন্নয়নশীল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ কি বলতে পারবেন।
- উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশ কোন ধরনের দেশ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আসুন আমরা বিশ্বের অবস্থা নিয়ে একটি চিন্তা করি। প্রথমেই আসা যাক উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর অবস্থা পর্যালোচনায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা আমরা সবাই কম বেশী জানি। আমরা জানি সেখানকার জনগণ আর্থিকভাবে খুবই স্বচ্ছল। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত, তাদের শিক্ষার হার প্রায় ১০০ ভাগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধা সঠিকভাবে পাচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্যে তারা আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এক কথায়, আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা সুসংহত এবং দেশ জনগণের সুবিধার দিকে পূর্ণ সজাগ। এবার আসুন আফ্রিকার দিকে তাকাই। দেখা যাক ইথিওপিয়ার অবস্থা। সেখানকার জনগণ দরিদ্র, অপুষ্টির শিকার, আয় কম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ইত্যাদি। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে দু'টো দেশের তুলনামূলক অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা ইথিওপিয়ার চেয়ে অনেক ভাল। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল উন্নত রাষ্ট্র এবং ইথিওপিয়া হল অনুন্নত রাষ্ট্র। তাহলে চলুন এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যাক্।

অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রা এবং স্তরের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে –

ক. উন্নত দেশ

খ. অনুন্নত দেশ এবং

গ. উন্নয়নশীল দেশ।

এবার চলুন দেশগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহকে আরও পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা যাক্।

উন্নত দেশ :

উন্নত দেশ বলতে সাধারণতঃ সে সকল দেশকেই বুঝায় যে সকল দেশ আধুনিক উৎপাদনের কলা-কৌশল ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসহ মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে মাথাপিছু আয়ের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটিয়ে উচ্চ মানের জীবনযাত্রা জনগণের জন্য আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব দেশসমূহে জাতীয় আয় অনেক বেশি তাই মাথাপিছু আয়ও বেশি। ফলে জনগণের সঞ্চয়ের হার বেশি। এজন্য মূলধন গঠনের হারও বেশি। এজন্য বিনিয়োগের হারও বেশি। এ সকল দেশের জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন হয় বলে জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু। উন্নত দেশসমূহে আধুনিক ও উন্নততর বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ব্যবহৃত হয় বলে উৎপাদনের খরচ কম হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি খাতগুলি উন্নত এবং জনগণের চাহিদা পূরণে সক্ষম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমাজের সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দেশে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে বলে বেকারত্বের হার নগণ্য। কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হলেও এসব দেশসমূহ মূলতঃ শিল্প প্রধান। বাণিজ্যিক ভারসাম্য এসব দেশের অনুকূলে থাকে। শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব দেশ অনেক অগ্রগামী। বিশ্বের উন্নত

দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, কানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য।

অনুন্ননত দেশ :

যে সব দেশে প্রকৃতপক্ষে কোন অর্থনৈতিক উৎপাদন হয়নি, স্বল্প উৎপাদনের জন্য জনগণের মাথাপিছু আয় কম এবং জীবনযাত্রার মান নীচু, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ, জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ হয় না সে সকল দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। এ সকল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয় না এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। এখানকার অধিকাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে ফলে অনুন্নত দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কম। তাই এখানে সঞ্চয়ের হার কম এবং মূলধন গঠনের হারও অনেক কম। এজন্য এসব দেশে বিনিয়োগও অনেক কম। তাই বলা যায়, অনুন্নত দেশ 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের' আবর্তে আবর্তিত। অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। এ সকল দেশে উৎপাদন ক্ষেত্রের স্বল্পতার জন্য বেকারত্বের হার অনেক বেশি। অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। শিল্পে অনুন্নয়ন, স্বল্প উৎপাদনশীলতা, পুঁজি ও মূলধনের স্বল্পতা, অনুন্নত অবকাঠামো, নিরক্ষরতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুন্নত দেশে বিরাজমান।

উন্নয়নশীল দেশ :

যে সকল দেশ বিভিন্ন উন্নয়ন কৌশল এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে এবং কিছুটা উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। এ সকল দেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধান করে। উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক ভিত্তি রচিত হয় এবং দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনীতি ক্রমশঃ উন্নয়নের পথে ধাবিত হয়। এ সকল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদনমূলক কাজের গতি বৃদ্ধিতে উৎসাহবোধ করে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ দক্ষিণ এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক দেশ উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে অনুন্নত দেশ শব্দটি আর ব্যবহৃত হয় না। কারণ অনুন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই। তাছাড়া সকল দেশই উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আলাদাভাবে চিনতে শিখলাম। এখন আসুন এ সকল দেশগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে জানা যাক্ –

উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য :

বিশ্বের সকল উন্নত দেশের উন্নয়নের স্তর সমান নয়। কোন দেশ একটু বেশি উন্নত আবার কোন দেশ একটু কম উন্নত। এদের উন্নয়নের স্তর সমান না হলেও সকল দেশের কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হল –

উচ্চ মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান :

উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ়। তাদের উৎপাদনের হার অনেক বেশি বলে জাতীয় আয়ও বেশি। তাই তাদের মাথাপিছু আয়ও অনেক বেশি। বিশ্বের প্রধান কয়েকটি উন্নত দেশের মাথাপিছু আয় ৮ হাজার থেকে ২০ হাজার মার্কিন ডলার। আয়ের আধিক্যের কারণে এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু।

মূলধনের প্রাচুর্যতা :

উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি হওয়ায় তাদের সঞ্চয়ের হার অনেক বেশি। এজন্য মূলধন গঠনের হারও অনেক বেশি। অধিক মূলধন গঠন বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং অধিক বিনিয়োগ অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে।

শিল্পের উন্নয়ন :
উন্নত দেশসমূহ প্রধানতঃ শিল্প নির্ভর। এ সকল দেশের উন্নতি ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন থেকে উদ্ভুত। শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নয়ন এ সকল দেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। উন্নত দেশের অর্থনীতি শিল্প প্রধান হওয়ায় জাতীয় আয় ও রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই শিল্প খাত থেকে আসে।

উন্নত ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা :
উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি শিল্প প্রধান হলেও কৃষি খাতে তারা পিছিয়ে নেই। তাদের অর্থনীতিতে যদিও কৃষিখাতের প্রাধান্য নেই তবুও কৃষি ব্যবস্থা অনেক উন্নত। কৃষি খাতে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিজ ফলন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা তাদের অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করছে।

সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার :
উন্নত দেশসমূহ প্রধানতঃ আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা তাদের দিন দিন বেড়েই চলছে। প্রযুক্তির উন্নত মানের জন্য তারা তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের বেকারত্বের হার কমিয়ে ফেলে এবং উন্নয়নকে আরও গতিশীল করে।

জনসংখ্যার কাম্য আয়তন :
বিশ্বের সকল উন্নত দেশের জনসংখ্যার আয়তন সমান নয়। সকল দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও সমান নয়। কিন্তু এ সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অপেক্ষা জনসংখ্যার আয়তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম থাকে। ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। এ সকল দেশে শিক্ষার উচ্চহার, জনগণের সচেতনতা ও উন্নত জীবনযাত্রার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম।

দক্ষ জনশক্তি :
উন্নত দেশসমূহের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল দক্ষ জনশক্তি। এ সকল দেশে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি জ্ঞানের সুবিধা পর্যাপ্ত থাকায় জনগণের দক্ষতা অনেক বেশি। এজন্য শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনের হারও অনেক বেশি।

উন্নত অবকাঠামো :
যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নত দেশসমূহে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা অনেক উন্নত। এ সকল অবকাঠামোগত সুবিধার জন্য উন্নত দেশসমূহে শ্রমের গতিশীলতা বেশি, উৎপাদন ব্যয় কম, বাজারের আয়তন বৃহৎ। ফলে উৎপাদনের হারও বেশি।

অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য :
একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার অন্যতম পূর্বশর্ত হল বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের অনুকূলে থাকা। উন্নত দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্য সবসময়ই তাদের অনুকূলে থাকে। এ সকল দেশের আমদানী ব্যয় থেকে রপ্তানি আয় সবসময়ই বেশি এবং রপ্তানি বাণিজ্য বিকেন্দ্রীকৃত ও মূলতঃ শিল্প নির্ভর। তাই তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে সবসময়ই উদ্বৃত্ত ভোগ করে যা তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিশ্চিত করে।

শিক্ষার হার :

শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না বলে উন্নত দেশসমূহ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার উপর। তাদের শিক্ষা খাতে বেশি বিনিয়োগের ফলে শিক্ষা সুবিধা ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছে এবং শিক্ষার হার প্রায় ১০০ ভাগ। শিল্প নির্ভর বলে উন্নত দেশসমূহ কারিগরী শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। উন্নত দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে সমাজ থেকে অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে।

কম বেকারত্ব :

উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার হার অনেক উচ্চ এবং তাদের রয়েছে দক্ষ জনগোষ্ঠী। এছাড়া এখানে উৎপাদন ক্ষেত্র ব্যাপক হওয়ায় বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন।

দক্ষ উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি :

শিল্পায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তার উপস্থিতি। অনুন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান নাই। আবার পুঁজির আধিক্যের কারণে অনুন্নত দেশসমূহে উদ্যোক্তার সংখ্যা অনেক কম।

অনুকূল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ :

উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার কুসংস্কার, গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি বিরাজ করে। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে বিজ্ঞান ও উৎপাদনবিমুখী।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকলে উন্নয়ন সম্ভব হয় না। উন্নত দেশসমূহে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন হয়। কিন্তু অনুন্নত দেশসমূহে তা সম্ভব হয় না।

অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ :

উন্নত দেশসমূহের শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। ফলে এসব দেশে সব সময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান। তাই এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হয়।

অনুশীলনী :
বিশ্বের পাঁচটি উন্নত দেশের কথা চিন্তা করুন। তাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ও কারণ উল্লেখ করুন।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য :

বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক্ –

স্বল্প মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান :

অনুন্নত দেশসমূহের অধিকাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। এসব দেশ মূলতঃ কৃষি নির্ভর হলেও কৃষিজ উৎপাদনের হার খুবই কম। শিল্পে পশ্চাৎপদের জন্য শিল্প উৎপাদন উল্লেখ করার মত নয়। তাই এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় খুব কম। নিম্ন আয়ের জন্য তারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে না বলে এখানে জীবনযাত্রার মানও খুব নিম্ন।

প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :

অনুন্নত দেশগুলো প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এ জন্য অনেক দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তাদের নিকট নেই। আবার, অর্থাভাবে তা বিদেশ থেকে আনতেও পারে না। ফলে এসব দেশ দরিদ্রই থেকে যায়।

পুঁজির স্বল্পতা :
দারিদ্র্যের ও কম উৎপাদনশীলতার কারণে অনুন্নত দেশের মাথাপিছু আয় কম। তাই তাদের সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের হারও অনেক কম। এজন্য দেশে বিনিয়োগের হার খুব কম।

জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি :
অনুন্নত দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারের চেয়ে বেশি হারে। অধিক জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাপক বেকারত্ব :
জনসংখ্যার আধিক্য, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব ইত্যাদি কারণে অনুন্নত দেশসমূহে বেকারত্বের হার খুবই বেশি। অনুন্নত দেশগুলোতে দুই ধরনের বেকারত্ব বিরাজমান। এক ধরনের বেকারত্বে সৃষ্টি হয় শিক্ষা এবং নগরায়নের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ার কারণে। এদেরকে শিক্ষিত বেকার বলা হয়। কারণ দেশে তাদের শিক্ষার উপযোগী কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে তারা বেকার থেকে যায়। আর এক ধরনের বেকারত্ব আছে যা হল বাধ্যতামূলক বেকারত্ব। এ ধরনের বেকারত্বে জনগণ যে কোন ধরনের কাজ চায় কিন্তু তাদের জন্য কোন কাজ থাকে না। অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে এ ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়।

দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব :
অনুন্নত দেশগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব। এ সকল দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বিনিয়োগের জন্য উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসেনা। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনা। বাজারের ক্ষুদ্র আয়তন, পুঁজির স্বল্পতা, ব্যক্তিগত সম্পদের অভাব, চুক্তির স্বাধীনতার অভাব, প্রতিকূল বিনিয়োগ পরিবেশ ইত্যাদির কারণে অনুন্নত দেশে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হয় না। তাই অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে গতি আসে না।

শিল্পের অনুন্নতি :
অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর। তাই এসব দেশে শিল্পের গুরুত্ব অনেক কম। আবার, এসব শিল্পই পুঁজি এবং প্রযুক্তির অভাবে অগ্রসর হতে পারেনা। এসব দেশের জাতীয় আয়ের মাত্র ৮ থেকে ১০ ভাগ শিল্প থেকে আসে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপর্যাপ্ত।

কৃষি নির্ভর অর্থনীতি :
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর। এ সকল দেশের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক গ্রামাঞ্চলে থাকে এবং তাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। কৃষির উপর অধিক নির্ভরশীলতা দারিদ্র্যের লক্ষণ। অনুন্নত দেশগুলি কৃষি নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও তাদের কৃষি ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ আদিম ও বর্তমানে বাতিলকৃত পদ্ধতি দ্বারা। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এসব দেশে নেই। তাই কৃষিজ উৎপাদনের হারও অনেক নিম্ন। আবার কৃষি ব্যবস্থা প্রকৃতি নির্ভর

হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ উৎপাদনও ব্যাহত হয়। ফলে দেশের অর্থনীতি ক্রমশঃ নিম্নমুখী হতে থাকে।

কারিগরী জ্ঞানের অভাব :
অনুন্নত দেশের জনগোষ্ঠী মধ্যে দেশের শিক্ষা কাঠামো আধুনিক ও যুযোগযোগী নয়। ফলে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরী জ্ঞানের অভাবে দেশে কারিগরী জ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব থাকে। এতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয় না।

অনুন্নত কাঠামো :
যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক উপাদান হচ্ছে উন্নত অবকাঠামো। অনুন্নত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার অবকাঠামোই অনুন্নত। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা খুবই কম। এতে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না এবং নতুন কোন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনা। দ্রব্যের বাজারের বিস্তৃতি, শ্রমের গতিশীলতা, উৎপাদনের উচ্চ হার ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন আবশ্যক।

শিক্ষার অভাব :
অনুন্নত দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কম হওয়ায় শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা খুবই কম থাকে। এতে দেশে নিরক্ষরতার হার বেশি থাকে তা দক্ষ জনশক্তি গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূলতা :
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর বলে তারা সাধারণতঃ কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। আবার শিল্পায়নের জন্য তারা শিল্পদ্রব্য আমদানী করে থাকে, তাই তাদের রপ্তানি আয় থেকে আমদানি ব্যয় বেশি। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়।

বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর :
অনুন্নত দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের স্বল্পতা থাকে। তাই তারা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে। এজন্য তাদের বাজেট হয় বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর।

প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ :
অনুন্নত দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। এতে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :
অনুন্নত দেশের অধিকাংশ লোক থাকে অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক অসচেতন। এজন্য এসব দেশে সুষ্ঠু সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের অভাব দেখা দেয়। ফলে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ না করলে বিনিয়োগ, উৎপাদন কার্যক্রম ইত্যাদি ব্যাহত হয় এবং কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব :
একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে পরিকল্পনা গ্রহণের উপর। অনুন্নত দেশসমূহে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গৃহীত হয় না বলে তারা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি আনতে পারেনা।

অনুশীলন :

বিশ্বের পাঁচটি অনুন্নত দেশের কথা ভাবুন। আপনার দৃষ্টিতে কেন তারা অনুন্নত।

উন্নয়নশীল দেশ :

বর্তমান বিশ্বে যদিও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ দু'টো সমার্থক এরপরও উন্নয়নশীল দেশের আলাদা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এবার চলুন বৈশিষ্ট্যগুলো জানা যাক –

১. উন্নয়নশীল দেশসমূহের মাথাপিছু আয় কম ও জীবনযাত্রার মান নিম্ন হলেও তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২. এ সকল দেশে কৃষি ও শিল্পে ক্রম উন্নয়নের ধারা লক্ষ করা যায়।
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হচ্ছে।
৪. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকারত্বের হার ক্রমশঃ কমে আসছে।
৫. উন্নয়নশীল দেশসমূহের পুঁজি একটি গোষ্ঠীর হাতে চলে যাচ্ছে ফলে সমাজে বেশ কয়েকটি শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে – পুঁজিপতি, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। এ সকল দেশে চরম গরীব ও উচ্চবিত্ত পাশাপাশি বিদ্যমান।
৬. অনুন্নত দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার হার বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
৭. বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়নের চেষ্টা চলছে।
৮. অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
৯. কারিগরী শিক্ষার উপর জোর দেয়া হচ্ছে।
১০. দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর থেকে শিল্প নির্ভরতার দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে।
১১. পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।
১২. বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

অনুশীলন :
আপনি কি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন?

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ চিনতে পারলাম। এবার আসুন বাংলাদেশ উপরোক্ত কোন বৈশিষ্ট্যে পড়ে তা বের করি –

বাংলাদেশ উন্নত, অনুন্নত নাকি উন্নয়নশীল দেশ?

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র কিন্তু জনবহুল দেশ। এ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। এদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের বেশিরভাগ আসে কৃষি থেকে। দেশের মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল।
২. বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত এবং নিম্ন উৎপাদনশীল। এ দেশের কৃষিকাজ পরিচালিত হয় আদিম পদ্ধতিতে। কৃষি জমির ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা, অবৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি, স্বল্প বিনিয়োগ, কৃষি-উপকরণের অভাব, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।
৩. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান মাত্র ১০ থেকে ১২ ভাগ। আবার শ্রমশক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ শিল্পে নিয়োজিত। সুষ্ঠু শিল্পনীতির অভাব, শিল্প-মূলধনের স্বল্পতা, শ্রমিকের অদক্ষতা, বিনিয়োগের প্রতিকূল পরিবেশ, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে এ দেশের শিল্প খাত সম্প্রসারিত হয়নি।

৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জমি ও অন্যান্য সম্পদের বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি।

৫. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এদেশে কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ কম বলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। তাই দেশে বেকারত্বের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. বাংলাদেশে স্বল্প উপাদান, জনসংখ্যাধিক্য ও বেকারত্বের জন্য মাথাপিছু আয় কম। এজন্য জনগণের জীবনযাত্রার মানও নিম্ন। এদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

৭. বাংলাদেশ পুঁজি ও বিনিয়োগের অভাবে কারিগরী দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্বৃত্ত জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৮. বাংলাদেশে উৎপাদন ও আয়ের স্বল্পতার জন্য সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের হার খুব কম। এজন্য দেশে বিনিয়োগের পরিমাণও কম।

৯. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত।

১০. বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় রপ্তানি আয় অপেক্ষা অনেক বেশি।

১১. বাংলাদেশে শিক্ষার হার খুব কম।

১২. বাংলাদেশে কারিগরী জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার কারণে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে।

১৩. শিক্ষার অভাবে এদেশে প্রচুর ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি রয়েছে।

১৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, অনুন্নত দেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। তাই এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি অনুন্নত দেশ বলা যায়।

কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীনতা পূর্ব ষাটের দশক থেকে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন না হলেও দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। উন্নয়নে ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। সমস্যা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশে শিল্পায়নের দিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এজন্য শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং দেশীয় উদোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও তা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। এতে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। দেশে কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। দেশের অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিরক্ষরতার হার দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অতএব, উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

অনুশীলনী :
বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার হলে আপনি মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

২. উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৩. আপনি কেন একটি দেশকে অনুন্নত দেশ বলবেন?
৪. বাংলাদেশ উন্নত, অনুন্নত না উন্নয়নশীল দেশ যুক্তিসহ বলুন?

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১. উন্নত দেশের অর্থনীতি প্রধানত –
ক. কৃষি নির্ভর খ. শিল্প নির্ভর
গ. বাণিজ্য নির্ভর ঘ. প্রযুক্তি নির্ভর

২. নিম্নের কোনটি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. মাথাপিছু আয় বেশি খ. মূলধন গঠনের হার বেশি
গ. শিক্ষার হার বেশি ঘ. বেকারত্বের হার বেশি

৩. নিম্নের কোনটি অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য?
ক. কৃষি নির্ভর অর্থনীতি খ. দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব
গ. অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য ঘ. শিল্প নির্ভর অর্থনীতি

৪. নিম্নের কোনটি উন্নয়নশীল দেশ?
ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ. জাপান
গ. জার্মানী ঘ. ব্রাজিল

৫. নিম্নের কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য?
ক. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার খ. প্রযুক্তির উৎকর্ষতা
গ. বিনিয়োগ স্বল্পতা ঘ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

সমস্যা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই '৯৭ হাতে নিন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আয়, শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার, শিক্ষার হার, বেকারত্বের হার বের করুন। এ থেকে কি আপনার মনে হয় যে, বাংলাদেশ অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ ৩ : সামাজিক অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অবকাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শক্তি সম্পদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পরিবহন ও যোগাযোগ খাত সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমিকা

আপনি দেশে বসবাসের জন্য এবং আপনার জীবন নির্বাহের জন্য দেশের সড়ক পথ, জলপথ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক, টেলিফোন ইত্যাদি ব্যবহার করছেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সেবা রাষ্ট্রের নিকট থেকে গ্রহণ করছেন।

আপনি জানেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই উপাদানগুলোর অবস্থান থাকা আবশ্যক। একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে চালু রাখার জন্য কতিপয় মৌলিক উপাদান যেমন – বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, ডাক, টেলিফোন, বাঁধ ও সেতু, রাস্তাঘাট, শক্তি সম্পদ ইত্যাদির উপস্থিতি অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে উক্ত উপাদানসমূহ গড়ে তোলা হয় এবং এগুলির উপর ভিত্তি করেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল হয়। উন্নয়নের উপযোগী এসব উপাদানকেই অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলা হয়। এগুলোকে আবার ভৌত অবকাঠামোও বলা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পাশাপাশি কতিপয় সামাজিক উপাদানের উপস্থিতি অপরিহার্য। এসব সামাজিক বিষয়গুলো হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এসব বিষয় সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে প্রভাবিত করে এবং সেভাবেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় বলে এগুলোকে সামাজিক অবকাঠামো বলা হয়।

অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক অবকাঠামো কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি শুধু ভৌত অবকাঠামোকেই বুঝায় না, সামাজিক অবকাঠামোকেও বুঝায়। অতএব, আমরা বলতে পারি যে, ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক অবকাঠামো হল অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দু'টি অংশ। একটি দেশের ভৌত অবকাঠামো দিয়ে উন্নয়ন কার্য পরিচালনা করা যায় না। আবার, সামাজিক অবকাঠামো সুদৃঢ় না হলে ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না।

ভৌত অবকাঠামোর আবার বেশ কয়েকটি খাত আছে –

ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ

খ. শক্তি সম্পদ

গ. পরিবহন

ঘ. যোগাযোগ

সামাজিক অবকাঠামোও আবার নিম্নের খাতগুলোর সমন্বয়ে গঠিত –

ক. শিক্ষা

খ. স্বাস্থ্য

তাহলে আমরা ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম। আসুন তাহলে অবকাঠামোকে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো যাক –

অর্থনৈতিক অবকাঠামো

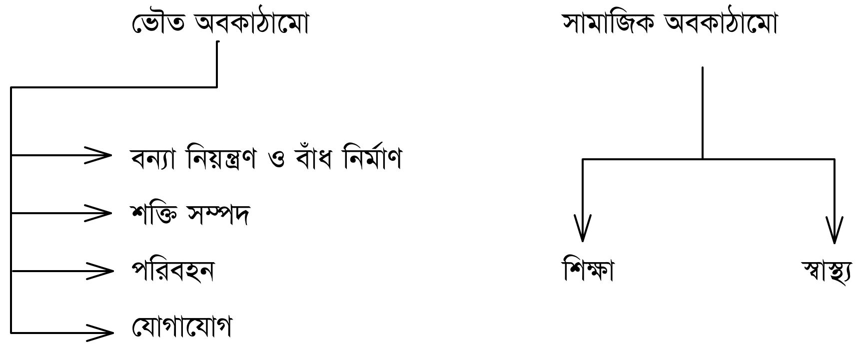

অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থের। ভৌত অবকাঠামোর নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য বিপুল পুঁজি দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে হয়। ফলে এ খাতে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এলাকাবাসী অথবা ব্যক্তিগত খাতও অবকাঠামোর কিছু অংশ সম্পাদন করে।

আবার সামাজিক অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হলে তা ভোক্তার সুবিধার পাশাপাশি সমাজের কল্যাণও বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভোক্তার খরচের সুবিধা কেবল সে-ই ভোগ করবে না। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারকেই সর্বাগ্রে ভূমিকা নিতে হবে। তাছাড়া, শিক্ষা-স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা বলে এখাতে সরকারকে বিনিয়োগ করতে হয় ; অন্ততঃ একটা ন্যূনতম পর্যায় পর্যন্ত। অর্থাৎ আমাদের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, অবকাঠামো নির্মাণে সরকার বা রাষ্ট্রকেই মূল দায়িত্ব নিতে হয়।

এখন আমরা ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ঃ

ভৌত অবকাঠামো :

ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ :

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। সারা দেশ নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে উপচে পড়ে। ফলে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায় এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যা বাংলাদেশে প্রতি বছরের জন্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা যার ফলাফল হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ ফসলহানি, প্রাণহানি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ধ্বংস এবং আরও নানান ক্ষয়ক্ষতি। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের সকল সরকারই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে যদিও বন্যা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় কারণ এটি একটি প্রাকৃতিক সমস্যা। রাজধানী ঢাকা শহরকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য ডিএনডি বাঁধ, চট্টগ্রাম শহরকে রক্ষার জন্য পতেঙ্গা বাঁধ, রাজশাহী শহরকে রক্ষার জন্য পদ্মা নদীতে বাঁধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে জলোচ্ছ্বাস ও ঝড় থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন বাঁধ ও আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

খ. শক্তি সম্পদ :

আমাদের শক্তি সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

১. চিরায়ত যোগান – গোবর, লাকড়ি, পাটকাঠি, খড় ইত্যাদি।

২. বাণিজ্যিক যোগান – বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।

এর মধ্যে ৫৫% আসে চিরায়ত যোগান থেকে, ২৪% প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, ১৯% পেট্রোলিয়াম থেকে এবং বাকী ২% পানি বিদ্যুৎ থেকে।

এবার আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর আলোকপাত করব।

প্রাকৃতিক গ্যাস :

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং শক্তির উৎস। বাংলাদেশে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২২.৮৯৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ১৩.৫৯৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ডিসেম্বর ১৯৯৬ পর্যন্ত উত্তোলনের পরিমাণ ২.৮৫৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং এর পরবর্তী উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ১০.৭৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ পর্যন্ত দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২০টি। মাত্র ৮টি ক্ষেত্রের ৩৬টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে (১৯৯৮ সনের জুন পর্যন্ত হিসাব অনুসারে)। ১৯৯৫-৯৬ সালে গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ২৬৫.৫২ বিলিয়ন ঘনফুট এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৭০ বিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস ব্যবহারের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন খাতে এর চাহিদা ২০০২ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ৩৭৭ বিলিয়ন ঘনফুটে।

নিম্নের ছকে আমরা দেখব খাতওয়ারী প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার –

ছক : প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারী ব্যবহার

বৎসর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	সার	অন্যান্য শিল্প	চা বাগান	সিজোনাল	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	মোট
১৯৯৫-৯৬	২৬৫.৫১৬	১১০.৯০	৯০.৯৮	২৫.৫৮	০.৭৩	০.৯৯৫	২.৯৯৭	২০.৭০৯	২৫২.৮৮৬

গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব কারিগরী দুর্বলতার কারণে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ পর্যন্ত ৮টি ব্লকের জন্য ৬টি উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৫টি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। নিম্নের ছকে আমরা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য চুক্তিগুলো দেখব।

ছক : উৎপাদন বন্টনের ভিত্তিতে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য চুক্তি (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠান	অনুসন্ধান ব্লক	এলাকা
Oriental of Bangladesh Ltd.	ব্লক : ১৩, ১৪	বৃহত্তর সিলেট জেলা
Occidental Explorations of Bangladesh Ltd.	ব্লক : ১২	বৃহত্তর সিলেট জেলা
Cairn Energy and Holland Sea Search JV	ব্লক : ১৫, ১৬	বঙ্গোপসাগর এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা
Rexwood Okland JV	ব্লক : ১৭, ১৮	বঙ্গোপসাগর
United Meridian Corporatin	ব্লক : ২২	বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা

ইতিমধ্যে এ সকল ব্লকে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গোপসাগরে সাঙ্গু-১ কূপে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৯৮ সালের জুন নাগাদ তাদের জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করবে। বিদেশী বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশের একমাত্র পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্স তার অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভোলা জেলায় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সালদা নদীতে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

অক্সিডেন্টাল সিলেট জেলায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে শ্রীমঙ্গলে একটি গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের সময় এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে যা স্থানীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। ঐ ক্ষেত্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গ্যাসক্ষেত্রের সমস্যাসমূহ :

বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে হবে। বর্তমানে যে হারে গ্যাসের ব্যবহার হচ্ছে সে হারে চলতে থাকলে আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ নতুন কোন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলে গ্যাস সম্পদ শেষ হয়ে যাবে।

২. বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্যাসকূপই দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত নদী মেঘনা ও যমুনার কারণে পশ্চিমাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে এই গ্যাস নেয়া সম্ভব হয়নি। তাই সেখানে এখনও এল.পি. গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যমুনা সেতুর উদ্বোধনের ফলে এই সমস্যার সমাধান ঘটবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

৩. আমাদের নিজস্ব কারিগরী ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও আর্থিক বিনিয়োগের দৈন্যতার কারণে গ্যাস উত্তোলন ও অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। ফলে লাভের অধিকাংশ তাদের পকেটে চলে যাচ্ছে।

অনুশীলন :
প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধে কি পরিকল্পনা নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

বিদ্যুৎ শক্তি :

যে কোন দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে বিদ্যুৎ। বাংলাদেশে চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদনের হার অনেক কম। এ কারণে লোডশেডিং আমাদের জীবনে প্রাত্যাহিক ঘটনা। বাংলাদেশের বিদ্যুৎকে উৎসের দিক থেকে দু'টো ভাগে ভাগ করা যায় :

i. জল বিদ্যুৎ ও

ii. তাপ বিদ্যুৎ

তাপ বিদ্যুৎ আবার গ্যাস এবং তরল জ্বালানী ভিত্তিক। ১৯৯৬-৯৭ সালে উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে গ্যাসভিত্তিক উৎপাদন ছিল ৮৭.১%, জলবিদ্যুৎ ৬.৪% এবং তরল জ্বালানী ভিত্তিক উৎপাদন ৬.৫%। এবার ছকের মাধ্যমে বিদ্যুতের উৎপাদন দেখা যাক –

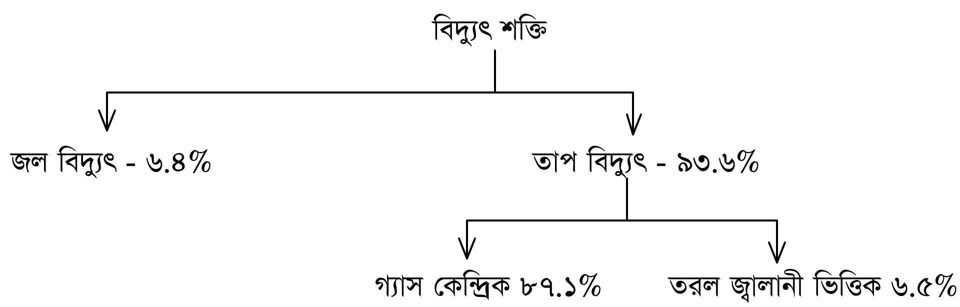

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (PDB), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) এবং ডেসা (DESA) বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে।

জুন, ১৯৯৮ দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৯০৮ মেগাওয়াট। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ধরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির স্বল্পতা, যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য সংরক্ষণ কাজকরণ, কাপ্তাই হ্রদের পানির স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে

১৬০০-১৮০০ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২২০০ মেগাওয়াট এবং বর্তমানে (২০০০ সালে) তা ৩১৫০ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ফলে সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে সরকার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে অতিরিক্ত ৮৫৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এর মধ্যে রাউজান – ২১০ মেগাওয়াট ২য় ইউনিট, ঘোড়াশাল – ২১০ মেগাওয়াট ৬ষ্ঠ ইউনিট, ২১০ মেগাওয়াট সিদ্ধিরগঞ্জ, ৬০ মেগাওয়াট শাহজী বাজার এবং ১০৯ মেগাওয়াট হরিপুর কম্বাইন্ড সাইকেল রয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৬ সালের অক্টোবর হতে "প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশ" নামক বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি গ্রহণ করেছে। এ পলিসির আওতায় বেসরকারী পাওয়ার কোম্পানি ১৫ বৎসরের জন্য কর্পোরেট আয়কর প্রদান থেকে বিরত থাকবে এবং শুল্ক ও ভ্যাট ছাড়াই প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট আমদানী করতে পারবে। জরুরীভিত্তিতে বেসরকারী খাতে প্রতিটি ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুলনা, হরিপুর এবং শিকলবাহায় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে PDB বিদ্যুৎ ক্রয় করবে। এগুলো ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন খাতে বিদ্যুতের ব্যবহারের শতকরা হার নিম্নরূপ :

শিল্প কারখানা	–	৫৬%
বাণিজ্যিক ব্যবহার	–	১০%
গৃহস্থালী	–	২২%
অন্যান্য	–	১২%

বিদ্যুৎখাতের সমস্যা :

১. বাংলাদেশে বিদ্যুৎখাতের অন্যতম বড় সমস্যা সিস্টেম লস। ১৯৯৫-৯৬ সালে সিস্টেম লস ছিল ৩৩.৩% যার আংশিক কারিগরী ও আংশিক মনুষ্য। সিস্টেম লসের মূল কারণগুলি হচ্ছে –

i. অবৈধ সংযোগ

ii. মিটারের কম রিডিং যা কর্মচারীরা করে থাকে

iii. কারিগরী লস যার পরিমাণ ১০ - ১৫%।

২. বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অপর্যাপ্ততা।

৩. পেট্রোলিয়াম কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পানি বিদ্যুৎ বা গ্যাস কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

৪. বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমে গ্যাস উত্তোলন অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলিকেই আপনি যথেষ্ট মনে করেন ? নাকি আপনি আরও কি কি পদক্ষেপ নিতে বলেন?

পরিবহন ও যোগাযোগ :

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক কথায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণের গতিশীলতা বজায় রাখা, দেশব্যাপী স্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য বজায় রাখা, দেশে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কে দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী একটি সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। ১৯৯৫-৯৬ সালে GDP-তে এই খাতের অবদান ছিল ১২.১%।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো যায় –

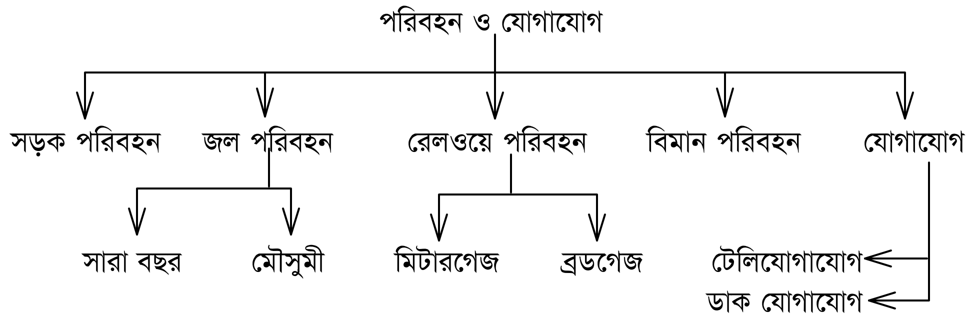

এবার তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব দেখা যাক –

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব :

১. বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য ;
২. কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ;
৩. শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মজুরির তারতম্য ও বেকারত্ব দূর করার জন্য ;
৪. শিল্পের কাঁচামাল সহজে শিল্পে পৌঁছার জন্য ;
৫. কৃষি ও শিল্পপণ্যের বিস্তৃত বাজারের মাধ্যমে পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য ;
৬. দেশের সকল অঞ্চলে দ্রব্য ও সেবার সুষম বন্টনের জন্য ;
৭. প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ;
৮. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য ;
৯. প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সারা দেশে সুষ্ঠু নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ;
১০. দেশের জরুরী অবস্থায় ত্রাণ ও অন্যান্য সাহায্য পাঠিয়ে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরী।

এবার দেখা যাক্ সামাজিক গুরুত্বের দিক –

১. দেশের সর্বত্র শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করার জন্য।
২. গ্রাম ও শহরের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্য।
৩. দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির জন্য।

৪. দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে দেশকে মুক্ত রাখার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার জরুরী।

এতক্ষণ আমরা পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকারভেদ ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা বিভিন্ন খাতগুলোর গুরুত্ব ও বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব –

সড়ক পথ :

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে সড়কপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সাপেক্ষ। এছাড়া অতীতে ঔপনিবেশিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে এদেশে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার স্বাভাবিক উন্নয়ন ও বিস্তৃতি ঘটেনি।

১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে সড়ক পথের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫০০ কি.মি. যার মধ্যে পাকা রাস্তা ছিল ১৯৩০ কি.মি। ১৯৭০ সালে পাকা রাস্তার পরিমাণ ছিল ৩০০০ কি.মি. এবং অন্যান্য রাস্তা ছিল ৭২০০ কি.মি। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এদেশের রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৮৯ সালে দেশের মোট রাস্তার ৫৮.৩৩% ছিল পাকা রাস্তা, ১৬.৬৪% ছিল অর্ধপাকা এবং ২৫.০৩% ছিল কাঁচা রাস্তা। ১৯৯৫ সালে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৬০৭০ কি.মি.। ১৯৮৯ সালে দেশে ব্রীজের সংখ্যা ছিল ৩১৪৪টি এবং ফেরীর সংখ্যা ছিল ১৭০টি। বাংলাদেশে প্রতি ১০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় মাত্র ৭.৪৫ কি.মি. পাকা সড়ক রয়েছে যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর পরিমাণ হল ১৬.৭৬ কি.মি.। দেশে মোট যাত্রী পরিবহণের ৭৫% এবং পণ্য পরিবহণের ৬৫% সড়ক পথে সম্পাদিত হয়। সড়কপথে পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্যের ৯৫% এর বেশি বেসরকারী খাতে সম্পাদিত হয় (১৯৯৮ সনের তথ্য অনুসারে)।

এবারে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনের সমস্যার দিকটি দেখা যাক্ –

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পরিবহন সুবিধার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় এ দেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ও উন্নত নয়। চলুন আমরা সড়ক পথের প্রধান সমস্যাগুলি দেখি –

১. ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশে সড়কপথের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেশি।
২. বাংলাদেশের অধিকাংশ সড়ক পথ অনুন্নত।
৩. বাংলাদেশের সড়কপথসমূহ অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত।
৪. চাহিদার তুলনায় দেশের সড়কপথ অপর্যাপ্ত।
৫. দেশের সড়কপথের অধিকাংশই হচ্ছে কাঁচা যা পরিবহন চলাচলের অনুপযোগী।
৬. বাংলাদেশে আশংকাজনক হারে সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি।

এবার তাহলে সড়ক পথের সমস্যাগুলোর কয়েকটি সমাধান দেয়া যাক্ –

১. সড়ক পথের উন্নয়ন, প্রশস্তকরণ ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার।
২. রাস্তাঘাট পরিকল্পনা অনুযায়ী করা দরকার।
৩. কাঁচা রাস্তাগুলিকে পাকা রাস্তায় রূপান্তরিত করতে হবে।
৪. প্রয়োজনীয় স্থানে সেতু নির্মাণ করতে হবে।
৫. উন্নত সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

অনুশীলন :
আপনি বাংলাদেশের সড়ক পথের পাঁচটি সমস্যা ও সমাধান লিখুন।

জলপথ :
নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন মাধ্যম হল জল পরিবহন ব্যবস্থা। দেশের বিভিন্ন নদীতে নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণের ক্ষেত্রে এখনও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে নৌ-চলাচল উপযোগী নৌ-পথ প্রায় ৬০০০ কি.মি. যা শুষ্ক মৌসুমে হ্রাস পেয়ে প্রায় ৩৮০০ কি.মি. এ দাঁড়ায় (১৯৯৮ সনের হিসাব)।

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন ব্যবস্থায় দুটি সরকারী কর্তৃপক্ষ (B.I.W.T.A) নৌ-বন্দর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নৌ-পথে নাব্যতা বিধান নৌ-চলাচল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, নৌ-যান নিবন্ধীকরণ, ডেক কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিত। B.I.W.T.A-এর অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮টি টার্মিনাল, ১২৭টি লঞ্চঘাট ও ৩১টি ফেরীঘাট রয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (B.I.W.T.C)-এর অধীনে মোট জলযান রয়েছে ২৭৬টি যার মধ্যে ২১২টি বাণিজ্যিক জলযান ও ৬৪টি সহায়ক জলযান। তবে বর্তমানে ১৭৩টি জলযান চলাচলের উপযোগী রয়েছে (১৯৯৮ সনের হিসাব)। বিগত বছরগুলোতে B.I.W.T.C ক্রমাগতভাবে লোকসানের সম্মুখীন হলেও ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় ১.৬৭ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (B.S.C) সমুদ্র পথে নিজস্ব বহরে আমদানী-রপ্তানি পণ্য পরিবহন করে। বর্তমানে B.S.C-এর ১৭টি জাহাজ রয়েছে যার মধ্যে ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার এবং ১৫টি সাধারণ পণ্যবাহী জাহাজ। B.S.C তার নিজস্ব জাহাজ বহরের সাহায্যে দেশীয় আমদানী-রপ্তানী পণ্যের ২৫% পরিবহন করতে সক্ষম।

আসুন আমরা জলপথের সমস্যাবলী দেখি –

১. সংস্কার ও খননের অভাবে বাংলাদেশের জলপথের নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে।
২. চাহিদার তুলনায় জলযানের স্বল্পতা।
৩. আধুনিক জলযানের অভাব।
৪. শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ নাবিকের অভাব।
৫. জলপথে নিরাপত্তার অভাব।
৬. বিনিয়োগ পর্যাপ্ত নয়।
৭. জলযান নির্মাণ ও মেরামতে প্রযুক্তিগত বাধা।
৮. ভাল ঘাট ও জেটির অভাব।
৯. উপযুক্ত সংকেত ব্যবস্থার অভাব।
১০. বেসরকারী নৌ-যানগুলির ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাব।

এখন দেখা যাক — এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে —

১. খননের মাধ্যমে জলপথের সংস্কার।
২. অধিক সংখ্যক জলযান চালু।
৩. নৌ-যানের আধুনিকীকরণ।
৪. প্রয়োজনীয় ঘাট ও জেটি নির্মাণ।
৫. ডক ইয়ার্ড ও শিপইয়ার্ড নির্মাণ।
৬. নাবিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৭. নৌ-চলাচল আইনের যথাযথ প্রয়োগ।
৮. নৌ-পথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৯. নৌ-পথে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
১০. নৌ-পথে আধুনিক সংকেত দান, বিশ্রামাগারও গুদাম নির্মাণ।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের জলপথকে সংস্কারের লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

রেলপথ :

আধুনিক অর্থনীতিতে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন মাধ্যম। বাংলাদেশে দূরবর্তী স্থানে এবং দ্রুতযাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ বিশেষভাবে প্রয়োজন। তবে বর্তমানে সড়ক পথের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহনের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৬২ সালে সর্বপ্রথম এদেশে দর্শনা হতে জগতি পর্যন্ত প্রায় ৩৫ মাইল রেলপথ স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এদেশে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৭০৬.৮৬ কি.মি। এর মধ্যে ৮৫৭.৪৭ কি.মি. ব্রডগেজ, ৮৭৫.৪৭ কি.মি. মিটারগেজ এবং ৩০.৫৮ কি.মি. ন্যারোগেজ।

১৯৭১ সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৮৫৮.১৩ কি.মি. যার মধ্যে ব্রডগেজ ৯২৩.৭৪ কি.মি. এবং মিটার গেজ ১৯৩৪.৩৯ কি.মি। ১৯৯৩-৯৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ২৭০৬.০১ কি.মি. যার মধ্যে ব্রডগেজ ৮৮৩.৫৯ কি.মি. এবং মিটারগেজ ১৮২২.৪২ কি.মি। ১৯৯৫-৯৬ সালে রেলওয়ের ইঞ্জিনের সংখ্যা ছিল ২৮২টি, যাত্রীবাহী গাড়ীর সংখ্যা ১২৭৫টি এবং অন্যান্য গাড়ির সংখ্যা ১৫০টি। ১৯৮৯-৯০ সনে দেশে রেলওয়ে স্টেশনের সংখ্যা ছিল ৫০২টি।

যাত্রী ও পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় রেলওয়ে লাইন এবং গাড়ির সংখ্যা অপ্রতুল। এছাড়া যমুনা নদীর কারণে এতদিন উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের সঙ্গে এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলের রেললাইন ব্রডগেজ এবং অন্যান্য অঞ্চলের লাইন মিটারগেজ। বর্তমানে বাংলাদেশের রেলওয়ের নিজস্ব কারখানায় কিছু বগী নির্মিত হয়। কিন্তু রেলের বেশিরভাগ সাজ-সরঞ্জাম, ইঞ্জিন, কলকব্জা ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে খাত লাভজনক নয়। সরকার প্রচুর টাকা লোকসান দিয়ে রেলওয়েকে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে। এর পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ঢাকা-নারায়নগঞ্জ পথে রেলওয়ে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সনে রেলওয়ে ৩৩৩.২২ কোটি যাত্রী ও ৬৮.৯০ কোটি টন পণ্য সরবরাহ করেছে।

এখন আমরা বাংলাদেশে রেল পরিবহনের সমস্যাগুলি দেখব —

১. বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ০.০৩ মাইল রেলপথ রয়েছে যা দেশের জন্য অপর্যাপ্ত।

২. রেল পরিবহনে যাত্রীরা ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
৩. মান্ধাতা আমলে স্থাপিত রেল লাইন এখন জরাজীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ।
৪. বাংলাদেশের রেলগাড়ী প্রায়ই অকেজো থাকে যার কারণ হলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও নিম্নমান।
৫. প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের অনেক জায়গা নীচু ও মাটি নরম। ফলে নতুন রেল লাইন স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
৬. দক্ষ জনশক্তির অভাব।
৭. রেলওয়ে কর্মচারীদের দুর্নীতি ও যাত্রীগণের বিনা টিকেটে চলাচল করা।

বাংলাদেশের রেলপথের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী –

১. রেলপথের প্রতিস্থাপন, নবায়ন ও পুনর্বাসনের কাজ জরুরী।
২. রেল ইঞ্জিন ও গাড়ী ও মেরামতের জন্য আধুনিক কারখানা স্থাপন ও পুরাতন কারখানার উন্নয়ন সাধন।
৩. রেলের যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।
৪. রেল প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত।
৫. যাত্রী ভাড়া ও মাশুলের হার সঙ্গতিপূর্ণ রাখা।
৬. রেল কর্মীগণের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৭. যাত্রীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৮. রেলওয়েতে দুর্নীতি রোধে সরকারের কঠোর হতে হবে।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের রেলওয়ে খাতকে লাভজনক করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

বিমান পরিবহন :

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য বিমান পরিবহন আবশ্যিক। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বিমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বহরে ৪টি ডিসি ১০-৩০, ২টি এ ৩১০-৩০০ এয়ারবাস, ২টি এফ-২৮ এবং ২টি এটিপি উড়োজাহাজ রয়েছে (১৯৯৮ সনের হিসাব)। বাংলাদেশ বিমান ৮টি অভ্যন্তরীণ ও ২৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যস্থলে বিমান সার্ভিস পরিচালনা করছে। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সঙ্গে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি আন্তর্জাতিক ও ৩টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর রয়েছে। নিম্নের ছকে আমরা বিমান বন্দরগুলোর নাম, অবস্থান এবং প্রকৃতি দেখব –

বিমানবন্দরের নাম	অবস্থান	প্রকৃতি
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	ঢাকা	আন্তর্জাতিক
চট্টগ্রাম বিমানবন্দর	চট্টগ্রাম	আন্তর্জাতিক
কক্সবাজার বিমানবন্দর	কক্সবাজার	অভ্যন্তরীণ
ওসমানি বিমানবন্দর	সিলেট	আন্তর্জাতিক

সৈয়দপুর বিমানবন্দর	সৈয়দপুর	অভ্যন্তরীণ
রাজশাহী বিমানবন্দর	রাজশাহী	অভ্যন্তরীণ
বরিশাল বিমানবন্দর	বরিশাল	অভ্যন্তরীণ
ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর	ঠাকুরগাঁও	অভ্যন্তরীণ
যশোহর বিমানবন্দর	যশোহর	অভ্যন্তরীণ

দেশের অভ্যন্তরে বিমান বহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯৯২ সালে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি হ্যাংগার কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে হ্যাংগার কমপ্লেক্সে ডিসি ১০ - ৩০ উড়োজাহাজ 'সি' চেকসহ বিমান ফ্লীটের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে জিটিসি এপ্রেন্টিস ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট (জিএসই) সংযোজনের মাধ্যমে বিমানের ফ্লাইট হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান ১৯৯৫-৯৬ সনে ২৩.৬৭৪৩ কোটি টাকা নীট মুনাফা করেছে যেখানে ১৯৯২-৯৩ সনে ছিল ৬৭.৯১২৫ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশে দু'টি বেসরকারী বিমান সংস্থা অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান পরিবহন করছে।

এবার বিমান পরিবহনের কিছু সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক –

১. দেশের অভ্যন্তরীণ কয়েকটি বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য নতুন এফ-২৮ বিমানের উপযোগী নয়।
২. কয়েকদিন পূর্বে নির্মিত রানওয়ে নতুন ভারী ও চওড়া বিমানের অতিরিক্ত ওজন বহন করতে না পারায় অনেক জায়গায় ভাঙ্গন দেখা দেয়।
৩. বাংলাদেশ বিমান অনেক সময় কারিগরী ও ব্যবস্থাপনার সমস্যার জন্য সঠিক সময়ে বিমান ছাড়তে পারেনা।
৪. বাংলাদেশ বিমানের যাত্রীসেবার মান নীচু হওয়ায় বিদেশী যাত্রীদের আকর্ষণ করতে পারেনা। এমনকি বাংলাদেশী যাত্রীরাও অন্যান্য বিমান সংস্থায় চলাচল করে। ফলে বিমান অনেক সময় যাত্রী স্বল্পতার সম্মুখীন হয়।
৫. দেশে বিমানের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের জন্য বিদেশী সাহায্য নিতে হয় যাতে প্রচুর খরচ হয়।
৬. বিমানের অভ্যন্তরীণ ভাড়া তাদের পরিচালনা খরচের চেয়ে কম বলে বিমানকে বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

এবার দেখা যাক সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় –

১. দেশের বিমানবন্দরগুলির রানওয়ে এবং টার্মিনাল বিল্ডিং সংস্কার করা।
২. কারিগরী দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩. যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. বিমানের প্রতিযোগিতামূলক ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।
৫. জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারে বিদেশী বিমান সংস্থাগুলিকে আকৃষ্ট করতে হবে।

অনুশীলন :
বাংলাদেশ বিমান বিদেশীদের নিকট আকর্ষণীয় করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

যোগাযোগ :

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা পরিবহন খাত সম্পর্কে জেনেছি। এখন যোগাযোগ খাত নিয়ে আলোচনা করব।

টেলিযোগাযোগ :

বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্মব্যস্ততা বেড়েই চলছে। কর্মব্যস্ত মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনের জন্য টেলিযোগাযোগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের ভিতরে এবং বিদেশের সাথে টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদার তুলনায় বাংলাদেশে টেলিফোনের সংখ্যা অনেক কম। বর্তমানে দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি হাজারে ৪টি টেলিফোন আছে। এ বছর (২০০০) নাগাদ তা ৭টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। ১৯৯৭ সালে দেশে ফোনের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার এবং এ বছরের (২০০০) শেষের দিকে তা প্রায় ১০ লক্ষে উন্নীত হবে।

বর্তমানে দেশের এনালগ টেলিফোন ডিজিটালে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এবং এন ডব্লিউ ডি এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগের জন্য ১৯৯৭ সালে ১৯৮৯০টি এন ডব্লিউ ডি সার্কিট ছিল এবং বৈদেশিক যোগাযোগের জন্য ১৯৫০টি সার্কিট রয়েছে।

টেলিফোন বঞ্চিত জনসাধারণকে টেলিফোন সুবিধা দেওয়ার জন্য ১৯৯২ সালে কার্ড ফোন স্থাপন করা হয়। ১৯৯৭ সালে কার্ড ফোনের সংখ্যা ছিল ১৪০০টি।

বেতবুনিয়া ও তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার মহাখালী ও সিলেটে আরও ২টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করে বৈদেশিক টেলিযোগাযোগের অধিকতর সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ঢাকায় ১টি আন্তর্জাতিক ট্রাঙ্ক সুইচিং এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়েছে। জনগণের সুবিধার্থে থানা হতে দেশের স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জের সাথে যোগাযোগের সুবিধা প্রদানের জন্য থানা পর্যায়ে অপারেটর ট্রাঙ্ক ডায়ালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। থানা পর্যায়ে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন, সেলুলার মোবাইল ফোন এবং পেজিং ট্রাংকিং সার্ভিস ইতিমধ্যেই বেসরকারী খাতে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে Citycell, Aktel ও Grameen Phone নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান সেলুলার টেলিফোন সেবা প্রদান করছে।

ডাক যোগাযোগ :

বর্তমান বিশ্বে ডাক ব্যবস্থার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারও ডাক সার্ভিসের সম্প্রসারণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৪৫টি দেশের সাথে দ্রুততম এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ই.এম.এস) প্রবর্তন এবং ২০টি দেশের সাথে ইন্টেলপোষ্ট (ফ্যাক্স) সার্ভিস চালু রয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দ্রুততর ডাক যোগাযোগের জন্য দেশের মোট ১৬১টি কেন্দ্র হতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস পোষ্ট সার্ভিস (জি.ই.পি.) সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ডাক টিকেটের মাধ্যমে দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, স্মরণীয় ঘটনাবলী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক দেশে বিদেশে তুলে ধরা হচ্ছে।

অনুশীলন :

আপনি কি মনে করেন মোবাইল ফোন দেশের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে পৌঁছা উচিত?

বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা আরও দ্রুততর করার লক্ষ্যে নতুন কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়।

সামাজিক অবকাঠামো :

আমরা এতক্ষণ ভৌত অবকাঠামো কি জানলাম। এবার আমরা সামাজিক অবকাঠামো সম্পর্কে জানব।

সামাজিক অবকাঠামোর প্রধান দু'টি খাত হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এবার এ দু'টো খাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্ –

শিক্ষা :

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল দক্ষ জনশক্তি। জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি তথা সার্বিক মান উন্নয়নে শিক্ষার মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে সর্বস্তরে শিক্ষাকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানতঃ তিন পর্যায়ে বিভক্ত। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ৭ বছর এবং উচ্চশিক্ষা ৪ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা আরও কয়েক বছর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাথমিক শিক্ষা :

১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে তা সারা দেশে সম্প্রসারিত করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার আগামী ১০ বছরের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর বেতন মওকুফ করা হয়েছে ও বিনা মূল্যে বই সরবরাহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির হার ৯৫% অর্জিত হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহিতকরণের ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন চলছে।

এবার আমরা ছকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা লক্ষ করব –

ছক : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা **(হাজারে)**

	১৯৯০	১৯৯৬
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা		
ক. মোট	৪৭	৬৩
খ. সরকারী	৩৮	৩৮
গ. বেসরকারী	৯	২৫
i. নিবন্ধনকৃত	৬	২১
ii. নিবন্ধনহীন	৩	৪
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা		
ক. মোট	১২০৫১	১৭৬৬১
খ. বালক	৬৬৬২	৯১৮৪
গ. বালিকা	৫৩৮৯	৮৪৭৭
৩. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা		
ক. মোট	১৬১	১৬১
খ. পুরুষ	১২৮	১১৬
গ. মহিলা	৩৩	৪৫

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা :

উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ও কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়। মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসায় ছাত্রীদের উপ-বৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। গণমাধ্যমের সাহায্যে দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে স্থাপিত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১৯৯৬ সনে বাংলাদেশে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল ২৫৫৪টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯৯০১টি, সাধারণ সরকারী কলেজ ২২৪টি, বেসরকারী কলেজ ৪৪টি, দাখিল মাদ্রাসা ৪২০৬টি, আলিম মাদ্রাসা ৮৯৪টি, মেডিক্যাল কলেজ ১৭টি (বেসরকারীসহ), বিশ্ববিদ্যালয় ১১টি (বেসরকারী ছাড়া)।

এবার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষাখাতের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা যাক –

১. কর্তব্য সচেতন ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন।
২. উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি।
৩. ত্যাগী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।
৪. উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবক সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন পণ্য ও সেবা সৃষ্টি সম্ভব।
৫. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগ্রতকরণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন।
৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষা।
৭. জনগণের উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

এবার আসুন দেখা যাক বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাবলী –

১. বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশের বর্তমান।
২. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অভাব রয়েছে।
৩. বাংলাদেশে শিক্ষার হার মাত্র ৪২.৬%। নারী শিক্ষার হার আবার আরও কম।
৪. বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার তীব্র অভাব রয়েছে।
৫. বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা অপরিকল্পিত।
৬. বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত পাঠ্যক্রম আধুনিক ও যুগোপযোগী নয়।
৭. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বৈষম্য। দেশে একই সঙ্গে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
৮. বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

এবারে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলির কয়েকটি সমাধান দেখা যাক্ –

১. সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল ও ও পূর্ণ বাস্তবায়ন।
২. গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক/শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।
৩. স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।
৪. বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
৫. উচ্চশিক্ষাকে সমাজের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিকল্পিত হতে হবে।
৬. নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরী করতে হবে।
৭. শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অভিন্ন নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে।
৮. পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে কি আপনি একমত? এই পদ্ধতির শিক্ষা বাস্তব জীবনে কোন কাজে আসে বলে আপনার মনে হয়?

স্বাস্থ্য :

স্বাস্থ্য সেবা জনগণের একটি মৌলিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনুন্নত এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এরপরও দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এবছর (২০০০ সাল) নাগাদ 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' লক্ষ্য অর্জনে স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুবিধা ইতোমধ্যে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

দেশের কয়েকটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালসমূহে তুলনামূলকভাবে উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ও থানা পর্যায়ে বিরাজমান হাসপাতাল ও থানা কমপ্লেক্সসমূহেও চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। তবে সার্বিকভাবে সরকারী খাতের স্বাস্থ্য সেবা ও সরঞ্জাম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

দেশের কয়েকটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালসমূহে তুলনামূলকভাবে উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ও থানা পর্যায়ে বিরাজমান হাসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহেও চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। তবে সার্বিকভাবে সরকারী খাতের স্বাস্থ্য সেবা ও সরঞ্জাম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বেসরকারী খাতে শহরগুলোতে ক্লিনিক ও হাসপাতালসমূহের ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেবা দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে। সাধারণ জনগণ বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণ চিকিৎসা লাভের জন্য পল্লী চিকিৎসক হেকিমী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী ইত্যাদির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তবে শিক্ষা বিস্তার, নগরায়ন ও আর্থিক আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণ আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে।

১৯৯৫-৯৬ সনে বাংলাদেশে সরকারী ডিসপেনসারীর সংখ্যা ছিল ১৩৬২টি, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীতে শয্যা সংখ্যা ছিল ২৮২০৪টি, ডাক্তার ২৪৬৩৮ জন, নার্স ১৩৮৩০ জন এবং থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩৭৪টি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বাস্থ্যখাতের ভূমিকা নিম্নরূপ :

১. জনশক্তির শারিরীক যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
২. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যগত মান বৃদ্ধি করা দরকার যা নিশ্চিত করবে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।
৩. বিভিন্ন ধরনের রোগ, অপুষ্টি ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অন্যের উপর নির্ভরশীল। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী। উপযুক্ত স্বাস্থ্য সুবিধার মাধ্যমে তাদের উৎপাদনক্ষম করে তোলা যায়।
৪. অসুস্থ ও পঙ্গু মানুষদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাদের কর্মক্ষম করে তুলে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সমস্যাসমূহ কি কি বলে আপনার মনে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অবকাঠামো কি?
২. বাংলাদেশের শক্তি সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশের পরিবহন খাতের সমস্যাগুলি আলোচনা করুন এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করুন।
৪. বাংলাদেশের যোগাযোগখাতের বিস্তারিত বিবরণ দিন।
৫. বাংলাদেশের সামাজিক অবকাঠামোর বর্ণনা দিন।

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১. নিম্নের কোনটি ভৌত অবকাঠামো নয়?
   ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ   খ. ই-মেইল
   গ. ডাক যোগাযোগ   ঘ. শিক্ষা

২. বাংলাদেশে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে?
   ক. ১৭টি   খ. ১৮টি
   গ. ১৯টি   ঘ. ২০টি

৩. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস কয়টি?
   ক. ২টি   খ. ৩টি
   গ. ৪টি   ঘ. ৫টি

৪. বাংলাদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য কত?
   ক. ২৫০৬.০১ কি.মি.   খ. ২৬০৬.০১ কি.মি.
   গ. ২৭০৬.০১ কি.মি.   ঘ. ২৮০৬.০১ কি.মি.

৫. বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংখ্যা কয়টি?
   ক. ১টি   খ. ২টি
   গ. ৩টি   ঘ. ৪টি

৬. বাংলাদেশে শিক্ষার হার কত?
   ক. ৪২.৬%   খ. ৩২.৬%
   গ. ৪০.৬%   ঘ. ৩০.৬%

সমস্যা

মনে করুন আপনি বরিশাল থেকে ঢাকা আসছেন। আসার জন্য আপনি কি কি অবকাঠামোগত সুবিধা ভোগ করেছেন এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন? এ পথের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে বলেন?

উত্তরমালা

নৈর্বক্তিক প্রশ্নমালা :

পাঠ ১ : ১. ঘ ; ২. খ ; ৩. খ ; ৪. গ ; ৫. ঘ

পাঠ ২ : ১. খ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. ঘ ; ৫. গ

পাঠ ৩ : ১. ঘ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. গ ; ৫. গ ; ৬. ক

বাংলাদেশের কৃষি

ইউনিট ৭

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। অর্থনীতির অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবুও একক খাত হিসেবে কৃষির অবদান এখনও সবচেয়ে বেশি। তাই এই খাতের প্রবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধির কারণ ও প্রকৃতি, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষি খাতের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে না। এই খাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুধু প্রাথমিক আলোচনা করা হবে।

পাঠ - ১ : বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৭.১.১ বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু এখানে কৃষির আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। এজন্য অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি ফসলের একর প্রতি ফলন কম। নিচে কৃষির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. **আধুনিক প্রযুক্তির কম ব্যবহার :** উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার করে কৃষির ফলন বাড়ানো যায়। কিন্তু বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তির আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির কিছু প্রসার ঘটেছে। কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে এর প্রসার অত্যন্ত কম বা নেই বললেই চলে।

২. **কৃষি ঋণের অভাব :** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র বলে তাদের নগদ অর্থের অভাব থাকে। কৃষক ঋণ নিয়ে উপকরণ কিনতে পারে। কিন্তু সংগঠিত উৎস থেকে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই কৃষকেরা প্রয়োজনীয় ঋণ পায় না। এক হিসেবে দেখা যায় শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক যাদের ০.৫০ একরের কম জমি আছে তারা কৃষি ঋণ পায় না। কৃষক অসংগঠিত উৎস থেকে ঋণ নিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার সুদের হার এত বেশি যে এই সুদে ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন লাভজনক হয় না।

৩. **অপর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ :** আধুনিক প্রযুক্তি অত্যন্ত সংবেদশীল। ঠিক সময়মত সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার না করলে ফলন খুব কম হয়। অনেক সময় বাজারে সার ও

কীটনাশকের অভাব দেখা দেয়। কখনও জ্বালানীর অভাবে সেচের অসুবিধা দেখা দেয়। এসব কারণে কৃষক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত বোধ করে।

৪. **ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থা :** বাংলাদেশে কৃষক কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় ত্রুটির জন্য ফসলের যে দাম পায় তাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক সময় পোষায় না। নগদ অর্থের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক ফসল তোলার পর পরই ফসল বিক্রয় করে ফেলে। সে সময় ফসলের দাম কম হয় বলে তারা ভাল দাম পায়না। এছাড়া গুদামঘরের অভাব, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বল্পতার জন্যও তারা ফসলের প্রত্যাশিত দাম পায় না।

৫. **অভাব :** বাংলাদেশের জনগণ অধিকাংশই দরিদ্র বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কম। এজন্য কৃষি পণ্যের চাহিদা আশানুরূপ হারে বাড়ে না। ফলে ফসলের দাম কম হয়।

৬. **কম উৎপাদনশীলতা :** আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা কম। ফলে অনেক ফসলের উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে। এসব পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলকভাবে কম দামে পাওয়া যায়। অবাধ আমদানি নীতির ফলে কিংবা প্রায় উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক সীমান্ত হওয়ার ফলে এসব সস্তা পণ্য দেশে আসে এবং প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্য মার খায়।

৭. **পরিবেশগত অবনতি :** বাংলাদেশে নানাবিধ কারণে পরিবেশগত অবনতি ঘটছে। যেমন – অতিরিক্ত হারে গাছপালা কাটা, জলাভূমি চাষের আওতায় আনা, ভারসাম্যহীন সার ব্যবহার, ত্রুটিপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কারণে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে এবং জলাবদ্ধতা ও লবাণক্ততা সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশের কৃষির উপর প্রকৃতির প্রভাব খুব বেশি। যখন প্রকৃতি অনুকূল থাকে তখন কৃষি ফলন ভাল হয়। কিন্তু বন্যা, খরা, কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রভৃতি কারণে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং সার্বিকভাবে কৃষি বিপর্যস্ত হয়।

৯. **উপযুক্ত কৃষি নীতির অভাব :** বাংলাদেশ সরকারের অনুসৃত কৃষি নীতি কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই নীতির কিছু কিছু বিষয় উন্নতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

৭.১.২ বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশের কৃষি নানাবিধ সমস্যার কারণে অনুন্নত। কৃষির উন্নতির জন্য এসব সমস্যা সমাধান করা দরকার। কৃষির এসব সমস্যা দূর করার উপায়সমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি :** কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমের সার্বিক ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নাহলে কৃষিতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে।

২. **কৃষি ঋণের ব্যবস্থা :** কৃষির উপকরণসমূহ সময়মত কেনার জন্য কৃষককে সহজ শর্তে ও সরল পদ্ধতিতে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকেরা যাতে ঋণ পায় সে ব্যবস্থা করা দরকার।

৩. **পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ :** বর্তমানে সার, সেচযন্ত্র, জ্বালানী, কীটনাশক ওষুধ, বীজ প্রভৃতি ব্যক্তিগত খাতের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এসব উপকরণ যাতে কৃষকেরা সময়মত পায় এবং উপকরণের গুণগত মান ও দাম সঠিক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৪. **বিপণন ব্যবহার উন্নতি :** কৃষক পণ্য বিক্রয় করে যে দাম পায় তা যেন লাভ নিশ্চিত করে সেজন্য বিপনন ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার। শস্য গুদামজাত করার জন্য ঋণ

দান, গুদামঘর নির্মাণ, হিমাগার নির্মাণ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায়। এছাড়া পণ্যের নতুন ধরনের ব্যবহার প্রবর্তন করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন নতুন পণ্যটি ভোক্তার রুচিমাফিক হয়।

৫. **ভূমি সংস্কার :** সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

৬. **শস্য বহুমুখীকরণ :** বাংলাদেশের কৃষিতে গুটিকতক পণ্য খুব বেশি গুরুত্ব পায়। ইতিপূর্বে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ধান ও গম, বিশেষতঃ ধান উৎপাদনে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের জন্য আলু, তৈলবীজ, পাট, ফুল ও লতাপাতা ইত্যাদির চাষ বাড়ানো দরকার।

৭. **টেকসই কৃষি :** কৃষি উৎপাদনের উপর অত্যধিক জোর দেয়ার ফলে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কৃষিতে সার, সচে ও কীটনাশকের এবং ফসলের প্যাটার্ন এমন হতে হবে যাতে কৃষির টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা :** বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি কারণে কৃষির উৎপাদন যাতে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া দরকার। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ব্যবস্থা এবং শুকনো মওসুমে চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বন্যার ক্ষতি কমানো যায়।

৯. **ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি :** কৃষির উন্নয়নের জন্য অকৃষিখাতের উন্নয়ন করা দরকার যাতে কৃষিপণ্য কেনার জন্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১০. **কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ :** কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত জাতের এবং বন্যা ও খরা সহনশীল বীজ উদ্ভাবন করা দরকার। কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই জাতের বীজের ব্যবহার এবং টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

১১. **বাণিজ্য :** কৃষিপণ্যের রপ্তানি উৎসাহিত করার দরকার। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দান অবকাঠামো নির্মাণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টি করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি কৃষির সমস্যা নয় –
ক. আধুনিক প্রযুক্তির কম ব্যবহার খ. ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থা
গ. উদ্যোক্তার অভাব ঘ. পরিবেশগত অবনতি

২। কৃষির উন্নতির জন্য নিচের কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যায় –
ক. কৃষি ঋণ মওকুফ খ. বন জঙ্গল কেটে ফেলা
গ. বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ ঘ. কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের উন্নতি বিধান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. কৃষির চারটি সমস্যা লিখুন।

খ. কৃষির সমস্যা সমাধানের চারটি উপায় লিখুন।

পাঠ - ২ : জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা : কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা কাকে বলে বলতে পারবেন।
- জমির খন্ডবিখন্ডতার কারণ ও ফলাফল বলতে পারবেন।

জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা

জমির খন্ডবিখন্ডতা বলতে এক খন্ড জমি ক্রমশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত হওয়াকে বুঝায়। জমির বিচ্ছিন্নতা বলতে একজন কৃষকের জমি একই স্থানে অবস্থিত না হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকাকে বুঝায়। অনেকের মতে, জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা বাংলাদেশের কৃষির একটি প্রধান সমস্যা।

জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ

বাংলাদেশে কৃষি জমি খন্ডবিখন্ড এবং একই কৃষকের জমি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এই খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **উত্তরাধিকার আইন :** বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এভাবে ক্রমাগত ভাগ হওয়ার ফলে জমি খন্ডবিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২. **কৃষকদের দারিদ্র :** কৃষক তার আর্থিক দুর্দশার কালে অনেক সময় জমির একাংশ বিক্রয় করে ফেলে। এভাবে বার বার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে জমি বিক্রয় করার ফলে জমি খন্ডবিখন্ড হয়।

৩. **উর্বরতার পার্থক্য :** বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য থাকে এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের উপযোগী হয়। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জমি বন্টিত হওয়ার সময় বিভিন্ন উর্বরতা সম্পন্ন জমি সমানভাগে ভাগ করা হয়। ফলে জমি খন্ডবিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৪. **অর্থনৈতিক কারণ :** জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা উপরোক্ত কারণে ঘটলেও তা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করে। বাংলাদেশের কৃষি জমি মোটামুটি সমতল হলেও একেবারে সমতল নয়। ফলে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত জমির পানি ধরে রাখার জন্য আইলের দরকার হয়। জমিতে যে সার ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া হয় তা পানির সঙ্গে নিচু বা অন্যের জমিতে চলে যেতে পারে। সেসব যেন নির্দিষ্ট জমিতে থাকে এজন্যও আইলের দরকার হয়।

৫. **অন্যান্য কারণ :** জমির মালিকানায় সীমানা চিহ্নিত করার জন্য আইলের প্রয়োজন হয়। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ও শারীরিকভাবে উদ্ভিদের তত্ত্বাবধান করার জন্য ও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত জমি অধিক উপযোগী হয়।

জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার ফলাফল

কৃষিতে জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রভাব নিরঙ্কুশভাবে ভাল বা খারাপ কোনটিই নয়। নিচে এর ফলাফল আলোচনা করা হল :

১. **সময় অপচয় ও তত্ত্বাবধানের অসুবিধা :** বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা জমিতে চলাচল করতে কৃষকের কিছু সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত জমিগুলোর তত্ত্বাবধান করাও অসুবিধাজনক হয়।

২. **জমির অপচয় :** জমিতে আইল দেয়ার ফলে কিছু জমি নষ্ট হয়। এজন্য পানি ধারণের জন্য বা সশরীরে তত্ত্বাবধানের জন্য জমির খন্ড যেরূপ হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি খন্ড অপচয়মূলক।

৩. **আধুনিক প্রযুক্তির উপযোগী :** পূর্বে মনে করা হত যে খন্ডবিখন্ড জমি আধুনিক চাষবাসের উপযোগী নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে জমির খন্ডতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোন্‌টির জন্য জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা ঘটে?
ক. কৃষককে ঋণ না দেয়া
খ. প্রকৃতির উপর কৃষির নির্ভরশীলতা
গ. জমির উর্বরতার পার্থক্য
ঘ. দুর্বল অবকাঠামো

২। জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার ফলাফল নয় কোনটি?
ক. উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধানের অসুবিধা
খ. কৃষকের পুষ্টিহীনতা
গ. জমির অপচয়
ঘ. কৃষকের সময়ের অপচয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা বলতে কি বুঝায়?

খ. খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণ লিখুন।

পাঠ - ৩ : বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা - এর ত্রুটিসমূহ, কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় বলতে পারবেন।
- ভূমিস্বত্ব ব্যবহার ত্রুটিসমূহ এবং কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব বলতে পারবেন।

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বলতে ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ধাঁচকে বুঝায়। এই অধিকারের মধ্যে জমি ব্যবহারে করার এবং ব্যবহার না করার অধিকার, ভূমি থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর অধিকার এবং ভূমি অথবা উৎপাদিত দ্রব্য অন্যের কাছে হস্তান্তর করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূমির উপর অধিকার গ্রামাঞ্চলে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেকাংশে নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশে বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ১৯৫০ এর পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের ফল। এই আইনের বলে রায়ত জমির পূর্ণ স্বত্ব লাভ করে। এই স্বত্ব স্থায়ী, বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য। পরবর্তীকালে ১৯৭২ ও ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার নীতি এবং বিভিন্ন সময়ে ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত জারীকৃত সরকারী আইনের মাধ্যমে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বর্তমান রূপ নেয়। ভূমিস্বত্বের ভিত্তিতে আইনের মাধ্যমে ভূমিস্বত্ব ভিত্তিতে বর্তমানে ৪ রকম কৃষক পরিবার দেখা দেয় :

ক. **মালিক কৃষক** - যারা নিজেই নিজের জমি চাষ করে। কাউকে বর্গা দেয়না বা কারো কাছ থেকে বর্গা নেয়ও না।

খ. **মালিক বর্গা কৃষক** - যারা নিজের জমি চাষ করে। কিন্ত প্রয়োজনে অন্যের জমি বর্গা নেয় কিংবা নিজের জমি বর্গা দেয়।

গ. **বর্গাচাষী** - যারা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে।

ঘ. **অনুপস্থিত ভূস্বামী** - যারা নিজে জমি চাষ করেনা। বিভিন্ন শর্তে অন্যকে দিয়ে নিজের জমি চাষ করায়।

১৯৯৬ সালের এক উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের শতকরা ৬.৪ অংশ মালিক কৃষক এবং এরা ৫৮.৪% জমির মালিক। মালিক বর্গা কৃষক পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৩৫.৫ অংশ এবং এরা ৩৯.৭% ভূমির মালিক।

বর্গাচাষী পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৩.৫ ভাগ এবং এদের চাষাধীন জমির পরিমাণ মোট জমির ১.৯%।

বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ

বাংলাদেশের বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **জমির অসম বন্টন :** বাংলাদেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হল জমির অসম বন্টন। ১৯৯৫ সনের এক উপাত্ত থেকে দেখা যায় শতকরা ৪ ভাগ কৃষক পরিবার (যেসব পরিবারের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৭.৫ একরের বেশি) মোট জমির ২০.৭ অংশের মালিক। অন্যদিকে শতকরা ৭২.৭ ভাগ কৃষক পরিবার শতকরা ৩৬.৮ ভাগ জমির মালিক।

২. **ভূমিহীন কৃষক :** ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আরেকটি ত্রুটি হল ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক বিভিন্ন কারণে জমি হারিয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছে।

৩. **বর্গাচাষ :** ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আরেকটি ত্রুটি হল বর্গাচাষ। ভূমি সংস্কার আইনে বর্গাচাষীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ হয় না। ফলে বর্গাচাষীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় ভোগেন।

৪. **অনুপস্থিত মালিক :** কৃষি জমির অনুপস্থিত মালিকগণ বর্গাধারী বা রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় জমি চাষ করান। এর ফলে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়েনা। তছাড়া অনুপস্থিত কৃষক জমি কেনার ফলে জমির চাহিদা বাড়ে এবং ফলে দাম বাড়ে। ক্ষুদ্র কৃষক উঁচু দামে জমি কিনতে সক্ষম হয়না।

কৃষি উৎপাদনে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রভাব

কৃষি উৎপাদনে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রভাবসমূহ নিচে আলোচনা করা হল।

১. **কম উৎপাদন :** ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ফলে জমির অসম বন্টন হয়। বড় কৃষক ও মাঝারি কৃষকেরা ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা পায়। কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা ঋণের কাম্য সুবিধা পায়না। ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয়না। তবে বাংলাদেশে উষ্ণশী প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষুদ্র কৃষকেরাও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

২. **উন্নয়ন কর্মসূচীর সুবিধা :** অসম ভূমি বন্টন অসম আয়ের জন্ম দেয়। আয় ও সম্পদের অসমতা গ্রামাঞ্চলে একটি ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বড় কৃষকদের হাতে থাকে। এর ফলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সুবিধা ছোট কৃষক অপেক্ষা বড় কৃষকেরা বেশি ভোগ করতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদনের উপর উন্নয়নের সার্বিক প্রভাব কম হয়।

৩. **বর্গাচাষ :** বর্গাচাষ প্রথার ফলে জমির অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার হয়। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত জমি মালিক নিজে যে ব্যবহার করতে সক্ষম বর্গাচাষী তার চেয়ে ভাল ব্যবহার করে। এজন্যই মালিক বর্গাচাষীকে জমি বর্গা দেয়। কিন্তু বর্গাচাষীর কার্যকরী আইনগত নিরাপত্তা না থাকায় সে সর্বোত্তম উপকরণ ব্যবহার করে না। ফলে উৎপাদন কম হয়।

৪. **অনুপস্থিত মালিক :** অনুপস্থিত মালিক অনেক সময় তদারককারী ও শ্রমিক দ্বারা জমি চাষ করায়। ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান না করায় শ্রমিক কম কাজ করতে পারে এবং ফলে উৎপাদন কম হয়।

৫. **বিপণন :** ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ফসলের উপর দাদন নিতে পারে। কিংবা অর্থের প্রয়োজনে ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে তা বিক্রয় করে দেয়। ফলে সে ফসলের লাভজনক দাম পায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

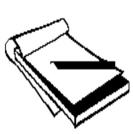

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটি?

ক. উফশী প্রযুক্তির ব্যবহার করতে না পারা খ. বর্গাচাষ প্রথার বিদ্যমানতা

গ. পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নয়ন ঘ. সেচ সুবিধা বৃদ্ধির অন্তরায়

২. নিচের কোনটি কৃষি উৎপাদনে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রভাব?

ক. কৃষি উৎপাদন কম হওয়া খ. জমির দাম কম হওয়া

গ. জমির দাম বেশি হওয়া ঘ. জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়?

খ. ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার দুইটি ত্রুটি লিখুন।

পাঠ - ৪ : কৃষির আধুনিকীকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কৃষির আধুনিকীকরণ কাকে বলে বলতে পারবেন।
- কৃষির আধুনীকিকরণের পথে সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃষির আধুনিকীকরণ

কৃষি আধুনিকীকরণ বলতে কৃষিতে ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিকাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক উপকরণের দক্ষ ব্যবহার বুঝায়। কৃষির আধুনিকীকরণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত :

১. জমি চাষ, পানি সেচ, কীটনাশক প্রয়োগ, ফসল মাড়াই, গুদাম জাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার।

২. উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, সুষম সার ব্যবহার, সেচের দক্ষ ব্যবহার, ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ।

৩. ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি।

৪. সাধারণ ও কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন, উপকরণ ব্যবহার ও বিপণন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি।

৫. কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন।

কৃষির আধুনিকীকরণ সমস্যা

বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আধুনিকীকরণ ঘটেছে। কিন্তু অন্যান্য ফসল যেমন – পাট, তেলবীজ, ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তেমন আধুনিকীকরণ ঘটেনি। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আধুনিকীরণের গতি আশানুরূপ দ্রুত নয়। কৃষি আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা যায় :

১. **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা :** বর্ষা মৌসুমে ধান উৎপাদন বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল। এ সময় জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে বন্যা বা অতিবৃষ্টির ফলে তার কার্যকারিতা আশানুরূপ হয় না। ফলে এ মৌসুমে আধুনিক কৃষি কম প্রসার লাভ করে।

২. **মূলধন ও ঋণের অভাব :** আধুনিক কৃষি উপকরণ বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করতে হয়। এজন্য যে নগদ অর্থের দরকার অনেক কৃষকের তা থাকেনা। আবার জামিনযোগ্য পরিসম্পদের অভাবে সংগঠিত উৎস থেকে ঋণও নিতে পারে না। ফলে তারা আধুনিক উপকরণ আশানুরূপ মাত্রায় ব্যবহার করতে পারে না।

৩. **কৃষকের জ্ঞানের অভাব :** কৃষকের জ্ঞানের অভাবের জন্য সে সুষমভাবে সার ব্যবহার ও সঠিকভাবে কীটনাশক ব্যবহার করতে পারেনা। এর ফলে জমির পুষ্টি উপাদানের ক্ষতি হয় এবং পরবর্তীকালে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। কৃষক এজন্য আধুনিক উপকরণের ব্যবহারকে দায়ী করে এবং এটি আধুনিকীকরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৪. **উপকরণের মূল্য :** বাংলাদেশ সরকার সার, কীটনাশক, সেচ প্রভৃতির উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়ায় এসব উপকরণের বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন উপকরণের উপর

আমদানি শুল্ক থাকায় তার দাম বেশি পড়ে। ফলে কৃষক উপকরণ ব্যবহারে কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়।

৫. **উন্নতমানের বীজের অভাব :** কৃষির আধুনিকীকরণের অন্যতম প্রধান উপাদান উন্নত জাতের বীজ। বিদেশের উন্নত জাতের বীজ দেশীয় আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানোর পর কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে তা কৃষকদের ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়ে। দুর্বল গবেষণার জন্য বাজারে এরূপ নতুন নতুন বীজের ব্যবহার হচ্ছে না।

৬. **বিপণন সমস্যা :** শস্য সংরক্ষণের অসুবিধার জন্য বা নগদ অর্থের প্রয়োজনে কৃষককে ফসল ওঠার পরপরই তা বিক্রয় করে দিতে হয়। ফলে কৃষক ফসলের উৎসাহ ব্যঞ্জক দাম পায় না। কোন বছর অতিরিক্ত ফলন হলে এ সমস্যা আরো তীব্র রূপ নেয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতাও বিপণনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

৭. **সরকারী নীতির দুর্বলতা :** কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য সরকার যে সকল নীতি নেয় তা অনেক সময় সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না, যেমন – খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতি। আবার কোন কোন নীতি আধুনিকীকরণের পথে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে, যেমন – কৃষিযন্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে –
ক. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বুঝায়
খ. কৃষকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি বুঝায়
গ. বনজঙ্গল কেটে জমি বৃদ্ধি বুঝায়
ঘ. উন্নতমানের দুধ আমদানি করা বুঝায়।

২। কৃষির আধুনিকীকরণের পথে সমস্যা নয় কোনটি?
ক. মূলধন ও ঋণের অভাব
খ. কৃষকের জ্ঞানের অভাব
গ. সরকারী নীতির দুর্বলতা
ঘ. দক্ষ শ্রমিকের অভাব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে কি বুঝায়?
খ. কৃষির আধুনিকীকরণের দুটি সমস্যা লিখুন।

পাঠ - ৫ : খাদ্য সমস্যা – কারণ ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- খাদ্য সমস্যার কারণ বলতে পারবেন।
- খাদ্য সমস্যা প্রতিকারের উপায়সমূহ বলতে পারবেন।

খাদ্য সমস্যার কারণ

খাদ্যের চাহিদার তুলনায় খাদ্যের যোগান কম হলে যে সমস্যা দেয় তাই খাদ্য সমস্যা। খাদ্যের চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পায় খাদ্যের যোগান তার চেয়ে কম বৃদ্ধি পেলে এ সমস্যা দেখা দেয়। নিচে খাদ্য সমস্যার কারণসমূহ আলোচনা করা হল :

১. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। পরিবার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় কম হলেও জনসংখ্যা এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **আয় বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে জাতীয় আয় ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্ধিত আয়ের অধিকাংশই খাদ্যের উপর ব্যয়িত হয়। ফলে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৩. **আধুনিক প্রযুক্তির মন্থর গতি :** কৃষকেরা খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে হারে আধুনিক উফশী প্রযুক্তি ব্যবহার করছিল ১৯৯০ এর দশকে তার প্রসারের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসে। ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, সার ও সেচ যন্ত্রের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়ার ফলে উৎপাদনের লাভপ্রদতা কমে যাওয়ায় কৃষকেরা বর্তমানে কিছুটা নিরুৎসাহিত। দ্বিতীয়তঃ, ঋণের লভ্যতা কমে যাওয়ায় কৃষকের উপকরণ কেনার ক্ষমতা কমে গেছে। তৃতীয়তঃ, জমিতে কোন কোন পুষ্টি উপাদানের স্বল্পতা দেখা দেয়ায় জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গেছে।

৪. **উন্নত বীজের অভাব :** সরকার বীজের ব্যবসা ব্যক্তিগত খাতে ছেড়ে দেয়ার পর বীজের মান কমে গেছে। তদুপরি উন্নত জাতের নতুন নতুন ধরনের বীজ বাজারে না আসায় উৎপাদন বাড়ছে না।

৫. **কীটপতঙ্গের আক্রমণ :** সারা বছর চাষাবাদ করার ফলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ বেড়েছে। কিন্তু কৃষকের অজ্ঞতার জন্য এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না।

৬. **খাদ্য সংরক্ষণ :** খাদ্য সংরক্ষণের অসুবিধা ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার জন্য উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ নষ্ট হয়। ফলে খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়।

৭. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে সাময়িকভাবে খাদ্য সমস্যা গুরুতর রূপ নেয়।

৮. **ত্রুটিপূর্ণ সরকারী নীতি :** সরকারী দাম নীতি, উপকরণ নীতি ইত্যাদি অনেক সময় উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রণোদনা হ্রাস করে।

খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এ উভয় দিকে নজর দেয়া দরকার। নিচে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি :** কৃষকদের মধ্যে আধুনিক উপকরণের ব্যবহার – উন্নত বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষককে এই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **খাদ্যশস্য ও বিক্রয়নীতি :** ক্ষুদ্র কৃষকেরা যাতে ফসলের উৎসাহ ব্যঞ্জক দাম পায় এজন্য সরকার ফসল কাটার মৌসুমে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং যে সময় বাজারে খাদ্যের যোগান ক্ষীণ হয় সে সময় সংগৃহীত খাদ্য বাজারে বিক্রয় করতে পারে। এর ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা উপকৃত হবে।

৩. **বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি :** বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্বল্প মূল্যে কৃষকেরা চাহিদামত গুদামঘর নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রাথমিক বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা দরকার।

৪. **কৃষি গবেষণা জোরদার :** নতুন উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবনের জন্য কৃষি গবেষণা জোরদার করা যায়।

৫. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করার জন্য দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বন্যা প্রতিরোধী ও খরা প্রতিরোধী বীজ উদ্ভাবন, দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচী ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যার কারণ কোনটি?
ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
খ. আধুনিক প্রযুক্তি প্রসারের মন্থর গতি
গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
ঘ. উপরের সব কটি

২। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় কি?
ক. খাদ্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি
খ. উপযুক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ নীতি গ্রহণ
গ. খাদ্যশস্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান
ঘ. উপরের সব কটি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যার কারণ উল্লেখ করুন।

২। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ উল্লেখ করুন।

পাঠ - ৬ : কৃষি ঋণ – ঋণের উৎস ও কাঠামোগত ত্রুটি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কৃষি ঋণের উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কৃষি ঋণের কাঠামোগত ত্রুটি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

কৃষি ঋণের উৎস

কৃষি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকরা যে ঋণ নেয় তাকে কৃষি ঋণ বলে। উৎপাদনের জন্য উপকরণ ক্রয়, পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষক কৃষি ঋণ নেয়। বাংলাদেশে কৃষি ঋণের উৎসমূহকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় : ১. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা সংগঠিত উৎস এবং ২. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা অসংগঠিত উৎস। ঋণদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন – বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতি কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন – আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন ইত্যাদি। নিচে কৃষি ঋণের উৎসের একটি তালিকা দেয়া হল :

কৃষি ঋণের উৎসমূহ

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস	অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস
১. বাংলাদেশ ব্যাংক	১. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব
২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	২. গ্রাম্য মহাজন
৩. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৩. গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার
৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪. দালাল ও বেপারী
৫. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ	৫. অবস্থাসম্পন্ন কৃষক
৬. বি, আর, ডি, বি	
৭. গ্রামীন ব্যাংক	

কৃষি ঋণের উৎসের কাঠামোগত ত্রুটি

কৃষি ঋণের কাঠামোগত ত্রুটিসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের প্রাধান্য :** কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস দু'টির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের হিসাব পাওয়া যায়। যেমন – ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ থেকে মোট ১৪৮১.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে অনেকের মতে কৃষি ঋণের শতকরা ৮০ ভাগ অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে আসে। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ কৃষি ঋণের প্রয়োজনের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ মেটাতে সক্ষম।

২. **অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার বেশি :** প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হারের তুলনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার অত্যন্ত বেশি। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সুদের হার ১৬% সেখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার ৫০% থেকে ৩০০% হতে পারে। এত উঁচু হারে ঋণ নিয়ে খুব কম উৎপাদনমূলক কাজই লাভজনক হতে পারে।

৩. **অনাদায়ী ঋণ :** প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে বিতরণকৃত ঋণের একটি বিরাট অংশ অনাদায়ী রয়েছে। এর সূচনা ঘটে ১৯৭৭ সালে যখন প্রকল্পের ঋণযোগ্যতা যাচাই না

করে বিপুল পরিমাণ অর্থ অতি দ্রুত ঋণ দেয়া হয়। পরবর্তীকালে সরকার মাঝে মাঝে কৃষি ঋণ মওকুফ করে দেয়। এর ফলে ঋণগ্রহীতা কৃষক ঋণ মাফ পাওয়ার আশায় ঋণ খেলাপী হতে উৎসাহিত হয়। অনাদায়ী ঋণের ফলে ঋণের প্রচ্ছন্ন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ঋণদানের তহবিল হ্রাস পায়।

৪. **দুটি উৎসের মধ্যে আন্তযুক্ততা :** প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিয়ে বড় কৃষক বা গ্রামের ক্ষমতাবান ব্যক্তি আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসেবে কাজ করে। গ্রামের ক্ষুদ্র বা মাঝারি কৃষক যারা নানাবিধ জটিলতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিতে ব্যর্থ হয় তারা এদের কাছ থেকে ঋণ নেয়। এভাবে দু'টি উৎসের মধ্যে আন্তঃযুক্ততা দেখা যায়। তবে এটি মন্দের ভাল এজন্য যে, এভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসে ঋণের সরবরাহ বেড়ে গেলে এ উৎসের সুদের হার কমে যাবে।

৫. **ঋণের অপ্রতুলতা :** কৃষি উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থায়ন প্রয়োজন তার তুলনায় বর্তমান কৃষি ঋণ অপ্রতুল। একথা উভয় উৎসের ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। উপরন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাও বেশিরভাগ সময় অর্জিত হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কৃষি ঋণ দেয় না –

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক

খ. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

গ. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

ঘ. জাতীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কৃষি ঋণের উৎসের কাঠামোগত ত্রুটি লিখুন।

পাঠ - ৭ : কৃষিজাত পণ্যের বিপণন - সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা

যে ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে সে যে স্থানে, সময়ে ও রূপে চায় সেভাবে পৌঁছে তাকে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা বলে। বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে নিম্নলিখিত কার্যাদি সংশ্লিষ্ট থাকে : সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, শ্রেণীকরণ, গ্রেডিং ও মোড়ক বাঁধাই, গুদামজাতকরণ ও পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বন্টন, পাইকারী ও খুচরা, অর্থায়ন, ঝুঁকি বহন, বিপণন তথ্য ও গবেষণা।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যভেদে বিপণন সমস্যার কিছু পার্থক্য দেখা দেয়। তবে সব পণ্যের ক্ষেত্রেই কিছু সাধারণ সমস্যা আছে। এখানে সাধারণ বিপণন সমস্যাগুলো আলোচনা করা হল।

১. **অপ্রতুল বাজার সুবিধা :** কৃষিজাত পণ্য যথাক্রমে গ্রামীণ প্রাথমিক বাজার, সমাবেশ বাজার এবং মাধ্যমিক বাজারে কেনা বেচা হয়। এসব বাজারে বিশেষতঃ গ্রামীন প্রাথমিক বাজারে ভৌত অবকাঠামো খুবই দুর্বল। বিক্রেতারা স্থানের অভাবে ভালভাবে লেনদেন করতে পারেনা। তাছাড়া বাজারে টোল ও চাঁদা দিতে হয়। ফলে বিক্রেতার নীট দাম কম হয়।

২. **অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :** কৃষি পণ্যের বিপণনের জন্য সব ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় যেমন – মাথার উপরে করে বহন, গরুরগাড়ী, ভ্যান, ট্রাক, রেলপথ, জলপথ ইত্যাদি। এর মধ্যে সড়ক পথ ও জলপথে বেশির ভাগ পণ্য পরিবহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমান পরিবহন ব্যবস্থায় পণ্য পরিবহণে যথেষ্ট সময় বেশি লাগে ও খরচ বেশি পড়ে। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কৃষি পণ্য পরিবহণে যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

৩. **গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা :** কৃষকের পর্যায়ে অথবা বাজারের পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত খাতে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ ও গুদাম সুবিধার অভাব রয়েছে। এর ফলে শস্য সংরক্ষণ সম্ভব হয় না বা সংরক্ষিত শস্য পোকা, ইঁদুর ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য বাংলাদেশে বেশ কিছু হিমাগার নির্মিত হয়েছে এবং এর ফলে আলু সারা বছর সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৪. **ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ :** বাংলাদেশের সর্বত্র ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ ব্যবহার করা হয়। ফলে কৃষকেরা প্রতারিত হয়।

৫. **বাজার কাঠামো :** সাধারণভাবে দেখা যায় যে কৃষি পণ্যের ব্যক্তিগত বাজার প্রতিযোগিতামূলক। বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট ব্যবসায়ী, ফড়িয়া, পাইকার, মিল মালিক, প্রক্রিয়াকারী, যে মুনাফা করে তার হার বেশি নয়। এবং প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল থেকে শহর পর্যন্ত পণ্য পৌঁছাতে কয়েক পর্যায়ের ব্যবসায়ীরই প্রয়োজন হয়। অবশ্য সরকার যেখানে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে নানারূপ পার্শ্ব লেনদেন দেখা যায়।

৬. **বিপণন ঋণের অভাব :** বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন – সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি, অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এরূপ ঋণের ব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও তা খুবই অপ্রতুল।

৭. **বাজার অর্থের অভাব :** কৃষিপণ্যের দামের তথ্য রেডিও এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু অনেক কৃষক এই তথ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা প্রতিবেশী কৃষক কিংবা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সাধারণতঃ তথ্য পায়। অবশ্য বড় ব্যবসায়ীরা টেলিফোনের মাধ্যমে অতি সহজে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্যের বাজারের দামের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যার সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এর ফলে কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে এবং ভোক্তার প্রদেয় দামও কমে যাবে।

১. **বাজার ও পরিবহণ সুবিধার উন্নয়ন :** গ্রামের প্রাথমিক বাজার, সমাবেশ বাজার ও মাধ্যমিক বাজার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন কৃষক ও ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুসারে করতে হবে। এ বাজারসমূহ পরস্পরের সঙ্গে এবং উৎপাদন এলাকার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য রাস্তাঘাট ও সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। এছাড়া বাজারে যেন বেশি উপশুল্ক বা চাঁদা আদায় না করা হয় এবং ওজন যেন সঠিক হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

২. **সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ :** সরকার কৃষককে ধান ও গমের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য শস্য কাটার মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় এর সুফল ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীগণ বেশি ভোগ করেন, কৃষক অল্পই সুবিধা পায়। সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে যে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কেনা উচিত।

   সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে যে সময় গম বিতরণ করে সে সময় দেশে গম কাটা হয়। এর ফলে ঐ সময় গমের বাজারদাম নিচে নেমে যায়। সরকারের উচিত কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ প্রদান অথবা কর্মসূচীর সময় পরিবর্তন করা।

৩. **গুদাম ও ঋণ :** শস্য সংরক্ষণের সময় শস্যের যেন ক্ষতি না হয় এজন্য সরকার গুদামঘর নির্মাণ করতে পারে এবং শস্য গুদামে মজুত রাখার বিপরীতে ঋণ দিতে পারে। সরকারের শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প এ ব্যাপারে একটি যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ।

৪. **চুক্তিমাফিক উৎপাদন :** বাংলাদেশে তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিমাফিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু আছে। এ ব্যবস্থা অনুসারে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো তালিকাভুক্ত উৎপাদকদেরকে ধারে সব ধরনের উপকরণ ও বিনামূল্যে সম্প্রসারণ সেবা দেয়। উৎপাদক তার ফসল কোম্পানির ক্রয়কেন্দ্রে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করে এবং উপকরণের দাম বাদ দিয়ে যে মূল্য হয় তা পায়। এরূপে চুক্তিমাফিক উৎপাদন অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা যায়।

৫. **কৃষি বিপণন বিভাগ পুনর্গঠন :** কৃষি বিপণন বিভাগ কৃষিপণ্যের দামের তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু জেলাস্তরের নিচে এই বিভাগের কোন কর্মচারী নেই এবং জেলাস্তরের কর্মচারীও স্বল্প বেতনে নন-গেজেটেড কর্মকর্তা। এই কর্মচারীর পদমর্যাদা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার সমান হওয়া উচিত এবং দামসহ দামের বিস্তার, উঠানামা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা ?
ক. অপ্রতুল বাজার সুবিধা
খ. বিপণন ঋণের অভাব
গ. ক ও খ উভয়ই
ঘ. ক ও খ কোনটিই নয়।

২। কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানের জন্য নিচের কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যেতে পারে?
ক. কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি
খ. শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প
গ. কৃষকদেরকে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণদান
ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা লিখুন।
২। বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণন সমস্যার সমাধানের উপায় লিখুন।

বাংলাদেশের শিল্প

ইউনিট ৮

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। সরকার এই খাতের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে নানারূপ নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই খাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়নি। এজন্য জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান প্রায় অপরিবর্তিত আছে। এ ইউনিটে বাংলাদেশের শিল্পের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হবে।

পাঠ ১ : বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বৃহদায়তন শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবেন ;
- ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবেন ;
- কুটির শিল্পের কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বৃহদায়তন শিল্প

বাংলাদেশের শিল্পখাতে প্রধানত তিন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বৃহদায়তন শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প। তবে এ তিন শ্রেণীর শিল্পের কোনো সঙ্গতিপূর্ণ সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বৃহদায়তন শিল্পের উপাত্ত সংগ্রহ করে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংজ্ঞা অনুসারে ১০ জন বা এর বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বৃহদায়তন শিল্প বলা যায়। এই শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে মাঝারি শিল্পও অন্তর্ভুক্ত আছে।

ক্ষুদ্র শিল্প

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর উপাত্ত সংগ্রহ করে। এই সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে ১০ থেকে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে এবং ২৫ লক্ষ টাকার কম স্থায়ী সম্পদ আছে এরূপ শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। তবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ২০ জনের বেশি শ্রমিক থাকলেও যদি সে প্রতিষ্ঠান যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার না করে তবে সেটিও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কুটির শিল্প

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ বা সবই পরিবারের লোক, আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকে এবং যেগুলোতে ১০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করেনা সেগুলোকে বুঝায়। তবে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০ জন পর্যন্ত শ্রমিক থাকলেও তা কুটির শিল্প হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শিল্প খাত এক জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি নয়। এর মধ্যে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে আমদানিকৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। আবার চিরায়ত প্রযুক্তি এবং পারিবারিক শ্রম ব্যবহৃত হয় এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য চলতি উপাত্ত পাওয়া মুশকিল। তবে যে উপাত্ত পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পখাতের জাতীয় আয়ে শতকরা ৬৫ ভাগ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ শতকরা ৩৫ ভাগ অবদান রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিল্পখাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে –
   ক. তিন শ্রেণীর   খ. দুই শ্রেণীর
   গ. এক শ্রেণীর   ঘ. উপরের একটিও নয়।

২. কুটির শিল্পে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিক
   ক. ভাড়াকৃত শ্রমিক   খ. পারিবারিক শ্রমিক
   গ. বন্ধু-বান্ধব   ঘ. উপরের একটিও নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৃহদায়তন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বলতে কি বুঝায় ?

পাঠ - ২ : বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৭.২.১ বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা যায় :

১. **দেশীয় অর্থনীতির ছোট আয়তন :** বাংলাদেশের জাতীয় আয় কম। ফলে লোকের ক্রয় ক্ষমতা কম এবং এজন্য শিল্পদ্রব্যের বাজার ছোট। দেশীয় লোকের চাহিদা পূরণের জন্য যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান হয় তাদের দ্রব্যের চাহিদা কম বলে তাদের দ্রুত প্রবৃদ্ধি হয় না।

২. **পাটজাত দ্রব্যের হ্রাসমান চাহিদা :** পাটজাত দ্রব্যের শিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্প ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এজন্য রপ্তানীমুখী এ শিল্পটির উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

৩. **উদ্যোক্তার অভাব :** বাংলাদেশে উদ্যোক্তা শ্রেণীর অভাব আছে। ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দু শ্রেণী ও পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানী ও উদ্বাস্তু উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পর শিল্প জাতীয়করণ করার ফলে উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠেনি। ১৯৭০ দশকের শেষ দিক হতে উদ্যোক্তা শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

৪. **অর্থ সংস্থানের অভাব :** শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ঋণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প ঋণের পরিমাণ কম। পূর্বে কম সুদে শিল্প ঋণ প্রদানের অভিজ্ঞতা আবার দুঃখজনক। অনেক শিল্প উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপী হয়েছেন। এখন বাজার নির্ধারিত সুদের হারে ঋণ দেয়া হয়।

৫. **দুর্বল অবকাঠামো :** বাংলাদেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ সরবরাহে লোড শেডিং, ভোল্টেজ উঠানামা ইত্যাদি কারণে শিল্প উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, গ্যাস সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত এবং এসবের সার্বিক সেবার মান অত্যন্ত নিম্ন।

৬. **মানব সম্পদের স্বল্পতা :** শিল্পায়ন যত অগ্রসর হয়ে ততই দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশ শিক্ষার হার কম এবং কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষার পরিমাণ আরো কম। তদুপরি নানাবিধ কারণে শিক্ষার মানও নিচু। এজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর অভাব দেখা যায়।

৭. **প্রযুক্তির পশ্চাদপদতা :** শিল্প উন্নয়নের একটি বড় নিয়ামক হল প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। কিন্তু বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করা হয় না বললেই চলে। জাতীয় পর্যায়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা বিদেশ থেকে লব্ধ প্রযুক্তি দেশের অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য যে গবেষণা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

৮. **সরকারী নীতি :** এক সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারী নীতিমালা, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি ব্যক্তিগত খাতের উন্নয়নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। ১৯৮০-এর দশক থেকে শিল্প ও বাণিজ্যনীতি ক্রমে উদারীকরণের ফলে এসব বিঘ্ন অনেকাংশে দূর হয়েছে।

৯. **শ্রমিক অসন্তোষ :** বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক অসন্তোষ লেগেই আছে। এর ফলে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়।

৭.২.৩ শিল্পের সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশে শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যায় :

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি :** দেশের জনগণের শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য কৃষি ও গ্রামীণ খাতে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গ্রামের জনগণ সাধারণতঃ দেশীয় পণ্য বেশি কেনে।

২. **উদ্যোক্তা শ্রেণী :** দেশে যাতে ব্যক্তিগত খাতে একটি উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে ওঠে সেজন্য সরকার ও ব্যক্তিগত খাতের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা থাকা দরকার। ব্যক্তিগত খাতের বিকাশ পথে অন্তরায় হয় এরূপ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সরকারী আইন কানুন দূর করা দরকার।

৩. **অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা :** শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম সঞ্চয়ের মাধ্যম তৈরি করা দরকার। দেশে যে কালো টাকা আছে তা শিল্পখাতে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ দেয়া দরকার। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

৪. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** অবকাঠামোর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। টেলিযোগাযোগ, সড়ক, বন্দর, অভ্যন্তরীণ, নৌ-চলাচল প্রভৃতির উন্নতির জন্য সরকারী ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫. **মানব সম্পদ উন্নয়ন :** দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ বৃদ্ধির করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষার প্রসার ও মান বৃদ্ধি করার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৬. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি দেশীয় অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

৭. **শ্রমিক অসন্তোষ :** শ্রমিক অসন্তোষ দূর করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা – শ্রমিক-সরকার সম্পর্কের উন্নতি হওয়া দরকার। এজন্য আইন সংশোধন করা যায়।

৮. **শিল্প উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি :** দেশে উন্নয়নের পরিবেশ তৈরির জন্য রাজনৈতিক কারণে ঘন ঘন হরতাল-ধর্মঘট বন্ধ করার দরকার এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা নয়?
   ক. উদোক্তার অভাব খ. দুর্বল অবকাঠামো
   গ. বন্যা ও খরা ঘ. শ্রমিক অসন্তোষ

২. বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যেতে পারে?
   ক. প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি খ. অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা
   গ. উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি ঘ. উপরের সব কটি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিল্পের চারটি সমস্যা লিখুন।
২. শিল্পের সমস্যা সমাধানের চারটি উপায় লিখুন।

পাঠ - ৩ : বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৭.৩.১ : বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশে যে তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তার মধ্যে মূলধন ও উৎপাদনের দিক থেকে বৃহৎ শিল্প সবচে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল:

১. **জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি :** বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক প্রতি মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বেশি। সুতরাং বৃহৎ শিল্প জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশি অবদান রাখে।

২. **কৃষি উন্নয়ন :** কোন কোন বৃহৎ শিল্প কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে। যেমন – পাট, চা, চিনি, সিগারেট ইত্যাদি। এসব শিল্পের উন্নতি হলে কাঁচামালের ব্যবহার বাড়বে এবং ফলে কৃষির উন্নতি হবে।

৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার :** বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক শিল্পগুলো বৃহৎ শিল্প। যেমন – সার, সিমেন্ট, চীনামাটির পাত্র ইত্যাদি শিল্প। এসব শিল্পের উন্নয়ন হলে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে।

৪. **রপ্তানী বৃদ্ধি :** রপ্তানিমুখী শিল্পের অনেকগুলোই বৃহৎ শিল্প। যেমন – পোশাক, চামড়া, চিংড়ী, চীনামাটির পাত্র বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। বৃহৎ শিল্প দেশের রপ্তানী বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** বৃহৎ শিল্পে সাধারণতঃ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রযুক্তির অনুসরণে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ফলে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে।

৬. **দক্ষ শ্রমিক শ্রেণী :** বৃহৎ শিল্পে সাধারণতঃ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এর ফলে দেশে একটি দক্ষ শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব নয় কোনটি?

ক. জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি খ. কুটির শিল্পের উন্নতি
গ. রপ্তানি বৃদ্ধি ঘ. প্রযুক্তির উন্নয়ন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পাঠ - ৪ : কতিপয় বৃহৎ শিল্পের বর্তমান অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কতিপয় বৃহৎ শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কতিপয় বৃহৎ শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কতিপয় বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশে যে সকল বৃহৎ শিল্প আছে তার মধ্যে বস্ত্র, পাট, কাগজ, সার, সিমেন্ট, চিনি, এম.এস. রড, চা, পানীয়, সাবান ও ডিটারজেন্ট এবং চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি শিল্প প্রধান। এখানে পাট, বস্ত্র ও পোষাক, চা, কাগজ ও চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পাঠ শিল্প

বাংলাদেশে বর্তমানে ৭৭টি পাট কল আছে। এর মধ্যে ৪০টি সরকারি খাতে এবং ৩৭টি ব্যক্তিগত খাতে। এই পাটকলগুলোতে মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাজার স্থায়ী শ্রমিক কাজ করে। বর্তমানে বছরে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং এর প্রায় ৮৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানি হয়। পাটকলগুলোতে চট, থলে, দড়ি, কার্পেট, পর্দার কাপড়, জিড প্লাস্টিকের আসবাবপত্র ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। পাট থেকে মোটা সুতা, কাগজ ইত্যাদি তৈরির চেষ্টা চলছে। তবে তা এখনও বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়নি। পাটজাত দ্রব্য থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮ ভাগে আসে।

পাট শিল্পের সমস্যা

১. **আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা কম :** পাট শিল্পের প্রধান সমস্যা হল আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস। বড় বড় কন্টেইনারে মাল পরিবহণ, পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি থেকে তৈরি কৃত্রিম সুতা, দড়ি, থলে, কাগজের থলে ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পাটজাত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক চাহিদা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

২. **পরিবর্তনশীল যোগান :** ধান ও পাটের উৎপাদন এবং আবহাওয়ার উপর পাটের উৎপাদন নির্ভর করে। দেখা যায় পাটের উৎপাদন এক বছরের তুলনায় আরেক বছর খুব বেশি পরিবর্তনশীল। এজন্য পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দাম খুব বেশি উঠানামা করে। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতারা এরূপ পরিবর্তনশীল দাম বিশিষ্ট দ্রব্য কিনতে আগ্রহী হয় না ; তারা বিকল্প দ্রব্য যার দাম ও যোগান স্থিতিশীল তা কিনতে চায়।

৩. **পাটকলগুলোর সমস্যা :** দেশের পাটকলগুলোয় নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। সরকারী পাটকলগুলোতে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অদক্ষতা, অতিরিক্ত শ্রমিক, শ্রমিক অসন্তোষ, পুরাতন যন্ত্রপাতি, উঁচু উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়। বেসরকারী কলগুলোতেও এসব সমস্যা রয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত ঋণ ও মূলধনের অভাবজনিত সমস্যা রয়েছে।

৪. **লোকসান :** পাটকলগুলোতে বিশেষতঃ সরকারি পাটকলগুলোতে লোকসান সমস্যা একটি বড় সমস্যা।

সমস্যার সমাধান

পাটশিল্পের সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন :

১. **আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি :** আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চিরায়ত চাহিদা কমে গেছে। চাহিদা বৃদ্ধির জন্য পাটজাত দ্রব্যের নতুন নতুন ব্যবহার উদ্ভাবন করতে হবে এবং কম খরচে সেসব পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে।

২. **উৎপাদন ব্যয় হ্রাস :** পাটের উৎপাদন লাভজনক করার জন্য ধানের ন্যায় পাটের ক্ষেত্রে উফশী প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার করা দরকার। এছাড়া পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন, শ্রমিক সংখ্যা যৌক্তিকীকরণ এবং শ্রমিক অসন্তোষ দূরীকরণ প্রয়োজন।

৩. **দেশীয় ব্যবহার বৃদ্ধি :** দেশে ব্যবহার হবে পাট থেকে এরূপ দ্রব্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

বস্ত্র ও পোশাক শিল্প

বস্ত্র শিল্পের ৪টি অংশ – সুতা উৎপাদন, বস্ত্র উৎপাদন, রংকরণ ও প্রিন্টিং এবং তৈরি পোশাক। বিভিন্ন পর্যায়ের সমস্যার মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে এবং সমাধানের মধ্যেও এজন্য পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে সুতা উৎপাদনের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। **১৯৯১-৯২** সালে বাংলাদেশে **৫৯.৮** মিলিয়ন কেজি সুতা উৎপাদিত হয়। **১৯৯৬-৯৭** সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় **১০৯.৯** মিলিয়ন কেজিতে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাদেশ সুতা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মোট চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ সুতা দেশে উৎপাদিত হয়। অবশিষ্ট সুতা আমদানি করা হয়।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই সময়ে রাষ্ট্রীয় খাতে পরিচালিত বৃহদায়তন মিলগুলোর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তা দেশের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে সক্ষম নয়। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত বস্ত্রের ব্যবহার দ্বিবিধ। প্রথমত, দেশের মানুষের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ। দ্বিতীয়ত, দেশের রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের চাহিদা আংশিকভাবে পূরণ। বস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বিধায় বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বস্ত্র আমদানি করে। বাংলাদেশ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের জন্য গড়ে ২ – ৩ বিলিয়ন গজ বস্ত্র আমদানি করে।

সুতা ও বস্ত্রশিল্পের সমস্যা

১. **আমদানি নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশে যে তুলা উৎপাদিত হয় তাতে দেশের চাহিদা মেটেনা। এজন্য সুতা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় তুলা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আবার যে পরিমাণ সুতা উৎপাদিত হয় তাতে দেশের চাহিদা মেটেনা। এজন্য বিদেশ থেকে সুতা আমদানি করতে হয়। এর ফলে উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।

২. **সেকেলে প্রযুক্তি :** বিগত কয়েক বছরে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক সুতা ও বস্ত্র মিল এবং যৌগিক বস্ত্রমিল স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ সুতা ও বস্ত্রমিল পুরাতন। এসব মিলে পুরাতন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। ফলে এসব মিলে উৎপাদিত পণ্যের মান নিচু হয়।

৩. **বিদেশী প্রতিযোগিতা :** বিদেশ থেকে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়ভাবে আমদানিকৃত অপেক্ষাকৃত সস্তা সুতা ও বস্ত্রের সঙ্গে দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।

৪. **অন্যান্য সমস্যা :** এছাড়া সুতা ও বস্ত্রশিল্পের আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। এসবের মধ্যে কারখানার ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, শ্রমিকের অদক্ষতা, শ্রমিক আন্দোলন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণের অভাব ইত্যাদি অন্যতম।

সমস্যা সমাধানের উপায়

১. **আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ :** তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল এবং সুতার আমদানি নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দেশে তুলা চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তুলাজাত ও কৃত্রিম তন্তুজাত সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন দেশে উৎপাদিত পণ্যের দাম আমদানিকৃত পণ্যের তুলনায় খুব বেশি না হয়।

২. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** দেশে আধুনিক প্রযুক্তির কারখানা স্থাপন এবং পুরাতন কারখানাসমূহের প্রযুক্তির আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

৩. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** এই খাতে দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪. **বেসরকারীকরণ :** সরকারী খাতের লোকসানকারী উদ্যোগসমূহ সহজ শর্তে ব্যক্তিগতখাতে হস্তান্তর করা দরকার।

৫. **অন্যান্য ব্যবস্থা :** দক্ষ ব্যবস্থাপক ও সুশৃংখল শ্রমিক শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। শ্রমিক আন্দোলন কমানো, বিদ্যুৎ সমস্যার উন্নয়ন এবং সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

পোশাক শিল্প

তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার শিল্প বাংলাদেশের একটি দ্রুত বিকাশমান শিল্প। এটি পুরোপুরি রপ্তানীমুখী শিল্প। ১৯৭৭ – ৭৮ সালে তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি। বর্তমানে এই সংখ্যা ৩ হাজারের কাছাকাছি। ১৯৮১ – ৮২ সালে দেশে ০.১৩ মিলিয়ন ডজন পোশাকে তৈরি হয় এবং ১৯৯৮ – ৯৯ সালে প্রায় ৭৪ মিলিয়ন ডজন তৈরি পোশাক উৎপাদিত হয় এবং এ থেকে ৩.২ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হয়। একই বছরে নীট ওয়্যার দ্রব্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ১.১৫ বিলিয়ন ডলার। এই উভয় উৎস থেকে দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ রপ্তানি আয় হয়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। নীটওয়্যার দ্রব্যের প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ। বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্য এসব দেশে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করে।

এটি একটি আমদানি নির্ভর শিল্প। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান আমদানি করতে এই শিল্পের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭০ ভাগ ব্যয়িত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বোতাম, জিপার, কার্টন ইত্যাদির বেশির ভাগ এখন দেশে তৈরি হয়।

পোশাক শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নিচের সমস্যাসমূহ দেখা যায় :

১. **কম মূল্য সংযোজন :** ব্যবহৃত বস্ত্রের বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। পোশাক কারখানাগুলো বিদেশী ফার্মের চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরি করে সরবরাহ করে। এর ফলে দেশের উপাদান দ্বারা শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ মূল্য সংযোজিত হয়।

২. **বিদ্যুৎ বিভ্রাট :** বিদ্যুৎ বিভ্রাট এই শিল্পের জন্য একটি সমস্যা সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ সমস্যা এড়ানোর জন্য অনেক ফার্ম নিজস্ব জেনারেটর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এতে উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে এবং কারখানার মুনাফার হার কমে যায়।

৩. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক কারণে কারখানা বন্ধ থাকলে তা সমস্যার সৃষ্টি করে। পোশাকের ফরমাশ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরবরাহ করতে না পারলে রপ্তানিকৃত পোশাক বিদেশী আমদানিকারক গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারে। এ অবস্থায় উৎপাদক ফার্মসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৪. **ব্যাংক ঋণের অসুবিধা :** তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ সাধারণত ঋণ সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু কোন কারণে যেমন – সময়মত ফরমাশ যোগান দিতে ব্যর্থ হলে ফার্ম ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। তখন ফার্ম ব্যাংক থেকে আর ঋণ পায় না। এতে ফার্ম বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৫. **কাজের পরিবেশ :** কারখানার কাজের পরিবেশ আমদানিকারক দেশের মনঃপুত না হলে আমাদের তৈরি পোশাক আমদানি করতে অস্বীকার করতে পারে।

সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিচের ব্যবস্থাসমূহ নেয়া যায় :

১. **পশ্চাৎ সংযুক্তি শিল্প স্থাপন :** পোশাক শিল্পের আমদানি নির্ভরতা কমানোর জন্য বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন আবশ্যক। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সুতা, বোনা কাপড়-এর কারখানা স্থাপন করা দরকার। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে দেশে উৎপাদিত কাপড়ের মান যেন নিচু এবং দাম বেশি না হয়।

২. **বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নয়ন :** দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে পোশাক শিল্প যথাযথ পরিমাণে নিয়মিত বিদ্যুৎ পায়।

৩. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন :** দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত পোশাক শিল্প হরতালের আওতামুক্ত রাখা যাতে পোশাক শিল্পে নিরূপদ্রবভাবে উৎপাদন কাজ চলতে পারে।

৪. **ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা :** পোশাক শিল্পে পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ঋণের অভাবে কারখানা বন্ধ না হয়।

৫. **কাজের পরিবেশ :** কারখানার কাজের পরিবেশ উন্নত হওয়া দরকার যাতে শ্রমিকেরা ভাল পরিবেশে কাজ করতে পারে।

৬. **সঠিক বিনিময় হার :** রপ্তানিকৃত পোশাকের দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি হলে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা কমে যায়। এটি যাতে না হয় এজন্য টাকার বিনিময় হার যুক্তিশীল স্তরে রাখা প্রয়োজন।

চা শিল্প

চা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ও রপ্তানী ফসল। চা শিল্প গ্রামীণ কর্মনিয়োগের সুযোগ বিশেষতঃ মহিলাদের কর্মনিয়োগের সুযোগ দেয় এবং গ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখে। বাংলাদেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। গত ১০ বছরে এই বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার শতকরা ৩ ভাগ। বাংলাদেশে ১৯৯৭ – ৯৮ সালে মোট ৫৮.৬১ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদিত হয়। সাম্প্রতিককালে দেশে উৎপাদনের তুলনায় অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ বেশি

হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য রপ্তানির পরিমাণ কমে গেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫৮ টি চা বাগান আছে। এর অধিকাংশই বৃহত্তর সিলেট জেলায় অবস্থিত।

চা শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশে চা শিল্পের নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ দেখা যায় :

১. **ভূমির অদক্ষ ব্যবহার :** অনেক চা বাগানের জমি দক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় না। চা চাষে ব্যবহৃত হয়না এরূপ জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়না।

২. **অদক্ষ ব্যবস্থাপনা :** অধিকাংশ চা বাগানের অবস্থা খারাপ এবং ফলন কম। মুনাফা কম হওয়ায় অনেক চা বাগান ঋণ নিতে পারে না। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণও কম হয়।

৩. **ভূমি ইজারাদান কর্মসূচী :** সরকারের ভূমি ইজারা দান কর্মসূচীর ফলে অলাভজনক বাগানও ভূমি দখল করে রাখতে পারে। চা চাষের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ জমি ব্যবহৃত হলেই ভূমি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে ও ফেলে রাখতে পারে।

৪. **বেশি শ্রম-খরচ :** কৃষিখাতের অন্যান্য উপখাতের তুলনায় চা উপখাতে শ্রমিকের মজুরির হার বেশি। চুক্তি অনুসারে চা বাগান শ্রমিককে কর্মচ্যুত করতে পারেনা এবং লাভ না হলেও নির্দিষ্ট হারে শ্রমিককে মজুরি দিতে হয়।

৫. **চা বোর্ডের উদ্দেশ্য :** বর্তমান বাজার ও শিল্পের অবস্থা বিবেচনায় চা বোর্ডের উৎপাদন অধীন জমির পরিমাণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সফল নাও হতে পারে।

সমস্যা সমাধানের উপায়

১. **বৈচিত্রকরণের জন্য সাহায্য :** যে সব জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে কিংবা চা চাষ হয় না সেসব জমিতে অন্যান্য বাণিজ্যিক ও লাভজনক ফসল উৎপাদন করা যায়। এজন্য চা বাগানগুলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া যায়।

২. **ব্যবস্থাপনা দক্ষতার বিস্তার :** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় এবং ফলন বৃদ্ধি করা যায়। জমির দক্ষ ব্যবহার করতে পারে এরূপ ফার্মের কাছে জমির মালিকানা হস্তান্তর করা যায়।

৩. **ভূমি ইজারাদান পদ্ধতি পুনঃপরীক্ষা :** বর্তমান ভূমি ইজারাদান পদ্ধতির টেকসইতা ও দক্ষতা পুনঃপরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং ভূমির দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনে তা সংশোধন করা উচিত। অধিকাংশ বাগানের ৩৫ বৎসর মেয়াদী ইজারা ২০০৩ সালে উত্তীর্ণ হবে। এ সময়ের মধ্যেই এ পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন।

৪. **ক্ষুদ্র চাষীর সম্ভাবনা :** ক্ষুদ্র চাষী শ্রম ও মূলধন যথাযথভাবে ব্যবহার করে কাম্য উৎপাদ উৎপাদনে সক্ষম হয়। চা চাষে ক্ষুদ্র চাষী ব্যবস্থা ব্যবহার করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যায়।

৫. **চা বোর্ডের ভূমিকা পরীক্ষা :** চা উৎপাদন ভূমির পরিমাণ বাড়িয়ে চা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো চা বোর্ডের বর্তমান উদ্দেশ্য। এটি না করে বোর্ডের উচিত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা।

কাগজ শিল্প

কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বাংলাদেশে ২টি কাগজ মিল ১টি নিউজপ্রিন্ট মিল এবং ১টি কাগজের মন্ড তৈরির কারখানা আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে কাগজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং নিউজপ্রিন্ট দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা যেত। কিন্তু লেখাও ছাপার জন্য কাগজের চাহিদা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে কাগজের ঘাটতি থাকে। বর্তমানে দেশে খবরের কাগজ, সাপ্তাহিকী ইত্যাদির সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় নিউজপ্রিন্ট আমদানি করতে হয়। বর্তমান কালে কাগজ শিল্পের উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণ বিশেষতঃ রপ্তানি দ্রব্য পরিবহনের জন্য মোড়ক দ্রব্য এবং পিজাবোর্ডের বাক্স উৎপাদন। ব্যক্তিগত খাতে এ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

কাগজ শিল্পের সমস্যা

কাগজ শিল্পের প্রধান সমস্যা হল কারখানার যন্ত্রপাতির ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা এবং কাঁচামালের অপর্যাপ্ত যোগান।

সমস্যার সমাধান

কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মিলগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকায়ন ও প্রতিস্থাপন প্রয়োজন। কাঁচামালের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গাছপালার বাণিজ্যিকভাবে চাষ প্রয়োজন।

চামড়া শিল্প

চামড়া শিল্প একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। বর্তমানে বাংলাদেশে ২০০টিরও অধিক চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা আছে। এর মধ্যে চামড়া পাকা করার কারখানা আছে ৪০টি। দেশে ১৪০ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া উৎপাদিত হয়। এর শতকরা ৮০ ভাগ গরুর চামড়া।

চামড়া শিল্পের সমস্যা

ঋণের অভাব : চামড়া শিল্পের প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের অভাব। ঋণের অভাবে অনেক চামড়ার কারখানা কাঁচামাল কিনতে পারেনা এবং ফলে কারখানা পূর্ণ উদ্যমে চালাতে পারেনা।

ফ্যাশন মাফিক জুতা : চামড়া দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার পরিবর্তনশীল। এই বাজারের সঙ্গে মিল রেখে সঠিক গুণগতমান ও সঠিক ফ্যাশনের জুতা আন্তর্জাতিক বাজারে যোগান দিতে হয়। বাংলাদেশ নানা প্রতিকূলতার কারণে এই উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি।

সমস্যা সমাধানের উপায়

১. **পর্যাপ্ত ঋণ যোগান :** চামড়া শিল্পে প্রয়োজনীয় ঋণের যোগান দেয়া উচিত।

২. **ফ্যাশন মাফিক দ্রব্য :** চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঠিক গুণের ও সঠিক ফ্যাশনের জুতা সরবরাহ করে না। এজন্য এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

পাঠ - ৫ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

♦ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায়, শিল্পখাতের মূল সংযোজনের শতকরা ৫২.৩ ভাগ এবং কর্মনিয়োগের শতকরা ৮৬.৮ ভাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ঘটে। নিচে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. **অতিরিক্ত আয় ও আয় বৈষম্য হ্রাস :** বাংলাদেশের শতকরা ৬৩.২ ভাগ শ্রমিক কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষি উৎপাদন মৌসুমী হওয়ায় বছরের সকল সময় এসব শ্রমিক সমানভাবে কর্মসংস্থান পায় না। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এসব শ্রমিকের জন্য অতিরিক্ত আয়ের পথ সুগম করে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে আয় করে। তাদের আয় বৃদ্ধির ফলে আয় বৈষম্য হ্রাস পায়।

২. **অতিরিক্ত কর্মসংস্থান :** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেকারত্ব ও ছদ্মবেকারত্ব রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মসংস্থানের ফলে এ ধরনের বেকারত্ব হ্রাস পায়।

৩. **মহিলাদের কর্মসংস্থান :** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিশেষতঃ কুটির শিল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। তাঁরা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘরে বসে কুটির শিল্পে কাজ করতে পারেন।

৪. **সংযুক্ত প্রভাব :** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সংযুক্তি প্রভাব রয়েছে। এসব শিল্পের অনেকগুলি স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। ফলে স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারী শিল্পসমূহ উৎসাহিত হয়।

৫. **রুচি মাফিক উৎপাদন :** কুটির শিল্পের অনেক দ্রব্য ক্রেতার ব্যক্তিগত রুচি ও চাহিদামাফিক উৎপাদন করা যায়। যেমন – স্বর্ণালংকার তৈরি, জামাকাপড় তৈরি, কাপড় নকশাকরণ ইত্যাদি।

৬. **জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ :** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অনেকগুলি লুপ্ত প্রায়। কিন্তু কিছু শিল্প টিকে আছে যা জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলার সংরক্ষণ করে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্প খাতের মূল্য সংযোজনের শতকরা ৫২.৩ ভাগ ও কর্মনিয়োগের শতকরা ৮৬.৮ ভাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঘটে। এই খাত (১) গ্রামীণ জনগণের অতিরিক্ত আয়ের পথ সুগম ও আয় বন্টনে বৈষম্য হ্রাস করে। (২) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। (৩) মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। (৪) সংযুক্তি প্রভাব সৃষ্টি করে। (৫) ক্রেতার রুচিমাফিক উৎপাদন করে এবং (৩) জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিল্পখাতের মূল্য সংযোজনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ঘটে?
ক. শতকরা ৫০ ভাগ খ. শতকরা ৫২.৩ ভাগ
গ. শতকরা ৪৭.৭ ভাগ ঘ. শতকরা ৮৬.৮ ভাগ

২। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান কোনটি?
ক. কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে খ. আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে
গ. মহিলাদের কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি করে ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ করে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ - ৬ : কুটিরশিল্প ও স্বকর্মসংস্থান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কুটির শিল্পের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

কুটির শিল্প

কুটির বা বাড়ীতে সাধারণতঃ পারিবারিক সদস্যদের পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন শ্রম দানের ভিত্তিতে পরিচালিত ম্যানুফ্যাকচারিং বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যার মূলধনের পরিমাণ টাকা ৫০ লক্ষের উপরে নয় এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কুটিরশিল্প হিসাবে পরিচিত।

স্ব-কর্মসংস্থান

স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তি বলতে যে ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) তার পারিবারিক কৃষিখামার বা অকৃষি উদ্যোগে মুনাফা বা পারিবারিক লাভের জন্য কাজ করে তাকে বুঝায়। এরূপ কাজের জন্য ঐ ব্যক্তি কোন মজুরি বা বেতন পায় না।

সময়ের পূর্ণ ব্যবহার

উপরের সংজ্ঞা দুটি হতে কুটির শিল্প ও স্ব-কর্মসংস্থানের মধ্যকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক সহজে বোঝা যায়। কুটির শিল্প মূলতঃ পরিবারের সদস্যদের শ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় অর্থাৎ কুটির শিল্পের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যেরা স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। কুটির শিল্পে একজন ব্যক্তি পূর্ণকালীন কাজ করতে পারে। অথবা, পরিবারের অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে খন্ডকালীন কাজ করতে পারে। এভাবে একজন ব্যক্তির সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়।

বর্ণহীন সময়ে নিয়োগ

কৃষিখাতের বাৎসরিক উৎপাদন চক্রের জন্য বছরের কোনো কোনো সময়ে কৃষি শ্রমিকের সাময়িক কর্মহীনতা দেখা দেয়। এ সময়ে কৃষি শ্রমিক কুটির শিল্পে নিয়োজিত হতে পারে এবং তার বেকারত্বের তীব্রতা হ্রাস করতে পারে।

অসুবিধা কবলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান

সমাজের অসুবিধা কবলিত শ্রেণী, যেমন – ভূমিহীন ও মহিলাদের জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে কুটির শিল্প দারিদ্র বিমোচনে বিরাট ভূমিকা রাখে। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় কুটির শিল্পে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বেশি।

স্বল্প মূলধন প্রয়োজন

কুটির শিল্পে অল্প পরিমাণ মূলধনের দরকার হয়। গ্রামের দরিদ্র জনগণের পক্ষে স্বল্প মূলধন যোগাড় করা সুবিধাজনক। বেশি মূলধন যোগাড় করা সুবিধাজনক নয়। আজকাল বিভিন্ন এন.জি.ও ছোট ছোট ঋণের মাধ্যমে কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করছে। মানুষ স্বল্প পুঁজি ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম কুটির শিল্প সামগ্রী উৎপাদন করছে।

সারসংক্ষেপ

কুটির শিল্প স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কুটির শিল্প গ্রামীন শ্রমিকের সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং অপেক্ষাকৃত কর্মহীন সময়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। কুটির শিল্প সমাজের অপেক্ষাকৃত অসুবিধা কবলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কুটির শিল্প স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ উপযোগী। কেননা এই শিল্পে স্বল্প পরিমাণ পুঁজি দরকার হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. স্ব-কর্মসংস্থান বলতে কি বুঝায় ?

ক. নিজের উদ্যোগে চাকুরি যোগাড় করা
খ. অন্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা
গ. পারিবারিক উদ্যোগে মুনাফা বা পরিবারের লাভের জন্য কাজ করা
ঘ. বিনা বেতনে কোথাও চাকুরি করা।

২. কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য –

ক. স্বল্প মূলধনের দরকার হয়
খ. বেশি মূলধনের দরকার হয়
গ. শ্রমিকের তুলনায় বেশি মূলধনের দরকার হয়
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কুটির শিল্পের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ - ৭ : কুটির শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কুটির শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কুটির শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৭.১ বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যাসমূহ :

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের বহুবিধ সমস্যা দেখা যায়। এর মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

১. **পুঁজির স্বল্পতা :** বাংলাদেশের কুটির শিল্পের উদ্যোক্তারা অধিকাংশই দরিদ্র। তারা নিজেদের স্বল্প পুঁজি ব্যবহার করে ছোট আয়তনের উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। এতে মুনাফার পরিমাণ কম হয়। ফলে কুটির শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তি কোনোভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করে উৎপাদনের আয়তন বাড়াতে সক্ষম হয় না।

২. **ঋণের অভাব :** অধিকাংশ কুটির শিল্পীদের ঋণের জন্য জামিন দেয়ার মত সম্পদ থাকে না। এজন্য তারা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পেতে সক্ষম হয়না। আজকাল কিছু ব্যষ্টিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পীদের ঋণ দিচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুটির শিল্পী তার উৎপাদিতব্য পণ্যের উপর ঋণ (দাদন) নেয়। এক্ষেত্রেও তার মুনাফার পরিমাণ কম হয়।

৩. **অনুন্নত প্রযুক্তি :** কুটির শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তি অনুন্নত। এজন্য উৎপাদনশীলতার পরিমাণ কম। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুন্নত প্রযুক্তিতে উৎপাদিত পণ্য বাজারের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্যের মান বৃদ্ধি ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাব :** কুটির শিল্পীরা উৎপাদনের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পায়না। তারা পারিবারিকভাবে এবং কাজ করতে করতে উৎপাদন প্রক্রিয়া আরম্ভ করে। এর ফলে আধুনিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় না এবং উৎপাদন গতিশীল হয় না।

৫. **সহায়ক সেবার অভাব :** উৎপাদন কাজে সহায়ক সেবাকার্য যেমন – ঋণ, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদির জন্য কোথায় ও কার কাছ যেতে হবে এটি অনেক সময় জানা থাকেনা।

৬. **বাজারের অভাব :** কুটির শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকাংশ ক্রেতা দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এজন্য এ শিল্পের দ্রব্যের বাজার সীমিত। আজকাল অবশ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে অনেক পণ্য উচ্চবিত্ত শ্রেণীর এমনকি বিদেশীদের রুচিমাফিক উৎপাদিত হচ্ছে।

৭. **সামঞ্জস্যহীন সরকারী নীতি :** সরকারী আমদানি নীতির জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুটির শিল্প অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেমন – উদার আমদানি নীতি বা কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ শুল্ক আরোপ ইত্যাদির জন্য কুটির শিল্পের দ্রব্য অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

এছাড়া সরকারের শিল্পনীতি ও কুটির শিল্পের জন্য প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

৭.২ বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. **পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সরবরাহ :** কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সরবরাহ এজন্য দেশে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। ঋণের সাহায্যে উৎপাদক বেশি পরিমাণ কাঁচামাল কিনতে ও দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

২. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** কুটির শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এজন্য দেশে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। সম্ভব ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করা যায়।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দান :** কুটির শিল্পের উৎপাদনের গতিশীলতা আনয়নের জন্য এ শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় কাঁচামাল ক্রয়ের উৎস ও কাঁচামালের গুণাগুণ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ক্রেতার রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কুটির শিল্পের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪. **সহায়ক সেবাদান :** কুটির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। এসব প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্পের জন্য সব রকম সেবা দান এবং সেবা সম্পর্কিত পরামর্শ দান করতে পারে।

৫. **বাজারের অভাব :** কুটির শিল্পে উচ্চবিত্ত ও বিদেশী ক্রেতাদের জন্য নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদন করা দরকার। তাহলে বাজারের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

৬. **সরকারী নীতি :** কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য যথাযথ সরকারী নীতি দরকার। সহজ শর্তে ঋণদান, আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি নীতির মাধ্যমে সরকার কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

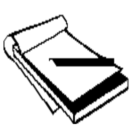

কুটির শিল্পের বিবিধ সমস্যার মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ : (১) পুঁজির স্বল্পতা, (২) ঋণের অভাব, (৩) অনুন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, (৪) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, (৫) সহায়ক সেবার অভাব, (৬) বাজারের অভাব, (৭) সামঞ্জস্যহীন সরকারী নীতি।
এ সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ নেয়া দরকার : (১) পর্যাপ্ত ঋণ, (২) উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, (৩) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দান, (৪) সহায়ক সেবা দান, (৫) বাজার উন্নয়ন ও (৬) যথাযথ সরকারী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি কুটির শিল্পের সমস্যা?

ক. পুঁজির স্বল্পতা | খ. অনুন্নত প্রযুক্তি
গ. বাজারের অভাব | ঘ. উপরের সব কটি

২. কুটির শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিচের কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যায়?

ক. প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য আমদানি।
খ. কুটির শিল্পের কাঁচামালের উপর অধিক হারে শুল্ক আরোপ।
গ. পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ।
ঘ. কুটির শিল্পীদের স্বাস্থ্য সেবা দান।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কুটির শিল্পের সমস্যাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. কুটির শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ ৮ : বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা ও বেসরকারী করণের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৮.১ সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ অর্থনীতিতে সরকারী খাত ও বেসরকারী খাত উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বেসরকারী খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের ভূমিকা সীমিত বা অনুপস্থিত, বেসরকারী খাতের ভূমিকাই প্রধান। অর্থনীতির কয়েকটি খাত, যেমন – ১. অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, ২. আণবিক শক্তি, ৩. বিমান পরিবহন, ৪. টেলিযোগাযোগ, ৫. বন সম্পদ আহরণ সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট সকল খাত বেসরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট সকল খাত বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অর্থনীতির এই সামগ্রিক নীতির প্রেক্ষাপটে শিল্পখাতে ও সরকারী খাত ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট খাত ব্যতীত শিল্পখাতের অন্য কোন উপখাতই সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত করা হয়নি। অর্থাৎ শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অপরিহার্য নয় বলে মনে করা হয়। দেশের শিল্পায়নে বেসরকারী খাত প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। এর কারণ তুলনামূলকভাবে বেসরকারী খাত অধিক দক্ষ।

শিল্প দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টনে সরকারী খাতের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির অর্থ অবশ্য এ নয় যে, দেশের শিল্পায়নে সরকারী খাতের কোন ভূমিকা নেই। বরং মনে করা হয় যে, শিল্পায়নে সরকারী খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এ ভূমিকা হবে সহায়ক ভূমিকা। নিয়ন্ত্রক বা প্রত্যক্ষ উৎপাদকের ভূমিকা নয়। ব্যক্তিগত খাতের উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু সরকারী নীতিমালা এবং পর্যাপ্ত সহায়ক সেবার প্রয়োজন যেগুলো বেসরকারী খাত সরবরাহ করতে সক্ষম নয়। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ বন্দর সেবা, দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থা, অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সুশাসন দেশের শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সরকারী খাত এসব সেবা দক্ষভাবে সরবরাহ করে দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৮.২ বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের শিল্পখাতের অধিকাংশ বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে সরকার বৃহদায়তন শিল্পের স্থায়ী সম্পদের শতকরা ৯২ ভাগের মালিকানা লাভ করে। দুটি পরস্পর সম্পর্কিত কারণে শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। প্রথমত, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে গঠনের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পূর্বে আধুনিক শিল্পখাতের অধিকাংশের মালিকানা ছিল পাকিস্তানীদের হাতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তারা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ব্যবস্থাপনার সকলে দেশ ত্যাগ করে গেলে এসব প্রতিষ্ঠানে চরম শূন্যতা দেখা দেয়। বাংলাদেশী ব্যক্তিগত খাত ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ও অক্ষম। এ

পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখার উদ্দেশ্যেও তা জাতীয়করণ করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত খাতে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করে দেয়া হয়।

জাতীয়কৃত শিল্পখাতের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, উগ্র শ্রমিক সংঘ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন হয় এবং লোকসানের পরিমাণ প্রতিবছর বাড়তে থাকে। সরকারী খাতের এই লোকসান সরকারের বাজেট থেকে কিংবা ঋণ করে পূরণের চেষ্টা করা হয়। এর ফলে সরকারের অন্যান্য জরুরী কার্যক্রম অর্থায়নের সংকট দেখা দেয় এবং আর্থিক খাতেও চাপ অনুভূত হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার জাতীয়কৃত শিল্প বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৮২ সালের শিল্পনীতিতে এ সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়। এর পরবর্তীকালের শিল্পনীতিগুলোতেও এ সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যক্তিগত খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় এবং সরকারী খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে সহায়ক ভূমিকা কার্যকরী হয়।

সরকারের উন্নয়ননীতি হচ্ছে ব্যক্তিগত খাত পরিচালিত প্রবৃদ্ধি। এমতাবস্থায় উৎপাদন ও বন্টন ক্ষেত্রে সরকারী খাতের বড় ভূমিকা হবে সরকারের মৌল নীতির বিরোধী। এজন্যও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পের বেসরকারীকরণ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোন খাতটি সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত?
ক. কৃষি — খ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
গ. অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম — ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. দেশের শিল্পায়নে সরকারী খাতের ভূমিকা হবে –
ক. সহায়কের ভূমিকা — খ. নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা
গ. প্রত্যক্ষ উৎপাদকের ভূমিকা — ঘ. উৎপীড়কের ভূমিকা

৩. বাংলাদেশে বর্তমানে পাটকলের সংখ্যা –
ক. ৪০টি — খ. ৭৭টি
গ. ৩৭ টি — ঘ. ৮৭ টি

৪. পাটজাত দ্রব্যের শতকরা কত ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়?
ক. ৮৫ ভাগ — খ. ৮০ ভাগ
গ. ৭৫ ভাগ — ঘ. ৯০ ভাগ

৫. বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের অধিকাংশই রপ্তানি হয় –
ক. আমেরিকা ও কানাডায় — খ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশসমূহ
গ. সি আই এস ভূক্ত দেশসমূহ — ঘ. (ক) ও (খ)

৬. বাংলাদেশে বর্তমানে চা বাগানের সংখ্যা কয়টি?
ক. ১৮৫ টি — খ. ১৪৮ টি
গ. ১৬৮টি — ঘ. উপরের কোনটি নয়।

৭. বাংলাদেশের কোন রপ্তানি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা ক্রমশ কমে যাচ্ছে?
ক. পাটজাত দ্রব্য — খ. চিনি
গ. তৈরি পোশাক — ঘ. চামড়া

৮. পরিবর্তনশীল যোগান কোন শিল্পের সমস্যা?
   ক. চামড়া   খ. চা
   গ. পাট   ঘ. উপরের সবকটি
৯. বাংলাদেশের কোন শিল্পের আমদানি নির্ভরশীলতা সবচেয়ে বেশি?
   ক. কাগজ   খ. চিনি
   গ. তৈরি পোশাক   ঘ. সিমেন্ট

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেশের শিল্পায়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।
২. বাংলাদেশে শিল্প বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লিখুন।
৩. পাটশিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।
৪. পোশাক শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।
৫. চা শিল্পের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সংক্ষেপে লিখুন।

বাংলাদেশের সরকারী অর্থ ব্যবস্থা

ইউনিট ৯

পাঠ ১ : স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ণনা দিতে পারবেন
- স্থানীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন
- স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের উপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

fwgKv

শিক্ষার্থীরা আপনারা নিশ্চয়ই "প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ" শব্দটির সহিত সবাই কম বেশী পরিচিত। চলুন এবার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ :

প্রশাসন এক হাতে বা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত না রেখে জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভাগ করে দেয়াই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। সাধারণ জনগণের প্রশাসনিক কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কল্যাণেই মূলতঃ স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার শব্দ দুটির উৎপত্তি।

স্থানীয় সরকার :

স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কোন রাষ্ট্রকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয় এবং এর প্রশাসনের ভার স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের হাত ন্যস্ত করা হয়। প্রশাসনিক কর্মে নিয়োজিত এই স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণই স্থানীয় সরকার নামে পরিচিত। যেমন : গ্রাম্য মাতব্বর, গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

কেন্দ্রীয় সরকার :

একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় গুরুদায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং গোটা রাষ্ট্রের সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য পুরস্কার বা তিরস্কার যাদের ললাটে বর্তায় তারাই সমষ্টিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নামে খ্যাত। আধুনিক বিশ্বে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়-দায়িত্ব বহুগুণে বেড়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে তাল মিলাতে গিয়ে তাদের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্র বহুলাংশে প্রসারিত হয়েছে এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই তা জটিল আকার ধারণ করছে। এই জটিল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একযোগে কাজ করছে।

অনুশীলন : স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার মনে এই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকার কোন কোন উৎস থেকে আয় করে এবং কিভাবে ব্যয় করে।

আসুন একটু কল্পনা করা যাক্। ধরুন, আপনি গ্রামে বাস করেন। আপনার গ্রাম থেকে শহরে আসার একটা মাত্রই রাস্তা। রাস্তার মধ্যে একটা সাঁকো বেশ কয়েকদিন যাবত ভেঙ্গে পড়ে আছে। সাঁকোটা মেরামত করতে অনেক টাকা লাগবে যা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। হয়ত একদিন আপনার গ্রামের চেয়ারম্যান সেই ভাঙ্গা সাঁকো মেরামতের দায়িত্ব নিলেন এবং মেরামত করলেন। এখন আপনি যদি সাধারণ চিন্তাধারার লোক হন তবে মনে করবেন চেয়ারম্যান তার নিজের টাকায় সেতুটি মেরামত করেছে এবং তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকবে না। কাজটি নিঃসন্দেহে মহৎ এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যে টাকাটা ব্যয়িত হলো সেটা কোথা থেকে এলো একবারও কি আপনি ভেবে দেখেছেন?

চলুন তাহলে এবার প্রথমে স্থানীয় সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলি দেখা যাক্।

একটা সময় ছিল যখন গ্রাম সরকার বা গ্রাম্য মাতব্বররাই ছিল গ্রামের মাথা। বিচার আচার থেকে শুরু করে সমাজের সুখ-দুঃখ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা এত জটিল ছিল না। সেই সোনার বাংলাদেশ ছিল ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা ইবনে বতুতার রঙ তুলিতে আঁকা। তাই সেই সময় স্থানীয় সরকারকে তার আয়-ব্যয় নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামাতে হত না। কিন্তু সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় সমাজ ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিল আকার ধারণ করতে লাগল। সাথে সাথে স্থানীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের পরিধি বেড়ে গেল বহুগুণে। স্থানীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের এই আলোচনার উষালগ্নে প্রথমেই ইউনিয়ন পরিষদের কথায় আসা যাক্।

ইউনিয়ন পরিষদ আসলে কি?

পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারী হয়। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। চেয়ারম্যান ইউনিয়নের সকল ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের মোট সদস্য ১৪ জন এবং মেয়াদ ৫ বছর। বর্তমানে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৪৭২টি।

ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এই কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নিম্নোক্ত উৎস সমূহ হতে ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করে থাকে।

১. **ঘরবাড়ির মূল্য ও জমির আয়ের উপর ধার্য কর :** কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ইউনিয়ন পরিষদ ঘর-বাড়ি ও জমির আয়ের উপর ধার্য কর করে।

২. **যানবাহনের উপর কর :** রিক্সা, সাইকেল, গরুর গাড়ি, টমটম এবং অন্যান্য যানবাহনের উপর আরোপিত কর হতে ইউনিয়ন পরিষদের আয় হয়।

৩. **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর কর :** হাট-বাজার, খেয়াঘাট, হাওড়, পুকুর, প্রভৃতির লীজ থেকে ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর মোটা অংকের মুনাফা আয় করে।

৪. **অপরাধী জরিমানা :** অপরাধীর উপর ধার্যকৃত জরিমানা ইউনিয়ন পরিষদের একটি আয়।

৫. **ব্যবসা ও পেশার উপর ধার্য কর :** ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকার অভ্যন্তরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কর পেয়ে থাকে এটা ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের একটি অন্যতম উৎস।

৬. **বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ধার্য কর :** বিবাহ, আলোকসজ্জা, প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠান থেকে ইউনিয়ন পরিষদ কর পেয়ে থাকে।

৭. **বিনোদনের উপর ধার্য কর :** সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, খেলা ইত্যাদি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ বাধ্যতামূলকভাবে কর আদায় করে।

৮. **লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য কর :** বিভিন্ন ঠিকাদারী লাইসেন্স ও পারমিট প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কর পেয়ে থাকে।

৯. **সরকারী সাহায্য :** কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন অনুদান বা বরাদ্দ স্থানীয় সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস।

অনুশীলন : উপরোক্ত উৎসগুলো ব্যতীত আরো কিছু আয়ের উৎস নিজে নিজে ভাবুন।

উপরোল্লেখিত আয় থেকে ইউনিয়ন পরিষদ তাদের নির্বাচনী এলাকার জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যয় করে থাকে।

এবার তাহলে চলুন স্থানীয় সরকারে ব্যয়ের খাতগুলো লক্ষ্য করা যাক :

১. **জনকল্যাণমূলক কাজ :** স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে তার অর্জিত অর্থ ব্যয় করে থাকে। যথা – রাস্তাঘাটের সংরক্ষণ ও আলোর ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, গোরস্থান এবং শশ্মান নির্মাণ ও তত্ত্বাবধান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য কূপ, নলকূপ, ট্যাঙ্ক খনন ও সংরক্ষণ, জন্মমৃত্যুর রেজিষ্ট্রিকরণ, বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, এতিম দুঃস্থ ও বিধবাদের সাহায্যদান, এতিমখানা পরিচালনা ইত্যাদি।

২. **উন্নয়নমূলক কাজ :** ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষিক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার, সার, বীজ, চারা বিতরণ ব্যবস্থা, পোকামাকড়ের জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

৩. **জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত :** এলাকায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য স্থানীয় সরকার অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে।

৪. **বিবিধ :** এছাড়া স্থানীয় পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তদারক, ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, লাইব্রেরি ও পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে তার অর্জিত ফান্ড থেকে ব্যয় করে। গ্রামের শান্তি রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজেও অর্থ ব্যয় করতে হয়।

অনুশীলনী : ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নাগরিকরা যে সাহায্য পায় তার সবটা কি তাদের হাতে পৌঁছায় বলে আপনি মনে করেন।

এবার পৌরসভার আলোচনায় আসা যাক্। গ্রামের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন হচ্ছে ইউনিয়ন এবং শহরের ক্ষেত্রে পৌরসভা। কাজেই আমরা বলতে পারি ইউনিয়ন ও পৌরসভা একই জিনিসের দুটি ভিন্ন নাম মাত্র। ইউনিয়ন পরিষদের প্রধানকে বলা হয় চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা মেম্বার নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে পৌরসভার প্রধানকে বলা হয় চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা কমিশনার নামে পরিচিত। শহরের জনসাধারণের আধুনিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভা বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থকে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিম্নলিখিত উৎসগুলো হতে আদায় করে থাকে :

১. পৌরসভায় বসবাসরত জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের বাড়িঘর ও জমির আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়।

২. পৌরসভায় যানবাহন চলাচলের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং এই অনুমতি বাবদ পৌরসভা একটি নির্দিষ্ট ফি যানবাহনের মালিকদের কাছ থেকে আদায় করে।

৩. বিবাহ, ভোজ, আলোকসজ্জা প্রভৃতির জন্য পৌরসভাকে কর দিতে হয়।

৪. সরকারী বিভিন্ন খাস জমি থেকে পৌরসভা প্রতি বছর প্রচুর অর্থ আয় করে।

৫. নাটক, থিয়েটার, মেলা প্রভৃতি বিনোদনের জন্য পৌরসভার অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ কর পৌরসভাকে প্রদান করতে হয়।

৬. পৌরসভার ভিতরে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, জলমহল প্রভৃতি আছে এদের কাছ থেকে প্রতিবছর কর বাবদ প্রচুর অর্থ পৌরসভা আয় করে।

৭. পৌরসভার মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ, খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ মন্দির প্রভৃতি নির্মাণে সরকারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পৌরসভা পেয়ে থাকে। এটা পৌরসভার আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৮. পৌরসভা বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট বাবদও আয় করে থাকে।

৯. পৌরসভার মধ্যে গোরস্থান, পুকুর, খেয়াঘাট, হাটবাজার, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি থেকে ইজারা বাবদ স্থানীয় সরকার প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

অনুশীলনী : পৌরসভার আয়ের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি উৎস আলোচনা করুন।

পৌরসভা শহরের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য এবং আধুনিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য তার অর্জিত অর্থ নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করে থাকে :

১. শহরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পৌরসভা সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারীর প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রভৃতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে।

২. পৌর এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও বেসরকারী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হয় তার ব্যয়ভার পৌরসভাকেই প্রদান করতে হয়।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত আর্তমানবতার সেবায় পৌরসভাকে এগিয়ে আসতে হয় ও সাহায্য সহযোগিতা করতে হয়।

৪. পৌর এলাকায় শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস নির্মাণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিনামূল্যে বই ও বৃত্তি প্রদান খাতে পৌরসভাকে ব্যয় বহন করতে হয়।

৫. সরকারী জায়গায় বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ পার্ক উদ্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

৬. গরীব-দুঃখী ও দুঃস্থদের জন্য কল্যাণকেন্দ্র, অনাথ আশ্রম, নিঃসম্বল ব্যক্তিদের মৃতদেহের সৎকার প্রভৃতিতে পৌরসভাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হয়।

৭. পৌরসভা শহর এলাকায় জাদুঘর, আর্ট গ্যালারী, মিলনায়তন, গ্রন্থাগার, মুক্ত মঞ্চ ইত্যাদি স্থাপন করে।

৮. বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করা পৌরসভার কাজ। পানি নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করাও পৌরসভার দায়িত্ব।

৯. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেনসারি স্থাপনে পৌরসভা অর্থ ব্যয় করে থাকে।

১০. শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৌরসভা প্রয়োজনে টাস্কফোর্স গঠন করে এবং এর জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ থাকে।

অনুশীলন : ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

এবার চলুন কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের অভ্যন্তরে প্রশাসন পরিচালনা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার কার্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হয়। এই কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার তার এই প্রয়োজনীয় অর্থ মূলতঃ কর এবং কর বহির্ভূত খাত থেকে আদায় করে থকে। নিম্নে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান খাতসমূহ আলোচনা করা হ'ল।

১. **আয়কর :** আয়কর সরকারী আয়ের একটি বর্ধমান উৎস। জনগণের ব্যক্তিগত আয়ের উপর এ কর ধার্য করা হয়। যাদের বার্ষিক আয় ৬০ হাজার টাকার উপরে, তাদেরকে আয়কর দিতে হয়।

২. **ভূমি রাজস্ব :** কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হল ভূমি রাজস্ব। স্বাধীনতার পর ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করায় এ খাতে আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৩. **মূল্য সংযোজন কর :** দেশের পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন থেকে ভোগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোজিত মূল্যের ভিত্তিতে এ কর ধার্য করা হয়। এটি একটি পরোক্ষ কর। এটি সংক্ষেপে ভ্যাট নামে পরিচিত।

৪. **বাণিজ্য শুল্ক :** বাণিজ্য শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস। সাধারণতঃ আমদানি-রপ্তানির উপর এই শুল্ক ধার্য করা হয়।

৫. **আবগারী শুল্ক :** চা, চিনি, তামাক, সিগারেট, দিয়াশলাই, কেরোসিন, ঔষধ, প্রসাধনী প্রভৃতির উপর কেন্দ্রীয় সরকার আবগারী শুল্ক ধার্য করে।

৬. **স্ট্যাম্প :** বিভিন্ন দলিল, মামলা-মোকদ্দমার আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদির উপর স্ট্যাম্প বসাতে হয়। স্ট্যাম্প বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব আয় করে থাকে।

৭. **রেজিস্ট্রেশন :** বিভিন্ন দলিলপত্র রেজিস্ট্রি করতে হলে সম্পত্তির মূল্যের উপর সরকারকে রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়।

৮. **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান :** এসব প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হিসেবে গণ্য।

৯. **রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প :** স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে যেগুলো এখনও সরকারী মালিকানায় রয়েছে সেগুলো থেকে সরকারের আয় হয়।

১০. **সুদ :** কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্মচারীদের সুদে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে।

১১. **ডাক, তার ও দূরালাপনী :** ফোন, ফ্যাক্স ও ডাক বিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব আয় করে থাকে।

১২. **যাতায়াত :** যাতায়াত খাতে রেলওয়ে ও বিআরটিসি দীর্ঘদিন লোকসানী খাত ছিল। গত বছর রেলওয়ে খাতে আয় হয়েছে ১৩৪ কোটি টাকা। আর বিআরটিসি ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়াতে এটা বর্তমানে সরকারের লাভজনক খাতে পরিণত হয়েছে।

১৩. **বন :** বন যে কোন দেশের জাতীয় সম্পদ। বনাঞ্চল থেকে বাঁশ, কাঠ, মধু ও অন্যান্য বনজ সম্পদ বিক্রয় করে প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকার কিছু না কিছু আয় করে।

১৪. **যানবাহন :** কেন্দ্রীয় সরকার যানবাহন থেকে কর আদায় করে।

এছাড়াও প্রমোদ কর, বিদ্যুৎ কর, সম্পত্তি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর, বিদেশ ভ্রমণের কর, সেচ কর, অপরাধীদের অর্থ দন্ড প্রভৃতি উৎস হতে আয় করে থাকে।

অনুশীলন : কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎসগুলো থেকে প্রাপ্য আয়ের সবটা সংগ্রহ করতে পারে বলে কি আপনি মনে করেন? যদি না পারে তবে কেন?

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের খাত :

১. **প্রতিরক্ষা :** কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হল প্রতিরক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষার জন্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনী দরকার। তাই সামরিক বাহিনীর বেতন, ভাতা প্রশিক্ষণ ব্যয় এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্র ক্রয়ের জন্য প্রতিবছর সরকারী বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয়।

২. **বেসামরিক প্রশাসন :** বেসামরিক শাসন কার্য পরিচালনার জন্য রাজধানী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের একটা বিশেষ অংশ ব্যয় হয়।

৩. **শিক্ষা :** বর্তমানে শিক্ষার উপর বাংলাদেশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ১৯৯৮-৯৯ এর বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে ৪ হাজার ৫ শত ৯৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

৪. **স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা :** স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

৫. **পুলিশ :** অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি পুলিশ বাহিনীর বেতন ভাতা ৩০% বাড়ানো হযেছে।

৬. **রাইফেলস :** দেশের সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান রোধের জন্য বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনী (বিডিআর) গড়ে তুলেছে।

৭. **বিচার ও কারা বিভাগ :** দেশের সর্বত্র বিচার বিভাগ পরিচালনা এবং কারাগারগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী ব্যয় আবশ্যক।

৮. **বেসামরিক পূর্ত কাজ :** সরকারী ভবন, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণে সরকারকে অর্থ সাহায্য দিতে হয়।

৯. **রাজস্ব সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান :** আয়কর বিভাগ, বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটা অংকের অর্থ সরকারকে ব্যয় করতে হয়।

১০. **ঋণ ও সুদ পরিশোধ :** উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে যে ঋণ নেয় তা সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হয়।

১১. **সমাজ কল্যাণ :** জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মধ্যে পার্ক, স্টেডিয়াম, পর্যটন কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করে। এগুলোর স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।

১২. **অপ্রত্যাশিত ব্যয় :** যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন – বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে সরকারকে দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয় এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে হয়।

এসব ব্যয় ছাড়াও বিদেশে দেশের দূতাবাস স্থাপন ও পরিচালনা, সরকারী কর্মচারীদের বোনাস, অবসরভাতা, বিনোদন ভাতা, ভর্তূকি, সাহায্য, মঞ্জুরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলন : কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের খ্যাতগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. স্থানীয় সরকারের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২. স্থানীয় সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো বর্ণনা করুন।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো বর্ণনা করুন।

৪. স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত ?

ক. ৪৪২৭ টি — খ. ৪২৪৭ টি
গ. ৪৪৭২ টি — ঘ. কোনটিই না

২। মূল্য সংযোজন কর আসলে —

ক. প্রত্যক্ষ কর — খ. পরোক্ষ কর
গ. আয়কর — ঘ. সুদ

৩। স্থানীয় সরকারের ব্যয়ের খাত কোন্টি ?

ক. প্রতিরক্ষা — খ. শিক্ষা
গ. প্রশাসন — ঘ. জনকল্যাণ

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের একটা বিশাল অংশ ব্যয় হয় —

ক. সমাজকল্যাণ — খ. প্রতিরক্ষা
গ. শিক্ষা — ঘ. প্রশাসন

সমস্যা :

ধরুন বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা বন্ধ করে দিল। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত দেশের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবে। এই অবস্থায় —

ক) আপনার কি মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার আগের মত দক্ষতার সাথে তার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

খ) যদি না পারে তবে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে?

গ) স্থানীয় প্রশাসন ব্যতীত এই সমস্যা থেকে সমাধানের উপায়গুলো বের করুন।

পাঠ - ২ : বাংলাদেশে সরকারী আয়ের উৎস সমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সরকারী আয় কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- সরকারী আয়ের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন
- বাংলাদেশের সরকারের আয়ের উৎস সমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভূমিকা :

একটি দেশের সরকারী আয়ের উৎস ও পরিমাণ এবং সরকারী ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ নির্ভর করে দেশটির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর। তবে প্রতিটি দেশের সরকারের আয়-ব্যয়ের কিছু সাধারণ উৎস এবং খাত রয়েছে। আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাতসমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ভর করে দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা, উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণ, কর ব্যবস্থার দক্ষতা, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত প্রভৃতির উপর। বর্তমান পাঠে আমরা সরকারী আয়ের উৎসসমূহের বর্ণনা করব।

সরকারী আয়ের উৎসমূহ :

প্রত্যেকটি সরকারকেই দেশের প্রশাসন পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার-কার্য, প্রতিরক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য কর ও কর বহির্ভূত খাত থেকে সরকার অর্থ আয় করে থাকে। এ আয়ই সরকারী আয় হিসেবে পরিচিত। সরকারী আয়ের উৎস দু'টি।

১. কর থেকে আয় এবং

২. কর বহির্ভূত খাত থেকে আয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশকেও বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থ আয় করতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশের কর বাবদ অর্জিত আয়ের বিভিন্ন উৎসগুলো বর্ণনা করা হ'ল।

আয়কর : জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের উপর যে কর ধার্য হয় তাকে আয়কর বলে। বাংলাদেশে যাদের আয় বার্ষিক ৬০ হাজার টাকার উপরে তাদেরকে আয়কর দিতে হয়। আয়কর সরকারী আয়ের একটি বর্তমান উৎস।

বহিঃশুল্ক : আমদানি-রপ্তানির উপর আরোপিত শুল্ককে বহিঃশুল্ক বলে। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে এ খাতে বাংলাদেশ ৪৪১০ কোটি টাকা আয় করেছে।

অনুশীলন : সরকারী আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটি (কর থেকে)।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় : রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রভৃতি সরকারী আয়ের অন্যতম উৎস। তবে এ সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় স্থিতিশীল নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

বন বিভাগ : বন বিভাগ থেকে সরকার প্রতি বছর কিছু না কিছু আয়-অর্জন করে থকে। ১৯৯২/৯৩ এবং ১৯৯৩/৯৪ সালে এ উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০ ও ৪২ কোটি টাকা।

তার ও টেলিফোন : তার ও টেলিফোন সরকারী রাজস্ব আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৬৫৯ ও ৭৫০ কোটি টাকা আয় করে।

সুদ : সরকার বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। এ সব বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রদানকৃত ঋণ থেকে সরকার সুদ হিসেবে আয় অর্জন করে থাকে। ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে সুদ হতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৫০ ও ৫০০ কোটি টাকা। ১৯৯৭/৯৮ সালের বাজেটে এ খাতে ৩.৭% প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে।

জরিমানা : দেশের আইন ভঙ্গকারীদের নিকট হতে শাস্তিস্বরূপ জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায় করা হয় এবং এটা বাধ্যতামূলক।

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম : বন, মৎস্য, সেচ এবং পশু সম্পদ খাতে প্রাপ্তি বৃদ্ধির ফলে সংশোধিত বাজেটে প্রায় ৮.৮% প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটে এ খাতে প্রায় ১১% প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে।

সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা : দুঃস্থদের জন্য বিশেষ কল্যাণমূলক অনুদান খাতে ৫০ কোটি টাকা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য বিশেষ অনুদান ১২ কোটি ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে ধার্য করা হয়েছে। এ খাতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১৪৩ ও ১৫৩ কোটি টাকা আয় করেছে।

ডাক বিভাগ : ডাক বিভাগে প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার বিপুল অংকের ভর্তুকি দিয়ে থাকে। ১৯৯৫/৯৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি টাকা।

যোগাযোগ ও পরিবহন : পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ৬৮ ও ৭৪ কোটি টাকা আয় করেছে।

বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানী শুল্ক : বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানী স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে প্রতিবন্ধক। বিলাসজাত দ্রব্য এবং কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানীর উপর আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় কর বৃদ্ধি করলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বাড়বে।

সরকারী ঋণ : সরকারের স্বাভাবিক আয় যখন ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তখন সরকার দেশের জনসাধারণের নিকট হতে অথবা বিদেশ হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সাধারণতঃ কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিলে এই ঋণ গ্রহণ করা হয়।

রেলওয়ে : বাংলাদেশ রেলওয়ে মূলতঃ সরকারের একটি ভর্তুকি প্রাপ্ত খাত। এর ব্যর্থতার জন্য মালিকানা দায়ী নয় বরং ব্যবস্থাপনাগত অব্যবস্থাই দায়ী। ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে রেলওয়েতে যেখানে লোকসানের পরিমাণ ছিল ১৫৯ কোটি টাকা, ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে সেখানে লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৪ কোটি টাকা।

বাণিজ্যিক আয় : জনসাধারণের মত সরকারও নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে যেমন – ডাক, তার, টেলিভিশন, বিমান, রেল প্রভৃতি। এছাড়া যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয় সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। এসব প্রতিষ্ঠান হতে সরকার প্রতি বছর প্রচুর আয় করে।

বঙ্গবন্ধু সেতু সারচার্জ ও লেভী : বাংলাদেশের মানুষের কল্পনার বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেতু। **১৯৯১/৯২** অর্থ বছরে সরকার বঙ্গবন্ধু সেতুর সারচার্জ বাবদ ৮০ কোটি টাকা আয় করে।

অন্যান্য উৎস : উপরোক্ত উৎসগুলো ছাড়াও সরকার প্রমোদ কর, সম্পত্তি কর, দান কর, বিদ্যুৎ কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর প্রভৃতি উৎস হতে প্রচুর আয় করে থাকে। **১৯৯০/৯১** সালে এর পরিমাণ ছিল ২৯৩.৯৪ কোটি টাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামুলক প্রশ্ন :

১. সরকারী আয় কাকে বলে? সরকারী আয়ের উৎস কি কি?
২. কোন দেশের অর্থনীতিতে সরকারী আয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎসগুলোর বিবরণ দাও।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সরকারী আয়ের উৎস নির্ভর করে দেশের –
ক. রাজনৈতিক অবস্থার উপর   খ. অর্থনৈতিক অবস্থার উপর
গ. আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর   ঘ. সামাজিক অবস্থার উপর

২। বাংলাদেশের সেই সব জনগণ আয়কর দিয়ে থাকে যাদের আয় –
ক. ৫৫ হাজার টাকার উপরে   খ. ৬০ হাজার টাকার উপরে
গ. ৫৮ হাজার টাকার উপরে   ঘ. ৬৫ হাজার টাকার উপরে

৩। সিগারেট ও ঔষধের উপর ধার্য করা হয় –
ক. আবগারী শুল্ক   খ. মাদক শুল্ক
গ. সম্পূরক শুল্ক   ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৪। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কোন্‌টি?
ক. রেলওয়ে   খ. কৃষি
গ. আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা :
বাংলাদেশ সরকারের আয়ের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ উৎস লিপিবদ্ধ করুন। এবার **১৯৯৫-৯৬** অর্থ বছরকে ভিত্তি বছর ধরে **১৯৯৭-৯৮** এর বাজেটের আলোকে এই উৎসগুলোর কতটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে তার শতাংশিক হিসাব নির্ণয় করুন।

পাঠ - ৩ : বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কর কাকে বলে জানতে পারবেন
- উত্তম কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বর্তমান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা কতটা সন্তোষজনক সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন
- বাংলাদেশের কর কাঠামোতে কি ধরনের পরিবর্তন আবশ্যক সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

ভূমিকা :

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা কর ও এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিশদ জেনেছেন। চলুন আমরা একটু স্মরণ করার চেষ্টা করি আসলে কর কি? সরকারী আয়ের প্রধান উৎস হল কর। জনসাধারণ সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। এর জন্য সরকার কর প্রদানকারীকে সুবিধা দিতে বাধ্য নহে বা এর জন্য নাগরিক সরকারের নিকট হতে প্রত্যক্ষ কোন সুবিধা দাবী করতে পারে না কিন্তু কর প্রদান করতে সে আইনত বাধ্য থাকে। করের অর্থ সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হয়। মোট সরকারী রাজস্বের প্রায় ৮০ শতাংশ কর থেকে আগে এবং অবশিষ্ট ২০ শতাংশ আসে কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে। তাই যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য একটি উত্তম কর ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

উত্তম কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী :

যে কর পদ্ধতিতে করের আইন কানুনগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তাকে উত্তম কর ব্যবস্থা বলা হয়। এই আলোকে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় :

১. করদাতাগণের সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য করাই আদর্শ কর ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিশ্চয়ই কোন ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তির উপর কোন সরকার কর ধার্য্য করবে না।

২. কর বন্টনে সরকারকে যুক্তিসঙ্গত আচরণ করতে হয়। সর্বাপেক্ষা কম ত্যাগ স্বীকার করার নীতি দ্বারাই কর ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। এমনভাবে কর ধার্য্য করা উচিত সমাজে গড় ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম হয়। এজন্য সমানুপাতিক হার অপেক্ষা প্রগতিশীল হারে কর ধার্য করা উত্তম বলে বিবেচিত হয়।

৩. সরকারের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচুর রাজস্বের প্রয়োজন হয়। তাই উৎপাদনশীল খাতে কর ধার্য্য করা উচিত যা হতে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভব। তবে কর ধার্যের ফলে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সরকারকে যত্নবান হতে হবে।

৪. কর আদায়ে যাতে খরচ কম হয় সেদিকে সরকারকে লক্ষ রাখতে হবে। কর আদায়ে অত্যধিক খরচ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

৫. কি পরিমাণ এবং কোন সময়ে কর ধার্য্য করলে করদাতা ও সরকারের বাজেট প্রণয়নে সুবিধা হয় সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। এমন কর ধার্য্য করা উচিত যা নিশ্চিতভাবে প্রতিপালিত হয়।

৬. একই পরিমাণ কর বিভিন্ন পদ্ধতিতে আদায় করা যেতে পারে। কিছু কিছু পদ্ধতি আছে যার ফলে করদাতাদের কর প্রদানের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আবার কিছু পদ্ধতি আছে যাতে তারা কম অসুবিধা ভোগ করে। যে পদ্ধতিতে কর আদায় করলে করদাতার উপর চাপ কম পড়ে তাই আদর্শ করা আদায় পদ্ধতি।

৭. উত্তম কর ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার কর থাকা বাঞ্ছনীয়। কর কাঠামোতে উভয় প্রকার কর বর্তমান থাকলে একে অপরের অসুবিধাসমূহ কিছুটা নিষ্ক্রিয় করতে পারে এবং পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

৮. একটিমাত্র কর বা অসংখ্য কর ধার্য্য না করে কতিপয় কর ধার্য করা কর ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটিমাত্র কর যেমন খুব উৎপাদনক্ষম নহে তেমনি বহুবিধ কর ধার্য করলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এমন কতগুলি কর ধার্য করা প্রয়োজন যাতে প্রচুর রাজস্ব আদায় হয় অথচ কর ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

৯. কর ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত। এমন করে ধার্য করা উচিত যাতে প্রয়োজনে করের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সুতরাং যে কর ব্যবস্থা সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা কর এবং উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তা আদর্শ কর ব্যবস্থা।

অনুশীলন : আদর্শ কর ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উপরোক্ত আলোচনার ফলে আপনাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে যে, উত্তম কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ? চলুন তাহলে আমরা এই প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করি।

প্রত্যেক দেশের করনীতির কিছু সাধারণ লক্ষ্য থাকে। যথা –

- রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা।
- মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা ও মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
- অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।
- সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি করা।
- অবাঞ্ছনীয় পণ্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করা।
- জনসাধারণকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা।

এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে আলোকপাত করলে বাংলাদেশের কর কাঠামোকে মোটেই সন্তোষজনক বলা যায় না।

বাংলাদেশের বর্তমান কর কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বা ত্রুটিসমূহ :

কর ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক নয় : বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের কর ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত খুবই কম। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে ১৯৭৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশের কর ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত ছিল ৭.৫ ভাগ ১৯৮০ সালে এ অনুপাত দাঁড়ায় ৮ ভাগ। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের মূল বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১৭১২০ কোটি টাকা। যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.৪ শতাংশ বেশী। একই অর্থ বছরে রাজস্ব বোর্ডের আওতায় কর সমূহ হতে রাজস্ব প্রাপ্তি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩০৪০ কোটি টাকা যা পূববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.৪ শতাংশ বেশী। তথাপি অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের কর ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত অনেক কম।

প্রত্যক্ষ করের অবদান কম : পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর অধিক প্রগতিশীল এবং করভার বন্টনে অনেকটা সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর অধিক নমনীয়। এসব কারণে একটি নির্দিষ্ট দেশের কর কাঠামোতে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের কর কাঠামোতে প্রত্যক্ষ করের অংশ খুবই কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত ৬৪ ভাগ, কানাডায় ৬৬ ভাগ, বার্মার ৫০ ভাগ, সুইডেনে শতকরা ৪৫ ভাগ, সেখানে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করের অংশ মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কার করা হয়েছে। বিভিন্ন বীমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অনিবাসী কোম্পানি সমূহের ক্ষেত্রে আয়করের হার ৪৭.৫০% থেকে হ্রাস করে ৪৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করের কর অব্যাহতি সীমা ৫৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৬০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। রপ্তানী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অগ্রীম আয়করের হার ০.৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বোনাস শেয়ার বিক্রয় লব্দ মূলধন আয়কে সম্পূর্ণরূপে কর অব্যহতি দেয়া হয়েছে। যাদের আয়ের উৎস শুধু কৃষি তাদের ক্ষেত্রে অব্যহতি প্রাপ্ত আয়ের সীমা ১ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীলতা : আমাদের দেশের কর রাজস্বের শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগই পরোক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহিত হয়। পরোক্ষ করের সিংহভাগ আসে বাণিজ্য শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও বিক্রয় করের মত কয়েকটি উৎস হতে। মোট পরোক্ষ করের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ আসে বাণিজ্য শুল্ক ও আমদানীর উপর আরোপিত বিক্রয় কর থেকে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে আমদানী শুল্কের সর্বোচ্চ হার ৫০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। কৃষি, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, হাঁস-মুরগী, বস্ত্র ও পরিবহন খাতে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প উৎসের ব্যবহার করার লক্ষ্যে জেনারেটর ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর উপর শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। নির্মাণ সংস্থা, রপ্তানী শিল্প ও ইট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক দাখিল পত্রের বিধান চালু করা হয়েছে।

করের ভিত্তি যথেষ্ট বিস্তৃত নয় : বাংলাদেশের কর কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে করের ভিত্তি যথেষ্ট বিস্তৃত নয়। উন্নয়নশীল দেশের কর কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, এ সকল দেশের করভার বিভিন্ন খাত ও উৎসের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হয় না। বাংলাদেশের কর কাঠামো পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন খাত ও উৎসের মধ্যে কর ভারের অসম বন্টন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ হলেও মোট কর রাজস্বে কৃষি খাতের অবদান শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ মাত্র।

কর কাঠামো প্রগতিশীল নয় : সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের কর কাঠামো প্রগতিশীল নয়। আমাদের কর ব্যবস্থায় পরোক্ষ করের অনুপাত বেশী থাকায় করের ভার সমাজের দরিদ্র জনসাধারণকেই বেশী বহন করতে হয়। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর কিছুটা প্রগতিশীল হলেও ভূমিকর, সম্পদ কর ইত্যাদির মত কর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অধোগতিশীল। সুতরাং কোন কোন কর এককভাবে প্রগতিশীল হলেও সামগ্রীকভাবে আমাদের কর ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রগতিশীল নহে। এ কারণে আমাদের দেশের করের বোঝা সাধারণ ক্রেতাদেরকেই বেশী বহন করতে হয়।

বিভিন্ন দিক হতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের করের ভিত্তি যেমন-সংকীর্ণ তেমনি কর ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা কম এবং এর প্রশাসনিক কাঠামো খুবই দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কর কাঠামোকে মোটেই শক্তিশালী বলা যায় না।

অনুশীলন : বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার এই ত্রুটিসমূহ কি কাটিয়ে উঠা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন।

বাংলাদেশ সরকারকে মোট জাতীয় আয়ের ৯৭% সংগ্রহ করতে হয় এবং সরকারী বিনিয়োগের ৯৩ শতাংশের দায়িত্ব তার ঘাড়েই বর্তায়। কিন্তু বাংলাদেশের গতানুগতিক জাতীয় আয় ব্যবস্থা খুবই দুর্বল।

----- এর চরিত্র মূলত :

- উচ্চ এবং অসম আমদানী শুল্ক।
- বিভিন্ন খাতে উচ্চ কর ব্যবস্থা।
- যৌথ এবং ব্যক্তিগত আয় কর ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ।

তাই বাংলাদেশ সরকার তার গতানুগতিক কর ব্যবস্থা সংশোধন করার লক্ষ্যে এবং দেশীয় করের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে কর ব্যবস্থাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু কর ব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নতি সাধিত হয় মূলত: ১৯৯১ সালে। এই সময় কর পদ্ধতিতে ভ্যাট সংযুক্ত করা হয়। এই ভ্যাট এর ফলে ১৯৯০ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ যেখানে ৯.৩% ছিল সেখানে ১৯৯৫ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২%। কিন্তু এই হার দক্ষিণ এশিয়ার অন্য যে কোন দেশের তুলনায় কম। শ্রীলংকায় এর পরিমাণ ১৯.৭%, পাকিস্তানে ১৮.৪% এবং ভারতে ১৯.১%। তাই বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ মোট জিডিপি এর ০.৫% হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাকে আধুনিক ও গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং জাতীয় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ যে কোন দেশের রাজস্ব বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ কর মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর বিপরীত। এই বিপরীতমুখী প্রবণতা দূর করে প্রত্যক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে কর রাজস্বের সিংহ ভাগই প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহিত হয়। করভার বন্টনের ক্ষেত্রে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর অধিকতর সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ কর অধিক স্থিতিস্থাপক।

সুতরাং আমাদের কর কাঠামোতে প্রত্যক্ষ করের পরিধি ও ভিত্তি আরও জোড়ালো ও বিস্তৃত করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল নয়। দেশের প্রায় অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত এবং তারা ক্ষমতার দাপটে কর ও অন্যান্য শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ফলে ধনী আরও ধনী হচ্ছে এবং গরীবরা নিঃস্ব হচ্ছে। এই অসাম্য দূর করার লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা আরও প্রগতিশীল হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই ধনী ও দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা, রপ্তানী, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম কৃষি একটি প্রতিশ্রুতিশীল খাত হওয়া সত্ত্বেও রাজস্ব সংগ্রহের দিক হতে এ খাতের অবদান খুবই কম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ। অথচ মোট কর রাজস্বে কৃষি খাতের অবদান মাত্র ৩ থেকে ৫ শতাংশ। তাই কৃষি খাতে আরোপিত আয়কর ও ভূমি রাজস্ব যদি সামগ্রীক অর্থে প্রগতিশীল করা যায় তাহলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় সম্ভব।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশের পরোক্ষ কর ব্যবস্থায়ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। কর রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রয় করা, বাণিজ্য শুল্ক, আবগারী শুল্ক প্রগতিশীল হারে বসানো উচিত। প্রশাসনিক দুর্বলতাহেতু বাংলাদেশ সরকার বাণিজ্য হতে প্রচুর পরিমাণ কর রাজস্ব লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই প্রশাসনিক গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের আমদানী শুল্ক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় কথা হল কর আদায়ে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। তাহলেই উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আদায় সম্ভব।

পঞ্চমতঃ দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি আমাদের সমাজের শাখায় প্রশাখায় বিস্তৃত। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা খুব বেশী। প্রশাসনিক দুর্বলতাহেতু বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ কর ও রাজস্ব আদায়ে বঞ্চিত হয়। এ অবস্থায় আমাদের দেশে একটি দক্ষ, সুষ্ঠু ও শক্তিশালী প্রশাসনিক কর কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসনকে প্রয়োজনে কর আদায়ে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সর্বোপরি বাংলাদেশের ন্যায় একটি অনুন্নত দেশে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথোপযুক্ত করনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। দেশের উৎপাদন, জাতীয় আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি খাত যেন একসঙ্গে বৃদ্ধি পায় অথচ দেশে যাতে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ রেখে সরকারের কর নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আর এ জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপ সমূহ নিঃসন্দেহে গ্রহণীয়।

অনুশীলন : এগুলো ছাড়া আরও অন্য কোন পদক্ষেপ আছে বলে কি আপনার মনে হয়। থাকলে সেগুলো লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। কর কাকে বলে ? উত্তম কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

২। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩। বাংলাদেশের কর কাঠামো কি আপনার মতে সন্তোষজনক। যদি না হয় তবে বাংলাদেশের কর কাঠামোর কি কি পরিবর্তন করা যেতে পারে – তা বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশের কর কাঠামোতে কোন্ করের অংশ খুবই কম –
ক) পরোক্ষ করের	খ) প্রত্যক্ষ করের
গ) মূল্য সংযোজন কর	ঘ) কোনটিই নয়।

২। বাংলাদেশের কর রাজস্বে কৃষির অবদান শতকরা –
ক) ৫ ভাগ	খ) ৬ ভাগ
গ) ৭ ভাগ	ঘ) ২ ভাগ

৩। কোন কর অধিক প্রগতিশীল ও নমনীয়-
ক) প্রত্যক্ষ কর	খ) পরোক্ষ কর
গ) মূল্য সংযোজন কর	ঘ) আয়কর।

৪। মোট সরকারী রাজস্বের কত শতাংশ কর থেকে আসে ?
ক) ৬০ শতাংশ	খ) ৭০ শতাংশ
গ) ৮০ শতাংশ	ঘ) ৯০ শতাংশ

সমস্যা :

ধরুন, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। সরকারী রাজস্বের খুবই শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থায় আপনাকে কর ও রাজস্ব বোর্ডের প্রধান করা হল। বিদ্যমান কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন এবং বর্তমান কাঠামোতে কি কি পরিবর্তন সাধন করবেন তা লিপিবদ্ধ করুন।

পাঠ - ৪ : বাংলাদেশের বাজেট ঃ রাজস্ব ও মূলধনী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাজেটের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজেটের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশের বাজেটের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করতে পারবেন
- রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশের রাজস্ব ও মূলধনী বাজেটের উৎস ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন
- অর্থ বছরের বাজেট সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- এই বাজেটের আয় ও ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা :

বাংলাদেশের বাজেট সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে চলুন আমরা জেনে নেই বাজেট কাকে বলে? মনে করুন আপনার বাবা মাসের প্রথম তারিখে আপনাকে পাঁচশত টাকা দিল ১ মাসের হাত খরচ হিসেবে। টাকাটা হাতে পাওয়ার পর নিশ্চয় আপনি পরিকল্পনা করবেন কিভাবে এই পাঁচশত টাকা ১ মাসে খরচ করবেন। বাজেট আসলে এই পরিকল্পনার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

তদ্রুপ আধুনিক রাষ্ট্রে প্রতিটি সরকারকেই বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে এবং কোন কোন উৎস হতে এই অর্থ সংগৃহিত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। এই লিপিবদ্ধ বিবরণটিই বাজেট নামে পরিচিত। ১৭৩৩ সালে বৃটিশ অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় সর্বপ্রথম বাজেট পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেন। চামড়ার একটি ব্যাগে করে তিনি অর্থ সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে উহা অনুমোদনের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে যেতেন। সেই থেকে বাজেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাজেটে শুধু সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাবই থাকে না; বরং একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও রাজস্বনীতির প্রতিফলন ঘটে। আধুনিককালে বাজেট যেকোন দেশের জন্য অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সংক্ষেপে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত: ১ বছরে সরকারের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও আর্থিক লেনদেনের যাবতীয় বিবরণ যে দলিলে লিপিবদ্ধ তাই বাজেট হিসেবে গণ্য।

এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয়ই আপনারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বাজেট আসলে নিছক সংখ্যাতত্ত্বের দলিল মাত্র নয়। এটিকে আমরা সরকারী আয় ব্যয় সম্পর্কিত মাষ্টার প্লানও বলতে পারি।

বাজেটের গুরুত্ব : এখন চলুন, আমরা বাজেটের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করি। আধুনিক সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের মোক্ষম দলিল হল বাজেট। এ মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনীতিতে নিয়োগ বৃদ্ধি করা। উন্নয়নশীল দেশে কাঙ্ক্ষিত স্তরে বিনিয়োগ পৌঁছানোর জন্য বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পদের কাম্য বন্টনে বাজেটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকার বাজেট প্রণয়নের সময় এমনভাবে উহার কর ও ব্যয়নীতি নির্ধারণ করে যাতে দেশের প্রাপ্ত সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাত হতে উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হয় এবং

দেশের প্রাপ্ত সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এতে করে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভুত হতে পারে না। বাজেটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ হল বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। বাণিজ্যচক্রের তেজীভাবের সময় অতিরিক্ত কর ধার্য ও সরকারী ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার বাণিজ্যচক্রের মন্দাভাবের সময় মুদ্রাসংকোচন দেখা দেয়, ফলে কর্মসংস্থান হ্রাস পায় ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় সরকার ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন ও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্যচক্রের মন্দাভাব দূর করতে পারে। এভাবে বাজেট সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

এখন চলুন বাজেটের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বাজেটের প্রকারভেদ : আয় ব্যয়ের সমতার ভিত্তিতে বাজেটকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

১. সুষম বাজেট
২. অসম বাজেট

সুষম বাজেট : যে বাজেট প্রস্তাবিত আয় ও ব্যায়ের পরিমাণ সমান হয় তাকে সুষম বাজেট বলে। এ নীতি অনুসারে বাজেট প্রণয়ন করলে সরকারের পক্ষে মিতব্যয়ী হওয়া সম্ভবপর হয়। এতে মুদ্রাস্ফীতির কোন আশংকা থাকে না। সুষম বাজেট সমাজে আয় বৈষম্য হ্রাস করে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি করে।

অসম বাজেট : যে বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয় না, তাকে অসম বাজেট বলে। অসম বাজেট আবার দুই প্রকার। যথা –
ক. উদ্বৃত্ত বাজেট
খ. ঘাটতি বাজেট

উদ্বৃত্ত বাজেট : যে বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশী হয় তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

ঘাটতি বাজেট : যে বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী ধরা হয় তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। দেশের কর্মসংস্থান, আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হলে ঘাটতি বাজেট অনুসরণ করা উচিত। অর্থনৈতিক মন্দার সময় ঘাটতি বাজেট এবং সমৃদ্ধির সময় উদ্বৃত্ত বাজেট দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর বজায় রাখা সম্ভব। ঘাটতি বাজেটের ফলে একদিকে যেমন ব্যয় বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তেমনি দেশের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এইসব কারণে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ঘাটতি বাজেটের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের জন্য সুষম বাজেট অপেক্ষা ঘাটতি বাজেট অধিকতর ফলপ্রসূ।

আয়-ব্যয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে বাজেটকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
১. রাজস্ব বাজেট ও
২. মূলধনী বাজেট

রাজস্ব বাজেট : এ বাজেটে সরকারের চলতি বছরের আয় ও ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের হিসাব-নিকাশ উল্লেখ করা হয়। এ বাজেটের দু'টি অংশ

ক. আয়ের উৎস
খ. ব্যয়ের উৎস

আয়ের অংশে সরকারের সম্ভাব্য মোট আয় উল্লেখ করা হয় এবং কোন কোন উৎস হতে এ আয় আসবে তা বর্ণনা করা হয়। মূলত: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, ফি, সরকারী সম্পত্তি প্রভৃতি উৎস থেকে এ আয় হয় এবং তা প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, বেসামরিক প্রশাসন, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ প্রভৃতি খাতে ব্যয় হয়।

মূলধনী বাজেট : সরকার কর্তৃক গৃহিত বার্ষিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব এ বাজেটে দেখানো হয়। পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের অর্থ যে বিভিন্ন দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহিত হবে তাও দেখানো হয়। পরিশেষে মূলধন বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় বলে একে উন্নয়ন বাজেটও বলা হয়।

অনুশীলন : রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট কি একে অপরের পরিপূরক বলে আপনার মনে হয় ?

এবার চলুন বাজেটের শ্রেণী বিভাগকে একটি ছকের মাধ্যমে সাজানোর চেষ্টা করি।

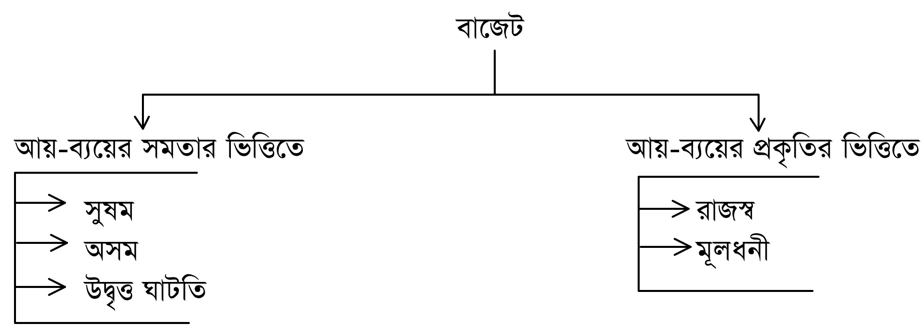

অনুশীলন : বাজেটের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করুন।

বাজেটের শ্রেণী বিভাগ এবং রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা জ্ঞান লাভ করলাম। এবার চলুন একটু দেখা যাক বাংলাদেশের রাজস্ব ও মূলধনী বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো কি কি?

রাজস্ব বাজেট

আয়ের উৎস	ব্যয়ের উৎস
(ক) **কর থেকে প্রাপ্তি**	১. সরকারে অঙ্গ সমূহ
১. বহি: শুল্ক	২. বিচার ব্যবস্থা
২. আবগারী শুল্ক	৩. হিসাব নিরীক্ষা
৩. আয়কর	৪. রাজস্ব সর্ম্পকীয় কাজ
৪. বিক্রয় কর	৫. সচিবালয়
৫. সংযোজন কর	৬. বৈদেশিক বিষয়াবলী
৬. ভূমি রাজস্ব	৭. সাধারণ প্রশাসন
৭. পূরক শুল্ক	৮. পুলিশ ও আনসার
৮. নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প	৯. বাংলাদেশ রাইফেলস্
৯. যানবাহন আয়	১০. সাধারণ কার্যক্রম
১০. রেজিষ্ট্রেশন	১১. প্রতিরক্ষা
১১. মাদক শুল্ক	১২. শিক্ষা
১২. অন্যান্য কর ও শুল্ক	১৩. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
	১৪. অবসর ভাতা
(খ) **কর বর্হিভূত প্রাপ্তি**	১৫. সমাজকল্যাণ কাজ
১. সরকারী আর্থিক প্রতিঃ সমূহ হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১৬. সাধারণ অর্থনৈতিক কার্যাবলী
২. সরকারী অ-বার্ষিক প্রতিঃ সমূহ হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১৭. কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম
৩. সুদ হতে প্রাপ্ত আয়	১৮. শিল্প ও খনিজ
৪. অর্থনৈতিক সেবা	১৯. পানি ও এনার্জি
৫. সাধারণ প্রশাসন ও সেবা	২০. পরিবহন ও যোগাযোগ
৬. যমুনাসেতু সারচার্জ ও লেভী	২১. সাহায্য, মঞ্জুরী ও চাঁদা
৭. টিএন্ডটি বিভাগ	২২. অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ
৮. ডাক বিভাগ	২৩. বৈদেশিক ঋণের সুদ
৯. রেলওয়ে	২৪. অপ্রত্যাশিত ব্যয়।
১০. কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা	
১১. সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	
১২. যোগাযোগ ও পরিবহন	
১৩. অন্যান্য কর বর্হিভূত রাজস্ব	
১৪. মূলধন উদ্ভুত রাজস্ব	
১৫. সেচ, পানি সম্পদ, পরিবহন ইত্যাদি।	

মূলধনীবাজেট

আয়ের উৎস		ব্যয়ের উৎস	
(ক)	**অভ্যন্তরীণ প্রাপ্তি**	১.	কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন
১.	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	২.	পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ
২.	খাদ্য হিসাব থেকে নিট সম্পদ	৩.	শিল্প
৩.	নীট মূলধন প্রাপ্তি	৪.	বিদ্যুৎ
৪.	স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নিজস্ব তহবিল	৫.	প্রাকৃতিক সম্পদ
৫.	নতুন ব্যবস্থা	৬.	পরিবহন ও যোগাযোগ
		৭.	ভৌত পরিকল্পনা পানি সম্পদ ও গৃহায়ন
(খ)	**বৈদেশিক উৎস**	৮.	শিক্ষা, ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
১.	প্রকল্প সাহায্য	৯.	জন প্রশাসন
২.	অপ্রকল্প সাহায্য	১০.	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
৩.	পি এল ৪৮০	১১.	শ্রম ও জনশক্তি
		১২.	জেলা ও থানা অবকাঠামো উন্নয়ন
		১৩.	অন্যান্য।

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট

অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ.এম.এস কিবরিয়া গত **১১**ই জুন **১৯৯৮** তারিখে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে **১৯৯৮-৯৯** অর্থবছরের জন্য ৩৫০ কোটি টাকার নতুন কর ধার্য করে সর্বমোট ৩০ হাজার ৯৬ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে গৃহীত কর কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়ায় **১৯৯৮-১৯৯৯** অর্থবছরে দেশে সকল প্রকার কসমেটিক্স, টয়লেট্রিজ, ঘটি, সিমেন্ট, সিরামিক, মেলামাইন, তৈজসপত্র, সিআইশীট, ফোম, সিগারেট, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্রিজ, এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার, কার্পেটসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, সিকিউরিটি সার্ভিস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পোশাক বিক্রয় কেন্দ্র, ট্রেড সার্ভিস, ট্রাভেল এজেন্সীকে ভ্যাটের আওতায় আনায় এসব খাত থেকে সেবা গ্রহণকারী ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে কম্পিউটার, পলিথিন, প্লাষ্টিক পণ্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পাবে বলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে কৃষি নির্ভর শিল্প, চামড়া শিল্প ও বস্ত্র শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামালের উপর শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। **১৯৯৮-৯৯** সালের প্রস্তাবিত বাজেটে আশ্রয়হীন নারী-শিশুসহ প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে **১৮** কোটি টাকার একটি সামাজিক উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছ। বাজেটে শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করার জন্য একটি সহায়তা কর্মসূচী ও প্রস্তাব করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে যে ৩০ হাজার ৯৬ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেছেন তাতে –

- রাজস্ব খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে **১৫** হাজার ৯ শত ৩৭ কোটি টাকা
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় ধরা হয়েছে **১৩** হাজার ৬ শত কোটি টাকা
- মূলধন খাতে ব্যয় ৭ শত ৬০ কোটি টাকা
- খাদ্য বাজেটে ব্যয় ২ শত ৩৯ কোটি টাকা

এর সাথে ঋণ ও অগ্রীম বাবদ 4 শত 40 কোটি টাকার সমন্বয় করে উল্লেখিত ৩০ হাজার ৯৬ কোটি টাকার সামগ্রীক ব্যয় কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে রাজস্ব খাত থেকে আয় ধরা হয়েছে ২০ হাজার ৭ শত ৭৬ কোটি টাকা এই হিসেবে সামগ্রীক বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৯ হাজার ৩শত ২০ কোটি টাকা। তাই বাজেটে নিম্নলিখিত খাত থেকে ঘাটতি পূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- অতিরিক্ত বাজেটারী সম্পদ থেকে ১শত ৮৪ কোটি টাকা।
- টিএন্ডটি বন্ড থেকে ১৫০ কোটি টাকা
- প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব থেকে ৩ হাজার ৩ শত ৯৩ কোটি টাকা
- মেয়াদী ঋণ বাবদ ৩শত ১৪ কোটি টাকা।
- অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ৩ হাজার ৪ শত ১৩ কোটি টাকা
- দশিক সাহায্য খাত থেকে ৫ হাজার ৯ শত ৭ কোটি টাকা

প্রস্তাবিত বাজেট আগামী অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়নি। তবে অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৬ শতাংশ ভাগে গিয়ে দাঁড়াবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে সর্বাধিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে ৪ হাজার ৫ শত ৯৬ কোটি ১৪ লাখ টাকা।

শিক্ষার্থীরা এখন চলুন আমরা বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের রাজস্ব ও মূলধনী বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়েরখাতগুলো আলাদা আলাদা ভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করি।

রাজস্ব বাজেট

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব খাত থেকে সর্বমোট আয় ধরা হয়েছে ২০ হাজার ৭ শত ৭৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে –

- কর খাত থেকে আসবে ১৬ হাজার ৬ শত ১৭ কোটি টাকা।
- কর বহির্ভূত খাত থেকে আসবে ৪ হাজার ১ শত ৫৯ কোটি টাকা

কর খাত থেকে প্রাপ্ত টাকার-

- হাজার ৭ শত কোটি টাকা আসবে জাতীয় রাজস্ববোর্ডের আওতাধীন কর থেকে এবং বাকী
- শত ১৭ কোটি টাকা আসবে রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কার্যক্রম থেকে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর থেকে ৫ হাজার ৫০ কোটি টাকা, আমদানী শুল্ক থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক থেকে ২ হাজার ৭ শত কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ভ্যাট এর আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ৯ শত ৩৭ কোটি টাকা। এই আয় ও ব্যয়ের হিসাব সমন্বয়ের পর রাজস্ব উদ্বৃত্ত দাঁড়াবে ৪ হাজার ৮ শত ৩৯ কোটি টাকা।

উন্নয়ন বাজেট

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ১৩ হাজার ৬ শত কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মোট অর্থের ৬ হাজার ২ শত ১৮ কোটি টাকা সংস্থান করা হবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এবং বাকি ৭ হাজার ৩ শত ৮২ কোটি টাকা সংস্থান করা হবে বৈদেশিক সাহায্য খাত থেকে।

অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে

- রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে ৪ হাজার ৮ শত ৩ কোটি টাকা
- অভ্যন্তরীণ মূলধন থেকে ১ হাজার ২ শত ৮৪ কোটি টাকা

- টিএন্ডটি বন্ড থেকে ১শত ৫০ কোটি টাকা
- স্বায়ত্তশাসিত নিজস্ব সম্পদ থেকে ১ শত ৮৪ কোটি টাকা
- খাদ্য বাজেট থেকে ২শত ৩৯ কোটি টাকা সংস্থান করা হবে।

বৈদেশিক উৎসের মধ্যে

- প্রকল্প সাহায্য থেকে ৫ হাজার ৮ শত ২ কোটি টাকা
- পণ্য সাহায্য থেকে ৮ শত ৯৪ কোটি টাকা
- খাদ্য সাহায্য থেকে ৬ শত ৮৬ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

এডিপি-তে নিম্নলিখিত খাতগুলোতে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ব্যয় বরাদ্ধ করা হয়েছে –

- সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্ধ করা হয়েছে স্থানীয় সরকার খাতে ২ হাজার ২৫ কোটি টাকা।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ খাতে ১ হাজার ৯ শত ৮২ কোটি টাকা।
- সড়ক ও রেলপথ খাতে ১ হাজার ৬ শত ৪৩ কোটি টাকা।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে দেয়া হয়েছে ৯ শত ২১ কোটি টাকা।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা খাতে দেয়া হয়েছে ১ হাজার ৩ শত কোটি টাকা।

এক নজরে ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট

সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রম.	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	
নং		১৯৯৮-৯৯	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৭-৯৮
১	রাজস্ব প্রাপ্তি	২০,৭৭৬	১৮,৭৭৭	১৯,৬২৪
	বাদ ঃ ব্যয়	১৫,৯৩৭	১৪,৫০০	১৪,৫৪৪
২	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৪,৮৩৯	৪,২৭৭	৫,০৮০
	যোগ ঃ বৈদেশিক মঞ্জুরী	২,৯৯০	২,৮৮৬	২,৯৮৭
	উপমোট	৭,৮২৯	৭,১৬৩	৮,০৬৭
৩	বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তি	৪,৩৯২	৩,৮১৮	৩,৮৩০
	উপমোট	৪,৩৯২	৩,৮১৮	৩,৮৩০
৪	অভ্যন্তরীণ মূলধন বৃদ্ধি (হ্রাস)	১,২৮৪	১,১৬২	৫৬৭
		১৫০	১১১	১৫০
	উপমোট	১,৪৩৪	১,২৭৩	৭১৭
৫	অভ্যন্তরীণ সম্পদ	০	০	২৬৫
	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থযোগান	১৮৪	১৭০	১৭৫
	মোট সম্পদ প্রাপ্তি সম্পদের ব্যবহার	১৩,৮৩৯	১২,৪২৪	১৩,০৫৪
৬	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	১৩,৬০০	১২,২০০	১২,৮০০
	খাদ্যের জন্য নীট ব্যয় বরাদ্দ	২৩৯	১৯৯	২১৬
	নতুন এডিপি প্রকল্প	০	২৫	৩৮
	উপমোট	১৩,৮৩৯	১২,৪২৪	১৩,০৫৪

(সূত্র ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ)

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, আজকের বিশ্বায়িত অর্থ ব্যবস্থায় উট পাখির মত মাথা গুজে থাকা সম্ভব নয়। আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময় অতিক্রম করছি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এশিয়ার অর্থনৈতিক বির্পযয়ের অশনি সংকেত এখনও বিলীন হয়ে যায়নি। আমাদের লোকসানকারী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ রূপকথার মৃত পাখির মত আমাদের গলায় অভিশাপ হিসেবে ঝুলে আছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব-বাণিজ্যের তীব্র

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এসব সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন করে টেকসই উন্নয়নের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই আমরা বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে তাল মিলাতে পারব।

অনুশীলন : বাংলাদেশে **১৯৯৮-৯৯** এর জাতীয় বাজেটে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন। উল্লিখিত বাজেটে বিশেষ অর্জনগুলো কি কি? বাজেটে প্রাক্কলনগুলোর সাথে অর্জনসমূহের তুলনা করুন। কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা থেকে থাকে তাহলে এর কারণ ব্যাখ্যা করুন। **১৯৯৮-৯৯** এর পরবর্তী অর্থ বছরগুলোর বাজেটও একইভাবে পর্যালোচনা করুন। বর্তমান অর্থ বছরের বাজেটে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের বাজেটের সাথে কি কি মৌলিক বিষয় যোগ হয়েছে তা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। বাজেটের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। বাজেটের শ্রেণী বিভাগ করুন এবং এর প্রত্যেকটির বর্ণনা দিন।

৩। রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট কাকে বলে ? বাংলাদেশের রাজস্ব ও মূলধনী বাজটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো লিখুন।

৪। **১৯৯৮-৯৯** অর্থবছরের বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। যে বাজেট ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশী তাকে-
ক) উদ্বৃত্ত বাজেট বলে　　খ) ঘাটতি বাজেট বলে
গ) সম্পূরক বাজেট বলে　　ঘ) সুষম বাজেট বলে

২। অর্থনৈতিক মন্দার সময় কোন বাজেট দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর বজায় রাখা যায়-
ক) উদ্বৃত্ত বাজেট　　খ) ঘাটতি বাজেট
গ) সম্পূরক বাজেট　　ঘ) কোনটি নয়

৩। উন্নয়নশীল দেশের জন্য কোন বাজেট বেশী উপযোগী ?
ক) সুষম বাজেট　　খ) উদ্বৃত্ত বাজেট
গ) রাজস্ব বাজেট　　ঘ) ঘাটতি বাজেট

৪। আয়-ব্যয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে বাজেটকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
ক) সুষম ও অসম বাজেট　　খ) উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেট
গ) কোনটাই নয়

সমস্যা :

ধরুন, কোন অর্থবছরে একটি সরকার তার উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫০৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং তার রাজস্ব আয় ৯৫০০ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ৩৫০০ কোটি টাকা। এখন বলুন –

ক) সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কত ?
খ) সরকার কিভাবে ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ করবে।
গ) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে কোন উপায়ে ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ করা উচিত।
ঘ) সরকারের রাজস্ব উদ্বৃত্ত আছে কি ? যদি থাকে তবে তার পরিমাণ কত ?
ঙ) যদি সরকারী শুল্ক ২% হ্রাস করা হয়। তবে সরকারী আয়-ব্যয়ে তার কি প্রভাব পড়ে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরমালা

পাঠ- ১	ঃ	১ (ক)	২ (খ)	৩ (ঘ)	৪ (খ)
পাঠ- ২	ঃ	১ (গ)	২ (খ)	৩ (ক)	৪ (খ)
পাঠ- ৩	ঃ	১ (খ)	২ (ক)	৩ (ক)	৪ (গ)
পাঠ- ৪	ঃ	১ (ক)	২ (খ)	৩ (ঘ)	৪ (গ)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থা

ইউনিট ১০

ভূমিকা

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের শীর্ষে অবস্থান করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অন্যান্য সকল ব্যাংকের কার্যাবলীর সার্বিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত। এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য অর্জন, সরকারের মুদ্রানীতি কার্যকর করা এবং আন্তর্জাতিক লেনদেন পরিচালনা করার জন্য ব্যাংকের দুটি বিভাগ আছে – ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ।

১৯৭২ সালে দেশের ব্যাংকিং খাতের ৮টি বিদেশী ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়। সাম্প্রতিককালে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেয়া সরকারের মৌল নীতি। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার ১৯৮৩ সাল হতে বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দানের নীতি গ্রহণ করেছে। সরকারের এ নীতির প্রতি সাড়া দিয়ে বেসরকারী খাতে বেশ কিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতি বছরই নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া জাতীয়কৃত দুটি ব্যাংক সরকার বেসরকারীকরণ করেছে।

বাংলাদেশে কতগুলি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক শর্তে ঋণদান করে।

বীমা খাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতকে জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা ব্যবসা পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সরকারী খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ডাকঘর জীবন বীমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ধারণা পাওয়ার জন্য নিচে কার্যরত ব্যাংকগুলোর তালিকা দেয়া হল :

১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক :** বাংলাদেশ ব্যাংক

২. **বাণিজ্যিক ব্যাংক :**

   ক. সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক : সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংক।

   খ. বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক : পূবালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ, আই. এফ. আই. সি লিঃ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ, ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ, এন. সি. সি. ব্যাংক লিঃ, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ, বেসিক ব্যাংক লিঃ, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক

লিঃ, সোশ্যাল ইনভেষ্টম্যান্ট ব্যাংক লিঃ, আনসার ভিডিপি ব্যাংক লিঃ, সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ।

গ. বিদেশী ব্যাংক : আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ, স্টান্ডার্ড ব্যাংক, এ. এন. জেড. গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, পি এল সি, ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ, হাবিব ব্যাংক লিঃ, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, সিটি ব্যাংক এন. এ, সোসাইটি জেনারেল (দি ব্যাংক), হানিল ব্যাংক, স্কশিয়া ব্যাংক।

৩. **বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান :** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ, গৃহনির্মাণ ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক।

পাঠ - ১ : বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১০.১.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ তিন কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের সবটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। অতএব এটি সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানায় পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ আছে। একজন গভর্নর, দুজন ডেপুটি গভর্নর ও আটজন পরিচালক নিয়ে এ পর্ষদ গঠিত। ব্যাংকের গভর্নর পদাধিকার বলে এ পর্ষদের সভাপতি। গভর্নর তিন বছরের জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। সরকার ইচ্ছা করলে মেয়াদ শেষে তাঁকে পুনঃনিয়োগ দিতে পারেন। ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরগণও সরকার কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত হন। ব্যাংকের কাজকর্ম পরিচালনায় একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আছে। এ কমিটির সদস্যগণ হলেন গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরগণ ও পরিচালকদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া ও রংপুরে এর ১টি করে স্থানীয় শাখা আছে। ঢাকায় মতিঝিল ও সদরঘাটে ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একে কয়েকটি বিভাগে সংগঠিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইস্যু বিভাগ, ব্যাংকিং বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ, কৃষি ঋণদান বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, গবেষণা বিভাগ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ বিভাগ, গণসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ প্রভৃতি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ কার্যক্রম দুটি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ দুটি হল ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগ। ইস্যু বিভাগের দায়িত্ব হল দেশে নোট ইস্যু সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা ও ব্যাংকিং বিভাগের দায়িত্ব হল দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং কার্যাবলী পরিচালনা করা।

১০.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হল :

১. **নোট প্রচলন :** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর প্রধান কাজ হল নোট প্রচলন করা। নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যূনতম রিজার্ভ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ নীতি অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংককে মোট কাগজী নোট ইস্যু করার বিপরীতে কমপক্ষে ৬০ কোটি টাকার সমমূল্যের সোনা, রূপা ও অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের ইস্যু বিভাগে জমা রাখতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০০, ১০০, ৫০, ২০, ১০ ও ৫ টাকার নোট প্রচলন করে। পক্ষান্তরে ১ ও ২ টাকার নোট দুটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ইস্যু করে থাকে। এ জন্য ১ ও ২ টাকার নোটকে সরকারী নোট ও অবশিষ্ট প্রকার নোটকে ব্যাংক নোট বলে।

২. **সরকারের ব্যাংক :** বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংকে সরকারের যাবতীয় অর্থ জমা থাকে এবং এ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। এ ব্যাংক সরকারকে বিনা সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। প্রয়োজনবোধে সরকারকে আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দেয়। এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।

৩. **অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার :** বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকে ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ তফসীলভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণদান ও অন্যান্য কার্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি তফসীলভুক্ত ব্যাংক তাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে অথবা প্রথম শ্রেণীর বিল ভাঙ্গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৪. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণের পরিমাণ ও খাতসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কখনও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কখনও হ্রাস করার দরকার হয়। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে যেমন, ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলা বাজার নীতি, রিজার্ভ হারের পরিবর্তন ইত্যাদি।

৫. **ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল :** কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের প্রয়োজন হলে অন্যান্য ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে পারে। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট থেকে যখন ঋণ পাওয়া যায় না তখন ঋণের একমাত্র উৎস থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক এদের বিনিময় বিল ও প্রতিপত্র পুনঃবাট্টাকরণ করে ঋণ করে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

৬. **বৈদেশিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশী টাকার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনীয় (Managed floating) পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়। বিনিময় হার যেন অন্যান্য দেশের বিনিময় হারের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক থাকে সেদিকে বাংলাদেশ ব্যাংককে নজর রাখতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় (Foreign exchange) ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় হারকে প্রভাবিত করতে পারে। বিনিময় হারের অতিমূল্যায়ন ঘটলে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় অবমূল্যায়ন করে নতুন বিনিময় হার নির্ধারণ করে।

৭. **নিকাশ ঘর :** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহকগণ চেকের মাধ্যমে লেনদেন করার ফলে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনাপাওনার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক নিকাশ ঘর হিসেবে ঐসব পারস্পরিক দেনাপাওনা মিটিয়ে দেয়।

৮. **উন্নয়নমূলক কার্যাবলী :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের দরকার হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

৯. **অন্যান্য কাজ :** উপরিউক্ত কাজ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক অথনৈতিক বিষয়ে গবেষণা করা, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান তৈরি করা, ব্যাংক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একটি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে এই ব্যাংকের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। কতগুলো বিভাগের মাধ্যমে এর কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম কাজ হল (১) নোট প্রচলন, (২) সরকারের ব্যাংক, (৩) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার, (৪) ঋণ নিয়ন্ত্রণ, (৫) ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল, (৬) বৈদেশিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, (৭) নিকাশ ঘর, (৮) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ও (৯) অন্যান্য কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট প্রচলন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে ব্যাংকের –
ক. ইস্যু বিভাগ　　খ. ব্যাংকিং বিভাগ
গ. হিসাব রক্ষণ বিভাগ　　ঘ. সংস্থাপন বিভাগ

২. নিচের কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ ?
ক. ঋণের শেষ আশ্রয় স্থল　　খ. নিকাশ ঘর
গ. নোট প্রচলন　　ঘ. উপরের সব কটি

৩. নিচের কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ নয় ?
ক. নোট প্রচলন　　খ. সরকারের ব্যাংকার
গ. ব্যক্তিকে বা কোম্পানীকে ঋণ দান　　ঘ. উন্নয়নমূলক কাজ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের গঠনপ্রণালী সংক্ষেপে লিখুন।
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পাঠ - ২ : বাণিজ্যিক ব্যাংক : সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে বলতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের কারণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১০.২.১ বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক জনসাধারণের এক অংশের নিকট থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং অন্য এক অংশকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদের আমানতের উপর সুদ প্রদান করে এবং ঋণ গ্রহীতাদের নিকট থেকে ঋণের উপর অধিক হারে সুদ আদায় করে। এই উভয়ের পার্থক্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফা। বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা।

১০.২.২ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হল :

১. **আমানত গ্রহণ :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা। এই ব্যাংক সাধারণত তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে, যথা – চলতি আমানত, সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত। চলতি আমানতের অর্থ আমানতকারী যে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণে তুলতে পারে। এ আমানতের উপর সাধারণতঃ কোন সুদ দেয়া হয় না। সঞ্চয়ী আমানতের টাকা সপ্তাহে এক বা দুইবার তোলা যায় এবং এর উপরে অল্পহারে সুদ দেয়া হয়। স্থায়ী আমানতের অর্থ আমানতের মেয়াদ শেষে তোলা যায় এবং এর উপর অধিক হারে ও বিভিন্ন মেয়াদের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ দেয়া হয়।

২. **ঋণদান :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হল ঋণ দেয়া। আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ রেখে বাকী অংশ জনগণকে ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক এইভাবে সঞ্চয়কারী এবং তহবিল ব্যবহারকারীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে এবং আর্থিক মধ্যস্থতার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

৩. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি :** বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীদের চেক ইত্যাদি দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে করে থাকে। এই সমস্ত সহজ ও নিরাপদ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টির ফলে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়।

৪. **অর্থ স্থানান্তর :** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার ইত্যাদির মাধ্যমে মক্কেলদের অর্থ এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরে সাহায্য করে।

৫. **আমানত সৃষ্টি :** বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে থাকে। ব্যাংক তার ঋণ গ্রহীতাকে নগদ ঋণ না দিয়ে ঋণ গ্রহীতার হিসাবে ঋণের অর্থ জমা রাখে। ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজন অনুসারে সেই হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে টাকা তুলে নেয়। এভাবে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে।

৬. **বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য :** বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যয়পত্র খুলে এবং বিদেশী ক্রেতাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৭. **মূলধন গঠন :** বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের নিকট ছড়িয়ে থাকা অলস অর্থ একত্রিত করে সঞ্চয়ে সাহায্য করে। সঞ্চয়ের উপর সুদ দিয়ে সঞ্চয় উৎসাহিত করে। এভাবে ব্যাংক মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

৮. উপরোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের জন্য নিম্নলিখিত কাজ করে থাকে :

   ক. মক্কেলদের মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র, শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদি নিরাপদে গচ্ছিত রাখে।

   খ. অছি হিসেবে মক্কেলদের সম্পত্তির দেখাশোনা ও পরিচালনা করে।

   গ. মক্কেলদের পক্ষে বাড়ীভাড়া আদায় করে, প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ, পেনশন ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০.২.৩ বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। নিচে এই কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. **বাজার অর্থনীতি :** বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি বাজারমুখী অর্থনীতি। এখানে সরকারী খাতের ভূমিকা কম বেসরকারী খাতের ভূমিকা বেশি। এই নীতির প্রেক্ষাপটে বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

২. **প্রতিযোগিতা সৃষ্টি :** প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন দক্ষ হয়। ব্যাংকের সংখ্যা কম হলে অলিগোপলি বাজারের সৃষ্টি হয়। ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্য বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

৩. **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দক্ষতা হ্রাস :** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে নানা কারণে সেবার মান হ্রাস পায়। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়ম দেখা দেয়। ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দেখা দেয়। ফলে অনেক ঋণ কুঋণে পরিণত হয়। ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে উগ্র শ্রমিক সংঘের কার্যকলাপের জন্য ব্যাংকের কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৪. **আমলাতান্ত্রিক মনোভাব :** সরকারী ব্যাংকের কর্মচারীরা সরকারী চাকুরে হওয়ায় তাদের মধ্যে সেবামূলক মনোভাবের বদলে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দেখা দেয়। এজন্য গ্রাহক সেবার মান কমে যায় এবং বেসরকারী খাতে ব্যাংক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সার সংক্ষেপ

যে ব্যাংক অল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে গ্রাহকগণকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হল : ১. আমানত গ্রহণ, ২. ঋণ দান, ৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি, ৪. অর্থ স্থানান্তর, ৫. আমানত সৃষ্টি, ৬. বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করা ও ৭. মূলধন গঠন।

সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতেও ব্যাংক স্থাপনের কিছু কারণ রয়েছে। যেমন, বাজারমুখী অর্থনীতির প্রসার, ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দক্ষতা হ্রাস ও ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে বুঝায় –
   ক. যে ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্য করে
   খ. যে ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে
   গ. যে ব্যাংক বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়
   গ. যে ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণদান করে

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হল –
   ক. দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
   গ. আমানত সৃষ্টি করা ঘ. সরকারকে পরামর্শ দেয়া

৩. বেসরকারী খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের একটি যুক্তি হল –
   ক. এর ফলে ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বাড়বে
   গ. এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে
   গ. এর ফলে ব্যাংকিং খাতে অনেক লোকের চাকুরি হবে
   ঘ. এর ফলে ব্যাংক পরিচালকদের ঋণ পাওয়া সহজ হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক বলতে কি বুঝ?
২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

পাঠ - ৩ : বিশেষ ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের বিশেষ ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা

সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিশেষ গ্রাহকদের অর্থায়নের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশেষ ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এসব প্রতিষ্ঠান ভর্তুকি বিতরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে, আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেনি। এসব প্রতিষ্ঠানের তহবিলের প্রায় সবটাই সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বাইরের উৎস থেকে আসে। নিচে এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষিখাতের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঋণদানের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক। কৃষি ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩৭.৬১ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের সবটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। এই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার ভার ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জমি বন্ধক রেখে কৃষকদের কৃষি উপকরণ ক্রয়, ভূমির উন্নয়ন, শস্য উৎপাদন, কৃষি বিষয়ক কুটির শিল্প স্থাপন, কৃষিযন্ত্র ক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। কৃষি ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণ করে এবং আমানতের উপর অন্যান্য ব্যাংক অপেক্ষা শতকরা ১ ভাগ অধিক হারে সুদ দেয়।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কিছু সমস্যা রয়েছে। এর বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম, ঋণদান পদ্ধতি সাধারণ কৃষকদের জন্য জটিল এবং দীর্ঘসূত্রিতামূলক।

২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

দেশের প্রতিটি বিভাগের জন্য পৃথক কৃষি ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৮৬ সালের ৯ই জুলাই রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক গঠন করেন। ১৯৮৭ সালের ১৫ই মার্চ থেকে রাজশাহী কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। রাজশাহী বিভাগের আওতায় কৃষি ব্যাংকের সকল সম্পত্তি, দায়দেনা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যাংকের কার্যাবলী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনুরূপ।

৩. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক শিল্পখাতের ঋণদানের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা। এই মূলধনের ৫১% সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। বাকি ৪৯% মূলধন বাংলাদেশী নাগরিক অথবা দেশী বা বিদেশী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান থেকে আসতে পারে। এই ব্যাংক পরিচালনার ভার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ নয় জন পরিচালক বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক নতুন শিল্প স্থাপন এবং পুরাতন শিল্প কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই ঋণ দেয়। এই ব্যাংক স্থানীয় ও বৈদেশিক উভয় মুদ্রায় ঋণ দেয়। এই ঋণ সর্বাধিক ২০ বছরের জন্য দেয়া হয়।

শিল্প ব্যাংক চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণও দেয়। তাছাড়া শিল্প প্রকল্পের বিনিয়োগ-পূর্ব ও বিনিয়োগ-উত্তর অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে থাকে। সর্বোপরি এ ব্যাংকে অন্যান্য ব্যাংকের মত সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলীও সম্পাদন করে।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক দেশের শিল্পের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই ব্যাংকের কিছু অসুবিধা রয়েছে। ব্যাংক কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতা ও অসাধুতার জন্য সঠিকভাবে ঋণ বিতরণে অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে ব্যাংকের বহু পরিমাণ ঋণ অনাদায়ী ঋণে পরিণত হয়। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়ে।

৪. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা বাংলাদেশের শিল্পখাতের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঋণদানের জন্য একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৬২.৫৪ কোটি টাকা যার সবটাই সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। এই সংস্থা পরিচালনার জন্য ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ ৮ জন পরিচালক বিশিষ্ট একটি পরিচালক বোর্ড রয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা সরকারী ও বেসরকারী খাতে নতুন শিল্প স্থাপন ও বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিককালে এই সংস্থা নিজস্ব তালিকাভূক্ত শিল্প প্রকল্পসমূহের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এ সংস্থা শিল্পোন্নয়ন, গবেষণা ও শিল্প সম্পর্কিত পরামর্শ দেয়।

৫. বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা

বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের পরিমাণ ও ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। সংস্থার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব একজন চেয়ারম্যানসহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

এই সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শেয়ার বিনিয়োগকারীদের হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণ, মিউচুয়াল ফান্ডের বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা, ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় ও তার বিবরণ প্রণয়ন এবং স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।

৬. বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা

বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা বাংলাদেশের শহর অঞ্চলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণের জন্য ঋণদানের জন্য গঠিত একটি সংস্থা। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। এর সবটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। একজন মহাপরিচাক ও ৬ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালকমন্ডলী দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা দু'ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে :

ক. একতলা আবাসিক বাড়ী নির্মাণের জন্য সাধারণ ঋণ এবং

খ. বহুতলা বাসভবন নির্মাণের জন্য বিশেষ ঋণ।

এই সংস্থার ঋণের পরিমাণ, সুদের হার এবং পরিশোধের মেয়াদ শহর ভেদে বা বাড়ীর আয়তন ভেদে পার্থক্য হয়।

৭. গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংক। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। তবে এর পরিমাণ সরকারের অনুমতি নিয়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এই মূলধনের ২৫% সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এবং অবশিষ্ট মূলধন ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে ১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালকমন্ডলীর উপর।

গ্রামীণ ব্যাংক দেশের দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়। যে সব কৃষকের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.৫ একরের কম তারা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়। এই ব্যাংকের ঋণের জন্য কোন সম্পদ জামানত দিতে হয় না। তবে ঋণ পেতে হলে কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে একটি দল গঠন করতে হয়। এই যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে জামানত হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকের সদস্যদের দলগতভাবে সঞ্চয় করতে হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক ছোট ব্যবসা, পরিবহণ, পশুপালন, মাছের চাষ, কৃষিকাজ ও যৌথ কর্মকান্ডের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক নিয়মিত ঋণের তদারকী করে এবং ঋণ দরিদ্র জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের কাজের ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষক বিশেষতঃ দরিদ্র মহিলাগণ উপকৃত হয়েছেন। এই ব্যাংক প্রমাণ করেছে যে, দরিদ্র ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার, ঋণ ব্যবহারের এবং চুক্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা রাখে। গ্রামীণ ব্যাংকের এই সাফল্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পাঠ - ৪ : বাংলাদেশের বীমা ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বীমা কি তা বলতে পারবেন ;
- বীমার শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন ;
- বীমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.১ বীমা

মানুষের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক জীবনে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দেখা যায়। একজন ব্যক্তি আগামীকাল অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে বা মৃত্যুবরণ করতে পারে। একটি ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার দর পড়ে যেতে পারে, কাঁচামালের সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে, রপ্তানি বিঘ্নিত হতে পারে ইত্যাদি। বীমা মানুষকে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এসব ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করে। কারণ বীমা কোম্পানি মানুষের বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। বীমা আসলে একটি চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী বীমা গ্রহীতা বীমাকারীকে প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং এর পরিবর্তে বীমাকারী কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে এর ফলে বীমা গ্রহীতার যে ক্ষতি হয় সেজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত এ চুক্তিকে বীমা বলে।

১০.৪.২ বীমার শ্রেণীবিভাগ

বীমাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন – জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা। মানুষের জীবনের উপর গৃহীত বীমাকে জীবন বীমা বলে। বীমাকারী বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বীমাকৃত টাকা প্রদান করে। যে বীমা চুক্তি অনুযায়ী বীমাকারী বীমা গ্রহীতার কোন সম্পদের ক্ষতি হলে বীমাগ্রহীতাকে বীমাকৃত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাকে সাধারণ বীমা বলে। যেমন, নৌবীমা, অগ্নি বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, মোটর যান বীমা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষতি হলে বীমা গ্রহীতা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হয়।

১০.৪.৩ বীমার গুরুত্ব

নিচে বীমার গুরুত্ব আলোচনা করা হল :

১. মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আয় ও ব্যয় একরূপ হয় না। মানুষের অবসর জীবনে আয় কম হয়। কোন পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা গেলে বা দুর্ঘটনার ফলে কর্ম ক্ষমতা হারালে ঐ পরিবারের আয় কমে যায়। ছেলেমেয়ের উচ্চ শিক্ষা বা বিয়ের সময় হঠাৎ বেশি টাকা দরকার হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বীমা মানুষের জীবনের ঝুঁকিগ্রহণ করে মানুষের জীবনকে সহজ করে।

২. কোন ফার্ম পণ্য উৎপাদন, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, বন্টন প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। বীমাকারী ব্যবসায়ীর ঝুঁকি নিজের উপরে নিয়ে ব্যবসায়ীকে ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করে। এর ফলে ব্যবসায়ী নিশ্চিতভাবে ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

৩. বীমা মানুষকে সঞ্চয়ী হতে বাধ্য করে। বীমার অর্থ বীমা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ফার্মে বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্য অধিকাংশই সমুদ্র পথে আনা নেয়া হয়। সমুদ্রপথ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। বীমার ফলে ঝুঁকির পরিমাণ কমে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

১০.৪.৪ বাংলাদেশের বীমাখাত

বাংলাদেশে বীমাখাতে জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা উভয় প্রকার বীমাই রয়েছে। জীবন বীমা প্রদান করে ৬টি বীমা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ বীমা প্রদান করে ২১টি বীমা প্রতিষ্ঠান। বীমাখাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সরকারী খাতের গুরুত্ব বেশি। সরকারী বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমার জন্য, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমার জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন। এ দু'টো প্রতিষ্ঠান দেশের বীমাখাতের ৯০% সম্পদের মালিক। বাংলাদেশের বীমাখাত সার্বিকভাবে অনুন্নত। বীমাখাত দেশের অর্থনীতিতে আর্থিক মধ্যস্থতা ও সম্পদের বন্টনে উল্লেখযোগ্য রাখতে তেমন সফল হয়নি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

ইউনিট ১১

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। বর্তমানে দেশের লোকসংখ্যা ১১.৬ মিলিয়ন। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ছোট পরিসরে এতো বিশাল আয়তনের জনসংখ্যা আজ দেশের 'এক নম্বর সমস্যা" হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৫৭%।
১৯৬১ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির একটি তালিকা নিম্নে দেখানো হলো :

এক নজরে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও হার

সন	জনসংখ্যা মিলিয়ন	জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইল	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১৯৫১	৪২.০০	৭৬১ জন	০.১২%
১৯৬১	৫০.৮৪	৯২১ "	২.১২%
১৯৭৪	৭১.৪৭	১২৮৬ "	২.৮৭%
১৯৮১	৯৬.০০	১৬১৭ "	২.৩৬%
১৯৯১	১০৮.০০	১৯৪৭ "	২.১৭%
১৯৯৩	১১১৪.০০	৮৭০ " (বর্গ কিঃ মিঃ)	

এই অনুচ্ছেদে আপনারা যা যা পড়বেন :

পাঠ ১ : ম্যালথাসের জনসংখা তত্ত্ব ;
পাঠ ২ : কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ;
পাঠ ৩ : তত্ত্বসমূহের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও বৃদ্ধির কারণ ;
পাঠ ৪ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিশ্লেষণ ;
পাঠ ৫ : জনাধিক্যের চাপ — অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের উপর।

পাঠ ১ : ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, বাংলাদেশে কি জনাধিক্য দেখা দিয়েছে? বা বাংলাদেশ কি অতি জনবহুল দেশ? প্রশ্নটি জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রচলিত দুটি তত্ত্বের মাপকাঠিতে আপনারা বিচার করতে পারেন। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে ঐ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হলো :

ভূমিকা

ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন অর্থনীতিবিদ এবং ধর্মযাজক। তিনি সর্বপ্রথম জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন যেখানে জনসংখ্যা বিষয়ে তাঁর মতবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর মতবাদটিতে তিনি মোট ছয়বার পরিবর্তন এনে প্রকাশ করেন। তাঁর তত্ত্বের সর্বশেষ পরিমার্জিত সংস্করণ বের হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭২ সালে। ম্যালথাস তাঁর তত্ত্বের জন্য ধর্মতাত্ত্বিক ও মার্কসবাদীদের দ্বারা ঘৃণিত হন। তবে জনসংখ্যা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অদ্যাবধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- খাদ্য এবং জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্যমূলক তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়েছে।
- খাদ্যের উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপকে রোধ করার উপায় বের করা হয়েছে।
- জন্মহার সীমিত রেখে মানুষ তার মৌলিক চাহিদাগুলো পাওয়ার উপায় বের করেছে।

বিষয়বস্তু

ম্যালথাস বলেন, খাদ্যের উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায়। তার মতে খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (Arithmetic rate) এবং নিয়ন্ত্রণ করা না হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (Geometric rate)। গাণিতিক এবং জ্যামিতিক হারে প্রবৃদ্ধির ধারা নিম্নে আপনাদের দেখানো হলো :

গাণিতিক হার : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,৭, ৮ ইত্যাদি ;
জ্যামিতিক হার : ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি।

এখানে আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন যে, গাণিতিক হারের চেয়ে জ্যামিতিক হার দ্রুত গতিসম্পন্ন। জ্যামিতিক হার চক্রবৃদ্ধি সুদ ব্যবস্থার মতো। মূলধনের সুদও সময়মত মূলধনে পরিণত হয় এবং সেটার সুদও একাউন্টে হয় জমা। ঠিক তেমনি আজকের শিশুরাও আগামীতে বাবা-মা হবে এবং তাদের ঘরে আসবে আরো শিশু। নিয়ন্ত্রণ করা না হলে হয়তো জন্ম নেবে আরো অধিক সংখ্যায়।

এভাবে ম্যালথাস বলতে চান যে, জ্যামিতিক হার গাণিতিক হারকে অতিক্রম করে চলে। অর্থাৎ বার্ষিক জন্মহার বার্ষিক খাদ্য উৎপাদনকে অতিক্রম করে চলবে। তারপর? তারপর তিনটি সম্ভাব্য অবস্থার সৃষ্টি হবে যার প্রতিটি অবস্থাই মৃত্যুহারকে দেবে বাড়িয়ে। এগুলো হলো : ক্ষুধা, ব্যাধি এবং যুদ্ধ। ম্যালথাসের মতে এগুলোই হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক নিরোধ (positive checks) ব্যবস্থা।

এবং আপনারা দেখবেন, এই প্রাকৃতিক নিরোধ ব্যবস্থাগুলো জনসংখ্যাকে এমন একটা সংখ্যায় কমিয়ে আনবে যে জনসংখ্যা উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণের সঙ্গে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ম্যালথাস মনে করেন যে, মানুষ যৌন চাহিদা দ্বারা এমনই ভাবে চালিত যে, সে প্রজনন ক্ষমতানুযায়ী সন্তান জন্ম দেবার প্রবণতা দেখায়। তিনি প্রথম দিকে যুক্তি দেখাতেন যে, সব অবস্থাতেই মানুষের জন্মহার একই থাকবে এবং কেবল মৃত্যুর হারই জন্মহার প্রবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তিনি তখন মনে করেছিলেন যে মানুষ হয়তো স্বেচ্ছায় সন্তান জন্মদান করবে না বা জনসংখ্যা সীমিত করবে না। তিনি আরো বলেন যে, যদি খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পায়, তা হলে তা বরং আরো অধিক সন্তানের জীবনধারণে করবে সহায়তা। ফলে জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। এতে আবার পুনরায় খাদ্যের উপর চাপ চড়বে। পুনরায় দেখা দেবে খাদ্যের অভাব।

পরবর্তীতে ম্যালথাস পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত তত্ত্বে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, জন্মহার সীমিত করে মানুষ ইচ্ছা করলে ক্ষুধা, ব্যাধি এবং যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। এজন্য তিনি প্রাকৃতিক নিরোধের পরিবর্তে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive checks) গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি অবশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জনসংখ্যাকে সীমিত করে এমন কোন পন্থাকে অনৈতিক বলে উল্লেখ করেন এবং এর পরিবর্তে জন্মহার হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিলম্বে বিবাহ (lare marriage) করাকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করেন।

সমালোচনা :

ম্যালথাসের এই তত্ত্বটি নানানভাবে সমালোচিত হয়েছে। নিম্নে আপনাদের সামনে তা তুলে ধরা হলো :

১. ম্যালথাস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করা না গেলে প্রাকৃতিক নিরোধ অর্থ্যাৎ ক্ষুধা, ব্যাধি এবং যুদ্ধ বৃদ্ধি পাবে। ম্যালথাসের সময় থেকে অদ্যবধি এই তিনটি প্রাকৃতিক নিরোধ বাড়েনি। বরং ক্ষুধা ও ব্যাধি নিবারণে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

২. ম্যালথাসের সময়ে খাদ্যের অভাবে যে মৃত্যুহার ছিল তা আজ অনেক হ্রাস পেয়েছে। তিনি চিন্তাও করতে পারেনিনি খাদ্যের উৎপাদন এতোটা বৃদ্ধি পাবে। কেননা কৃষি উৎপাদন বিগত একশত বছরে ২/৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি পদ্ধতিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান হার সম্পর্কে ম্যালথাস ভাবতেও পারেন নি।

৩. আধুনিক যুগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের এমন অনেক ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়েছে, যা ম্যালথাসের জানা ছিলনা। অথচ প্রতিরোধমূলক এবং প্রতিকারমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনেক ব্যবস্থা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

৪. ম্যালথাস কেবল জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের সম্পর্ক নিয়েই বেশী চিন্তা-ভাবনা করেছেন। অথচ, তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে তেমনি চিন্তা-ভাবনা করেননি। এটা চিন্তা করলে তিনি হয়তো বলতেন প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে বরং আরো জনশক্তি বা শ্রমের প্রয়োজন হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে তা হবে সহায়ক।

অনুশীলনী

১. আপনার কাছে ম্যালথাসের তত্ত্বের কোন্ অংশটি বর্তমান সময়োপযোগী মনে হয় না –

সারাংশ

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ম্যালথাসের তত্ত্বটি হলো একটি জন-বিকাশের তত্ত্ব। কারণ কোন একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে জনসংখ্যা কিভাবে বাড়ে এবং এই বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কিভাবে প্রভাবিত করে তাই ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু। এ তত্ত্বে দেশের খাদ্য যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে বলে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিস্থিতি হল জনাধিক্যের প্রধান লক্ষণ। সর্বোপরি এ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে আমরা ম্যালথাসকে একজন হতাশবাদী হিসেবে দেখতে পাই। কারণ তাঁর তাছে অধিক জনসংখ্যা মাত্রই মানবজাতির জন্য একদিকে ত্রাস এবং নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। কিন্তু তারপরও বর্তমানে বিশ্বে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুটা হলেও অনেকেই ম্যালথাসের তত্ত্বটি বিশ্বাস করছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরটির পার্শ্বে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

১. ম্যালথাসের তত্ত্বের কোন্ পদ্ধতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়?

ক. ২, ৪, ৮, ১০, ১৪ ইত্যাদি
খ. ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি
গ. ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি
গ. ২, ৪, ৬, ৮ ১০ ইত্যাদি

২. ম্যালথাসের তত্ত্বের কোন্ পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়?

ক. ১, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি
খ. ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি
গ. ১, ৪, ৭, ৮, ১০ ইত্যাদি
ঘ. ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি

৩. ম্যালথাসের মতে কি উপায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে?

ক. মানুষের দ্বারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা
খ. প্রাকৃতিক নিরোধ ব্যবস্থা
গ. প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা
ঘ. কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে

পাঠ ২ : কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

ভূমিকা

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি নতুন তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা বাঞ্চনীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। কাম্য জনসংখ্যার চিন্তা গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর চিন্তায়ও লক্ষ করা যায়। তবে আধুনিক যুগে যুলিয়াস উলফ তত্ত্বটির যুক্তিভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

উদ্দেশ্য

- ♦ জনসংখ্যাকে কিভাবে সম্পদ ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে জানতে পারবেন ;
- ♦ জনসংখ্যার সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে প্রক্রিয়া জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

এই তত্ত্ব অনুযায়ী, কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে লোকের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। কাম্য জনসংখ্যা দ্বারা এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যা দেশের সব প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে সর্বাধিক উৎপাদন করতে পারে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. কাম্য জনসংখ্যা বলতে বুঝায় আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা। আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা সেটাই যে জনসংখ্যা কোন দেশের সম্পদ ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

২. কাম্য জনসংখ্যার লক্ষ্য হলো সর্বাধিক উন্নতি বা সমৃদ্ধি আনয়ন। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে কাম্য জনসংখ্যা বলতে এমন এক জনসংখ্যার কথা বলা হয় যেখানে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক।

৩. কাম্য জনসংখ্যা বলতে বুঝায় এমন জনসংখ্যা যাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। অর্থাৎ, যে জনসংখ্যা জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটাতে এবং স্বচ্ছল জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানে সক্ষম সেটাই কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব।

৪. সমাজতাত্ত্বিকভাবে বলা যায়, কাম্য জনসংখ্যা বলতে এমন এক জনসংখ্যা বুঝায় যা কোন সমাজের কম অথবা বেশী জনসংখ্যার ক্রটিমুক্ত এক "আদর্শ" জনসংখ্যা। একথা সহজেই অনুমেয় যে কোন সমাজের জনসংখ্যার সম্পদ ও সুযোগের তুলনায় কম হলে ঐ সম্পদ ও সুযোগের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য জনশক্তির অভাব দেখা দেবে। অপরপক্ষে সম্পদ ও সুযোগের তুলনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যার অর্থ হলো ক্ষুধা ও ব্যাধিগ্রস্ত জনসংখ্যা।

কাম্য জনসংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করা যায় :

কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের অবশ্য সুক্ষ্ম মাপকাঠি নেই। তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিচার করা হয়। যথা :

১. কার্ম জনসংখ্যায় থাকবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

২. সম্পদ ও সুযোগকে কাজে লাগাতে জনশক্তির অভাব হবে না।

৩. উদ্যোমী এবং দীর্ঘায়ুসম্পন্ন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক জনসংখ্যা।
৪. সর্বাধিক আয় এবং উন্নত জীবনযাত্রা সম্পন্ন এক জনগোষ্ঠী।
৫. আধুনিক সভ্যতার সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম এমন জনসংখ্যা।

সমালোচনা :

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি ত্রুটিবিহীন না। নিম্নে এই তত্ত্বের সমালোচনা আলোচনা করা হলো :

১. তত্ত্বটি একটি আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে মাত্র, তবে তত্ত্বটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনমৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়না।

২. কাম্য বা আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা একটি অস্পষ্ট ধারণা। কেননা, সর্বাধিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সর্বাধিক আয়, উন্নত জীবনযাত্রা এ সবই আপেক্ষিক প্রত্যয়। কোন্ সমাজের তুলনায় কোন্ সমাজ সর্বাধিক আয় বা উন্নততর জীবনের নিশ্চয়তা দিয়ে তা কাম্য জনসংখ্যায় রূপ নেবে?
উন্নত জীবনের মাপকাঠিই বা কি? কোন্ পর্যায়ের উন্নত জীবন সমাজের কোন্ শ্রেণী আকাঙ্ক্ষা করবে? কাম্য জনসংখ্যার ধারণাটি তাই বেশ খানিকটা অস্পষ্ট।

৩. কোন দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সম্পদ ও সুযোগের প্রেক্ষিতে কোন্ জনসংখ্যাকে কাম্য বলে আখ্যা দেয়া হয়। কিন্তু কোন নতুন প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কারের ফলে এ সম্পদ ও সুযোগ বেড়ে যেতে পারে।

অনুশীলনী :

১. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে সমাজের কোন্ দিকটির প্রতি জোর দেয়া হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

সারাংশ

বস্তুত, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে মানবজাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে নৈরাশ্যমূলক ধারণা পাওয়া যায় কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে তা দূর করে এক নতুন আশার বাণী প্রচার করা হয়। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী যদি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে উৎপাদন বৃদ্ধিও চলতে থাকে তাহলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি পেলেও এতে আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকবে না। এদিক দিয়ে বিচার করলে আধুনিককালে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি একটি আশাবাদী তত্ত্ব হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে কিভাবে সমাজকে দেখানো হয়েছে ?
ক. সম্পদ এবং সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারকারী উন্ন সমাজ ;
খ. জনসংখ্যা সমৃদ্ধশালী সমাজ ;
গ. খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ;
ঘ. যে সমাজে জন্মহার মৃত্যুহার সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য কি?
ক. অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা ;
খ. জন্মহার-মৃত্যুহারকে কমিয়ে আনা ;
গ. একটি উন্নত অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো তৈরী করা ;
ঘ. জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা।

পাঠ ৩ : তত্ত্বসমূহের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও বৃদ্ধির কারণ

ভূমিকা

ম্যালথাস তত্ত্বের আলোকে খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে (১, ২, ৩, ৪, ...) এবং জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ...) বৃদ্ধি পায়। ফলে, খাদ্যের ওপরে জনসংখ্যার চাপ অবশ্যাম্ভাবী। তাঁর মতে এর প্রতিকার বা প্রতিরোধ করা না গেলে প্রকৃতিই এর সমাধান দেবে। ম্যালথাসের এই তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশকে "অতি জনবহুল" দেশ বলে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি।
অপরদিকে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, কোন দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে কোন জনসংখ্যাকেই অবশ্য অতিরিক্ত জনসংখ্যা বলা চলে না। এরই প্রেক্ষিতে আপাতদৃষ্টিতে যদিও বাংলাদেশকে কাম্য জনসংখ্যার দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি তারপরও দেশে বিদ্যমান দারিদ্র, বেকারত্ব বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে এটি কাম্য জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যে পড়ে না।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- ম্যালথাস ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামো তৈরী করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা কাঠামো তৈরীর মধ্য দিয়ে এর সমস্যা ও সমাধান বের করে আনতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ম্যালথাসের তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো :

ম্যালথাস তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা

১. বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। খাদ্য হার যেখানে ১% সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ২.২% হারে। এর ফলে প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতি দেখা যাচ্ছে এবং তা আশানুরূপ কমছে না।

২. ক্রমবর্ধমান হারে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কৃষি ভূমির উপর চাপ পড়ছে। ফলে পরিবার প্রতি বা মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন আপনারা সকলেই দেখবেন সরকারকে আর সিলিং করে পরিবার প্রতি জমির পরিমান কমিয়ে আনতে হবে না। কেননা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এমনিতেই পরিবারের সব জমি উত্তরাধিকারীদের মধ্য ভাগ হতে হতে কমে আসছে।

৩. ম্যালথাসের তত্ত্বের আলোকে বলা যায় যে, যেহেতু বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুহার বেশী তাই দেশটি অতি জনবহুল দেশই বটে।

৪. দেশে যে হারে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে হারে দেশের সীমিত সুযোগ-সুবিধা এবং সীমিত উন্নয়নের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে উন্নয়নের সামান্য জর্জরিত ফল নিমিষেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ও যেতে থাকবে।

৫. ম্যালথাস ভবিষ্যদ্বানী করে বলেছিলেন, কোন দেশে জনাধিক্য দেখা দিলে সে দেশ যদি তা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিবে যা হতো কিছুটা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। ম্যালথাসের এই ভবিষ্যদ্বানী বাংলাদেশে মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা

কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের আলোকে বিচার করে বাংলাদেশকে অনেকেই অতি জনবহুল দেশ বলতে চান না। এর কারণ হলো :

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশী হলেও মৃত্যু সংখ্যা একেবারে কমে যায়নি। তাই জনসংখ্যা মৃত্যুর হার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে বৈকি।

২. গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কিছুটা অন্তত বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিক দিন মজুরের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিপণ্যের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যদিও চাকুরীজিবীদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি দ্রব্যমূল্যের প্রেক্ষিতে তা বেশ কম।

৩. প্রায়ই বলা হচ্ছে যে, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের মওজুত যা আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ঐ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার শুরু না হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। তাই বাংলাদেশ অতি জনবহুল দেশ বলে আখ্যা পাবে না।

কিন্তু আসলে কি তাই? বস্তুত বাংলাদেশকে অতি জনবহুল দেশ না বলার কোনই কারণ নেই, কেননা –

১. দারিদ্র্য, জরা-ব্যাধি, পুষ্টিহীনতা, বেকার সমস্যা এবং সর্বোপরি জীবনযাত্রার নিম্নমান বিচারে এদেশকে অতি জনবহুল দেশ বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

২. যদিও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি ঐ আয়ের ক্রয় ক্ষমতা কি বেড়েছে? তাই প্রকৃত আয় বাড়েনি। উল্লেখ্য যে, আমাদের চাকুরিজীবিদের বেতন জাতীয় স্কেলে দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় স্কেলের বেতনের অর্থ দিয়ে আন্তর্জাতিক মূল্যেই আমরা প্রায় সবকিছু ক্রয় করছি। তাই জীবনযাত্রার মান নিম্ন।

৩. যে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা বলা হচ্ছে তার প্রকৃত খতিয়ানই বা কোথায়? কিভাবে, কতদিনে তা ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যাবে, কত লোকের জন্যই বা তা যথেষ্ট হবে তার হিসাব আছে কি? বস্তুত, একটা কল্পনার ওপর নির্ভর করে বলা যায় না যে, বাংলাদেশ অতি জনবহুল নয়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

কোন দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ঐ দেশের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকার উর্বরতা, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্পায়ন প্রভৃতি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অধিক ঘনত্বের জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলো কম-বেশী দায়ী।

১. **ভূ-প্রকৃতি :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের মূলে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব যথেষ্ট। আমাদের দেশে অধিকাংশ ভূমি সমতল ও উর্বর। সমতল ভূমি চাষাবাদ, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, যাতায়াত প্রভৃতিকেই সুবিধাজনক। এসব কারণেই এদেশে লোকবসতি ঘন।

২. **জলবায়ু :** জনসংখ্যার ঘনত্বের মূলে জলবায়ুর প্রভাব সর্বাধিক। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের আধিক্যের মূলে অনুকূল জলবায়ু কাজ করছে। আমাদের দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও মৃদুভাবাপন্ন। জলবায়ুর এই অবস্থা বসবাসের জন্য অধিক উপযোগী বলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী।

৩. **ভূমিক উর্বরতা :** ভূমির উর্বরতা কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত। ভূমির এই উর্বরতার উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে। যেহেতু উর্ধ্ব সমভূমি এলাকা জীবনযাপনের জন্য বেশী সুবিধাজনক। সুতরাং পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি নদীর অববাহিকায় উর্বর সমভূমিতে অতিরিক্ত লোক বাস করে থাকে। এ কারণেই বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী।

৪. **আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার, অথচ লোকসংখ্যা ১১.৬ কোটি। এতো অল্প সময়ে আয়তন বিশিষ্ট ভূখন্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই বেশী।

৫. **বৃষ্টিপাত :** বৃষ্টিপাত চাষাবাদকে সহজতর করে। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এই পরিমিত ও নিশ্চিত বৃষ্টিপাত বাংলাদেশের কৃষিকাজকে সহজ করে তুলেছে। এটাও বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের অন্যতম কারণ।

৬. **সেব ব্যবস্থা :** বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইরি প্রজেক্ট ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। ফলে এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী।

৭. **উচ্চ জন্মহার :** বাংলাদেশের আয়তন ও প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জন্মহার খুব বেশী। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এই ক্ষুদ্র আয়তনের ভূখন্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. **মৃত্যুহার কম :** বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ ও আধুনিক উন্নতমানের চিকিৎসার ফলে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে এবং মানুষের গড় আয়ুও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯. **শিল্পোন্নয়ন :** শিল্পে সমৃদ্ধ অঞ্চলে লোকবসতি ঘন হয়। কারণ যে অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে সে অঞ্চলে লোক বসতি ঘন হয়। তাই ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ জেলাগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশী।

১০. **যাতায়াতের সুবিধা :** উন্নতর সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে। বাংলাদেশের ভূমি সমতল বলে অতি অল্প সড়ক তৈরী করা যায়। তাছাড়া নদীপথে যোগাযোগ সহজ ও যাতায়াত খরচ কম। এইসব কারণে বাংলাদেশের সব জায়গাতেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী।

১১. **কৃষিকার্য :** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। খুব অল্প পরিশ্রমে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয় বলে তারা সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধিতে নিরুৎসাহিত হয় না। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুশীলনী :

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার জন্য কোন্ তত্ত্বটি বেশী কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?
২. বাংলাদেশকে কিভাবে আপনি অধিক জনবহুল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করবেন?

সারাংশ

প্রায় ১২ কোটি জনসংখ্যার এই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিকার দিক দিয়ে একেবারে নুয়ে পড়েছে। বর্তমানে ১.৫৭% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে গবেষণায় দেখা গেছে ২০১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম সারির দশটি মেগাসিটির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই ভয়াবহ ভবিষ্যতকে সামনে রেখেও এখন পর্যন্ত জন্মহারকে কিছুটা হ্রাস করানো ছাড়া আর কোন ফলপ্রসু পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান হারে দরিদ্রতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান, খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব ইত্যাদি নানারকম সমস্যার পেছনে আছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এসব কারণেই জনসংখ্যা সমস্যাকে আমাদের দেশে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. আপনার মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন্ কারণটি বেশী প্রকট বলে মনে হয় –
ক. উচ্চ জন্মহার   খ. ভূ-প্রকৃতি
গ. ভূমিকা উর্বরতা   ঘ. কৃষিকাজ

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যার কোন্ বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে –
ক. জনসংখ্যার তুলনায় ভৌগোলিক আয়তন ছোট
খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মৃত্যুর হারের চেয়ে বেশী
গ. শহর এবং গ্রামের জনসংখ্যার পরিমাণের অসামঞ্জস্যতা
ঘ. অধিক জনসংখ্যার এই দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিশ্লেষণ

ভূমিকা

যে কোন দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর উহার প্রভাব আলোচনা করতে হলে সেই দেশের জনসংখ্যার গঠন প্রকৃতির এবং উহার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতির সার্বিক তথ্য জানতে পারবেন ;
- জনসংখ্যার কাঠামোর সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনা করতে পারবেন ;
- সর্বোপরি, সার্বিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নিম্নে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন ও কাঠামোগত বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো :

১. **জনসংখ্যার আয়তন :** বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন হলো ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে তা পৃথিবীর মোট ভূখন্ডের ৩০০০ ভাগের মাত্র একভাগ অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ এশিয়ার পঞ্চম এবং পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। ১৯৯৩ সালের আদমশুমারীতে দেশের লোকসংখ্যা ১১.৬ কোটি এবং বৃদ্ধির হার বার্ষিক ১.৫৭। এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী ২০১৫ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের অপর ১০টি মেগাসিটির একটি অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. **স্ত্রী ও পুরুষ হিসেবে জনসংখ্যার বন্টন :** বাংলাদেশে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ লোকের সংখ্যা বেশী। বাংলাদেশে মহিলা ও পুরুষের অনুপাত ১০০ : ১০৬ ; অর্থাৎ ১০০ জন মহিলার স্থলে ১০৬ জন পুরুষ আছে। বাংলাদেশে মহিলার সংখ্যা কম হওয়ার প্রধান কারণ হলো নারীর অধিক মৃত্যু হার। নিম্নে মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা হিসেবে জনসংখ্যা বন্টনের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

তালিকা : নারী ও পুরুষের সংখ্যা

সাল	পুরুষ	নারী	মোট জনসংখ্যা
১৯৬১	২,৬৩,৪৮,৮৪৩	২,৪৪,৯১,৩৯২	৫,০৮,৪০,২৩৫
১৯৭৪	৩,৭০,৭১,৭৪০	৩,৪৪,০৭,৩৩১	৭,১৪,৭৯,০৭১
১৯৮১	৪,৬২,৯৫,০০০	৪,৩৬,১৭,০০০	৮,৯৯,১২,০০০
১৯৯১	৫,৫৫,৭৯,০০৩	৫,২৪,১৩,৯৩৭	১০,৭৯,৯২,৯৪০

৩. **গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বন্টন :** কোন দেশের গ্রাম ও শহর অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা বন্টনের চিত্র হতে সেই দেশের অর্থনৈতিক মান নির্ণয় করা যায়। সাধারণত

উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশ সমূহে মোট জনসংখ্যার বেশীর ভাগই শহরে বাস করে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, প্রভৃতি দেশে শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ লোক শহরে বাস করে। পক্ষান্তরে ভারত, মায়ানমার, বাংলাদেশের মতো প্রভৃতি অনুন্নত ও কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে মাত্র ২২ ভাগ লোক শহরে বাস করে। বর্তমানে বাংলাদেশের বড় বড় বিভাগীয় শহরগুলোতে অস্বাভাবিক জনাধিক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ২০০০ সাল নাগাদ ঢাকা শহর মেগাসিটি অর্থাৎ এর লোক সংখ্যা ১০০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে।

তালিকা : গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যা বন্টন

বৎসর	গ্রাম	শহর	মোট
১৯৬১	৯৪.৮%	৫.২%	১০০.০০
১৯৭৪	৯১.২%	৮.৮%	১০০.০০
১৯৮১	৮৪.৮%	১৫.২%	১০০.০০

৪. **বয়স অনুপাতে জনসংখ্যার বন্টন :** কোন দেশের উৎপাদন ক্ষমতা সেই দেশের কর্মক্ষম লোকের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বয়স অনুসারে লোকের শ্রেণীবিভাগের ফলে দেশের মোট জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির অনুপাত জানা যায়। সাধারণত অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কাজ করতে পারে না বলে তাদেরকে শ্রমশক্তির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। আমাদের দেশে ১৫ বৎসরের নীচে ছেলেমেয়ে এবং ৬০ বৎসরের উর্ধ্বে বয়স্ক ব্যক্তিরা উপার্জনক্ষম নহে। এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার এই শ্রেণীই প্রায় অর্ধেকেরও বেশী যাদের পরনির্ভরশীল বলে তুলনা করা হয়।

তালিকা : বয়স অনুসারে লোকসংখ্যা বন্টন

বয়স	১৯৬১ (শতকরা হার)	১৯৭৪ (শতকরা হার)	১৯৮০ (শতকরা হার)
০ – ১৪	৪৫.৮	৪৭.৫	৪৬.৫
১৫ – ৫৯	৪৮.৫	৪৬.৩	৪৭.৪
৬০ – তদুর্ধ্ব	৫.৭	৬.২	৬.১
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৫. **পেশাগতভাবে জনসংখ্যা বন্টন :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার $\frac{১}{৩}$ অংশ বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত আছে এবং বাকী $\frac{২}{৩}$ অংশ অন্যের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ৩৮.৭ ভাগ শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছে।

তালিকা : পেশাগত বন্টন (শতকরা হার)

বৎসর	কৃষি শ্রমশক্তি	অ-কৃষি শ্রমশক্তি	মোট

	(শতকরা)	(শতকরা)	
১৯৬১	৮৩.০	১৭.০	১০০.০
১৯৭৪	৭৭.০	২৩.০	১০০.০
১৯৮১	৬১.৩	৩৮.৭	১০০.০

৬. **ধর্মের ভিত্তিতে :** বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। এদেশে শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান। এছাড়া হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের লোকও কিছু কিছু বাস করে।

তালিকা : ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বন্টনের শতকরা হার

বৎসর	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খৃষ্টান	অন্যান্য
১৯৬১	৮০.৪	১৮.৫	০.৭	০.৩	০.১
১৯৭৪	৮৫.৪	১৩.৫	০.৬	০.৩	০.২
১৯৮১	৮৬.৬	১২.১	০.৬	০.৩	০.৪

৭. **জন্মহার ও মৃত্যুহার :** বাংলাদেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশী। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি হাজারে জন্মহার হলো ৩৫ জন এবং প্রতি হাজারে মৃত্যুহার হলো ১৩ জন। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে এই তুলনায় জন্মহার ও মৃত্যুহার খুবই কম। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

তালিকা : জন্মহার, মৃত্যুহার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

দেশ	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা)
যুক্তরাষ্ট্র	১৫	৯	০.৬
কানাডা	১৬	৭	০.৯
জাপান	১৪	৬	০.৮
অষ্ট্রেলিয়া	১৫	৭	০.৮
ফ্রান্স	১৫	১০	০.৫
ভারত	৩৪	১৪	২.০
নেপাল	৪৪	২০	২.৪
বাংলাদেশ	৩৫	১৩	২.২

৮. **শিক্ষিতের হার :** বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার খুবই কম। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। ১৯৯৩ সালের জরিপে বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ৩২ জন।

তালিকা

দেশ	শিক্ষিতের হার (শতকরা)	দেশ	শিক্ষিতের হার (শতকরা)
যুক্তরাষ্ট্র	৯৮	শ্রীলংকা	১০০

যুক্তরাজ্য	৯৯	মায়ানমার	৬০
জাপান	৯৮	ভারত	৩৬
ফ্রান্স	৯৭	বাংলাদেশ	৩২

৯. **নির্ভরশীলতার হার :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার নির্ভরশীলতার হার অনেক বেশী। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী পরনির্ভরশীল বা অনুৎপাদনশীল।

তালিকা

দেশ	নির্ভরশীলের হার (শতকরা)	দেশ	নির্ভরশীলের হার (শতকরা)
যুক্তরাষ্ট্র	৩৫	ভারত	৪৩
যুক্তরাজ্য	৩৭	মায়ানমার	৪৪
জাপান	৩২	পাকিস্তান	৪৯
কানাডা	৩৪	বাংলাদেশ	৫২

অনুশীলনী :

১. বাংলাদেশে স্ত্রী-পুরুষ হিসেবে জনসংখ্যার বন্টন কি ধরনের? গ্রাম শহরের মধ্যে এ বন্টনের কোন ভিন্নতা দেখা যায় কি?

সারাংশ

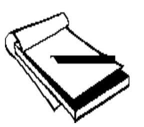

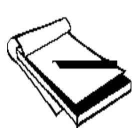

বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন-প্রকৃতি ও কাঠামোগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এটি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা যেমন বেশী তেমনি গুণগত দিক থেকেও এদেশের জনশক্তির দক্ষতা নিম্নমানের। সুতরাং, বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন-প্রকৃতি ও গুণগত মান নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে বিভিন্নভাবে ব্যাহত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নে সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. সাম্প্রতিক জরিপের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত –
   ক. ২.২% খ. ১.৫৭%
   গ. ২.১০% ঘ. ১.৮৫%

২. ঢাকা শহর কত সাল নাগাদ বিশ্বের মেগাসিটিগুলোর অন্যতম হবে –
   ক. ২০১০ সাল খ. ২০১৫ সাল
   গ. ২০০০ সাল ঘ. ২০০৫ সাল

৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যার কোন্ অংশ শ্রমশক্তি হিসেবে বেশী ভূমিকা রাখে –
   ক. পুরুষ শ্রমশক্তি
   খ. নারী শ্রমশক্তি
   গ. সক্ষম ও প্রাপ্ত বয়স্ক আত্মনির্ভরশীল শ্রমশক্তি
   ঘ. মুসলমান শ্রমশক্তি

৪. জনসংখ্যার কাঠামোগত দিক থেকে বিশ্বের কোন্ দেশটি সর্বাপেক্ষা উন্নত –
   ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. যুক্তরাজ্য
   গ. কানাডা ঘ. অষ্ট্রেলিয়া

পাঠ ৫ : জনাধিক্যের চাপ - অন্নবস্ত্র, শিক্ষা চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের উপর

ভূমিকা :

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট অবস্থা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। একদিকে স্বল্প আয়তনের ভূখন্ডে প্রায় ১২ কোটি জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এই দেশে মানুষ তার মৌলিক চাহিদা অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। মানুষ নিজের সৃষ্ট সমস্যাতে নিজেই সমস্যার বেড়াজালে জড়িয়ে গেছে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার স্বরূপ জানতে পারবেন।
- মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রাপ্তির সমস্যা জেনে তা পূরণের উপায় জানতে পারবেন।
- এর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা প্রাপ্তির পরিস্থিতি জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যার চাপে বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশের সার্বিক মৌলিক চাহিদার অবস্থা নিম্নে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো :

১. খাদ্য :

বর্তমানে বাংলাদেশে জনাধিক্যের ফলে প্রথম এবং প্রধান যে সমস্যা প্রকট হয়ে আছে তা হলো দেশের লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি। অধিক জনসংখ্যার কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের অসমবন্টন প্রভৃতি কারণেই বাংলাদেশের এই খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী পর্যালোচনা করলে খাদ্যের মতো এই মৌলিক চাহিদার বর্তমান অবস্থার ভয়াবহতা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯৮১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষাবাদযোগ্য ভূমির গড় পরিমাণ ০.৩৮ একর, ১৯৯১ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাড়ায় ০.১৯ একর। অর্থনীতিবিদদের মতে মাথাপিছু ন্যূনতম খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন গড়ে ১.৬৮ একর হতে ২ একর চাষাবাদযোগ্য ভূমি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে একজন লোকের ন্যূনতম স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দৈনিক ২৫ আউন্স খাদ্যের প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশে গড়ে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ মাত্র ১৫ আউন্স। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী আমাদের ২৩ লাখ ৭০ হাজার নতুন জনসংখ্যা সংযোজিত হয় তাদের জন্য বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজন ৩ লাখ ৫০ হাজার টন।

উপরোক্ত তথ্যাবলী হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতির শেষ নেই। শুধুমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন নয়, খাদ্যের গুণগতমানও বাংলাদেশে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে যেখানে ৩০০০ ক্যালরি শক্তিকে ন্যূনতম দৈনিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেখানে এদেশের গ্রামবাংলার যে কোন আয়ের লোকদের পক্ষের ৩০০ ক্যালরি শক্তি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

১৯৮১-৮২ সালের জাতীয় পুষ্টি জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৭৬টি পরিবারই প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয়ে সক্ষম।

প্রভাব :

খাদ্যের মতো মৌল চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্টি হয় পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, শিল্পায়নের মন্থর গতি ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়। খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। ফলে অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। উৎপাদন ক্ষেত্রে খাদ্য ঘাটতির প্রভাব নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

খাদ্য ঘাটতির প্রভাব

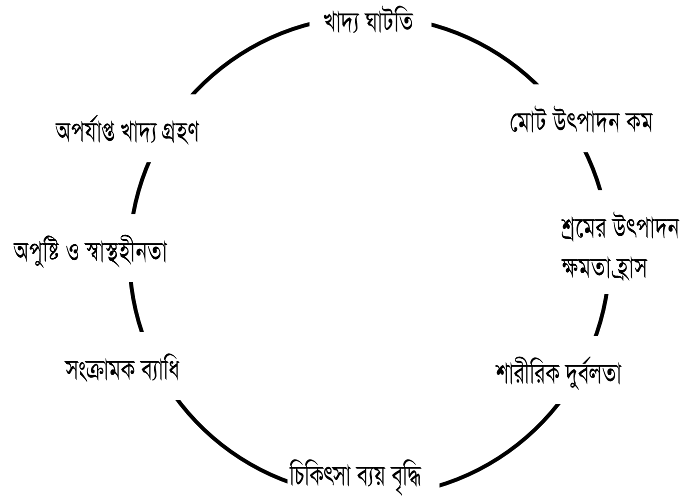

[উৎস : বাংলাদেশের অর্থনীতি : উন্নয়ন সমস্যা ও সমাধান — মোঃ আযম আজাদ]

২. বস্ত্র :

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামাজিকতা রক্ষা এবং প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। অধিক জনসংখ্যার চাপে আজও বাংলাদেশ বস্ত্রের মৌলিক সরবরাহ নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রয়োজন মেটাতেই মাথাপিছু আয়ের ৭৫% ভাগ ব্যয় করা হয় এবং বস্ত্রখাতে ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ১০% ভাগ। মাথাপিছু বার্ষিক গড়ে ১০ মিটার কাপড়ের ব্যবহার ধরা হলে জনসংখ্যা অনুযায়ী বর্তমানে ১০০ মিটার কাপড়ের প্রয়োজন।

বার্ষিক মাথাপিছু কাপড়ের গড় ব্যবহার

সন	নতুন কাপড়/মিটার	পুরাতন কাপড়/মিটার
১৯৮৫/৯৬	৯.১	২.৭
১৯৮৬/৮৭	৮.১	১.৮
১৯৮৭/৮৮	৯.৩	১.০
১৯৮৮/৮৯	৯.৯	০.২
১৯৮৯/৯০	১০.৫	০.৩

[BBS. 1992P-308]

উপরোক্ত তথ্য হতে বাংলাদেশে বস্ত্র সমস্যার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। এটি একটি সমষ্টিগত অবস্থার ব্যাখ্যা। যদি ব্যষ্টিক পর্যায়ে বস্ত্রের বাস্তব অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে আরো হতাশাজনক চিত্র পাওয়া যাবে। বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ পুরাতন

কাপড় বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে। যদিও আমাদের দেশে বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে তারপরও অধিক জনসংখ্যার জন্য এটি তেমন কিছুই না।

৩. শিক্ষা :

শিক্ষা মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম কৌশল। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ অন্যান্য মৌল চাহিদা পূরণের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়না। বাংলাদেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী এদেশে শিক্ষিতের শতকরা হার ২৪.৮২ ভাগ। আদমশুমারীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে সাত বছর বয়েসের উপরের জনসংখ্যার শতকরা ৩২.৪ ভাগ শিক্ষিত বলে দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে শহরে ৫৭ ভাগ এবং গ্রামে ২৮ ভাগ শিক্ষিত। বাংলাদেশে প্রতি বছর যে হারে স্কুল উপযোগী শিশু কিশোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হতে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারীর চূড়ান্ত রিপোর্টের আলোকে বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো :

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৭৯ লাখ শিশুর জন্য প্রয়োজন।
খ. প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন পৌনে দুই কোটি শিশুর জন্য।
গ. নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন ৮০ লাখ শিশুর জন্য।
ঘ. মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি প্রয়োজন ৪৫ লাখ কিশোর-কিশোরীর জন্য।

প্রভাব :

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় নিরক্ষরতার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া প্রচলিত কর্মবিমুখ শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহের অভাব নিরক্ষতার হারকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করছে। ফলে আমাদের দেশের নিরক্ষর, অজ্ঞ, অদক্ষ জনশক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণে সক্ষম হচ্ছে না। ব্যক্তি জীবনেও এসব নিরক্ষর লোক প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছেনা। ফলে তারা ন্যূনতম জীবনমান অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

৪. চিকিৎসা :

চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থা কোনভাবেই জনসংখ্যার সঠিকভাবে সাহায্যে আসতে পারছে না। কারণ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় দিন দিন মানুষের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। নিম্নে চিকিৎসাখাতে ১৯৯২ সালে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থার একটি চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো :

সন	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
মোট হাসপাতাল	৮৭৫	৮৭৫	৮৯০
সরকারী হাসপাতাল	৬০৮	৬০৮	৬১০
বেসরকারী হাসপাতাল	২৬৭	২৬৭	২৮০
মোট হাসপাতালের শয্যা	৩৩,৩৭৬	৩৩,৩৭৬	৩৪,৩৫৩
রেজিষ্ট্রার্ড ডাক্তার	১৮,৩২৩	১৯,৩৮৭	২১,০০৪

ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত	১ : ৫৭৫৭	১ : ৫৫৪৩	১ : ৫২১৬
হাসপাতাল বেড ও জনসংখ্যার অনুপাত	১ : ৩১৬১	১ : ৫৫৪৩	১ : ৫২১৬
গড় আয়ুষ্কাল	৫৬ বছর	৫৬ বছর	৫৬ বছর
প্রতি হাজারে অশোধিত শিশু জন্মের হার	৩৩	৩২.৮	৩১.৬
প্রতি হাজারে অশোধিত শিশু মৃত্যুর হার	১১.৪	১১.৩	১১.০
প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার	৯৮	৯৪	৯১
মাথাপিছু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে সরকারী ব্যয় –	৬০ টাকা	৫৪ টাকা	৭৬ টাকা

৫. বাসস্থান :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ফলে গ্রামীন জনগণের শহরমুখী প্রবণতার প্রেক্ষিতে বর্তমানে আমাদের দেশের গ্রাম ও শহর এলাকায় বাসস্থান সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। বর্তমানে এটি একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তরের তথ্য অনুসারে বার্ষিক সংযোজিত নতুন জনসংখ্যার জন্য প্রতি বছর ২ লক্ষ ৬১ হাজার নতুন বাসগৃহের প্রয়োজন। যা নির্মাণ করা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে সম্ভব না।

১৯৭৯ সালের Land Occupancy Survey–এর তথ্য অনযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৭৩.৫৭% ভাগের বসতবাড়ি ভূমির পরিমাণ মাত্র শূন্য থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে। ১৯৭৯ সালের বাংলাদেশ গৃহ গবেষণা ইনষ্টিটিউটের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের বাসস্থান সমস্যার নিম্নের চিত্র পাওয়া যায় :

বাসগৃহের ধরণ	পাকা	আধাপাকা	কাঁচা	ঝুপড়ি
শহর	১৯%	২৬%	৩৭%	৬%
গ্রাম	২.৫%	১৭.৫%	৮০%	৮০%

গ্রামীণ জনগণের শতকরা ৭ জন অন্যের বাড়িতে এবং ২২.৬% জন জ্বরাজীর্ণ বাসগৃহে মানবেতর জীবনযাপন করছে। শহুরে জনসংখ্যার ৮% বস্তীতে মানবেতর পরিবেশে বসবাস করছে।

[উৎস : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বাংলাদেশ সরকারী পরিকল্পনা কমিশন, জুন, ১৯৭৯ – পৃঃ ৫৪]

জাতিসংঘের তথ্যকেন্দ্র (ইউনিক) গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় বর্ষ উদযাপনে আয়োজিত সেমিনারে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ১০ লক্ষ লোকের বাস করার আশ্রয় নেই, ৯৪ লক্ষ ঘরবাড়ি মাটি ও বাঁশের তৈরী,শতকরা ৪৪ ভাগ নদী, ডোবা, পুকুর ও খালের পানি ব্যবহার করে। ৪৯ শতাংশ বাড়িতে পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই।

১৯৮৩/৮৪ সালের কৃষিশুমারীর তথ্যানুযায়ী দেশের শতকরা ৯ ভাগ পরিবারের চাষাবাদ ও বসতভিটার জমি ছিল না। ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের হিসাব অনুযায়ী ঢাকার বস্তিতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক মানবেতর জীবন যাপন করছে।

তাছাড়া প্রতি বছর ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীর ভাঙ্গা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা প্রকাট আকার ধারণ করছে।

৬. কর্মসংস্থান :

জনাধিক্যের কারণে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল দেশের অপ্রতুল কর্মসংস্থানের সুবিধা। আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, প্রতিবছর নতুন কর্ম তেমন সৃষ্টি হচ্ছে না, কিন্তু প্রতিবছর কর্ম সংস্থানের পদপ্রার্থী হিসেবে প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের আগমন ঘটছে। ফলে দেশের বেকার সমস্যাকেও কমানো যাচ্ছে না।
পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যানুযায়ী দেশের প্রায় ৩.২০ কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি ১.২০ জনের।

বাংলাদেশ কর্মকমিশনের নিম্নোক্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে সীমিত কর্মপদের জন্য বিপুল পরিমাণ পদপ্রার্থীর বৃদ্ধির হার সম্পর্কে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় :

সন	সাধারণ ক্যাডারে শূন্যপদ	প্রার্থীর সংখ্যা
১৯৮২	৪০৩ টি	৮০০২ জন
১৯৮৩	৬৫০ টি	২৮৫০৫ জন
১৯৮৪	৬৩৩ টি	১৩০০০ জন
১৯৮৬	৩৯৮ টি	২৮১০৪ জন
১৯৮৮	২৪৭ টি	৩১২৫১ জন

[সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ৯ই নভেম্বর '৯০]

প্রভাব :

১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা কর্মসংস্থানের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।
২. কর্মসংস্থানের অভাবে জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কমে যায় ফলে নতুন কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতেও দেরী হয়।

অনুশীলনী :

১. আপনার মতে বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা মানুষের মৌলিক চাহিদার উপর কিভাবে চাপ সৃষ্টি করছে লিখুন।

২. জনাধিক্যের চাপে কিভাবে খাদ্য সংকট আমাদের উপর প্রভাব ফেলছে বর্ণনা করুন।

সারাংশ

বস্তুতঃ বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থসামাজিক বৈষম্যমন্ডিত সামাজিক কাঠামোতে বিশেষ শ্রেণীর মৌল চাহিদা পূরণে সুযোগ থাকলেও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণে সুযোগ নেই। প্রতিবছর অধিক অধিক জনসংখ্যা যেমন অন্নবস্ত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে দেশকে চরম দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে তেমনি কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতাও এই সমস্যাকে কাটিয়ে উঠাতে কোন সাহায্যে আসছে না। অন্যদিকে দেশের জনগণের বাড়তি অংশ যেমন সঠিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেনা তেমনি তাদের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসা ব্যতীত দেশের শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের কত ভাগ লোকসংখ্যা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত –

ক. ৩৪ ভাগ খ. ৪০ ভাগ
গ. ৭৬ ভাগ ঘ. ৬০ ভাগ

২. বাংলাদেশের জনাধিক্যের চাপে মানুষের কোন্ মৌলিক চাহিদাটি শোচনীয়ভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে –

ক. খাদ্য খ. চিকিৎসা
গ. বাসস্থান ঘ. শিক্ষা

৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যার স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ কি বলে আপনি মনে করেন –

ক. স্বাস্থ্যসচেতনহীনতা
খ. পর্যাপ্ত সুচিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা
গ. চিকিৎসা গ্রহণে জনসংখ্যার আর্থিক অসমর্থতা
ঘ. সঠিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অজ্ঞতা

৪. বাংলাদেশের কোন্ মৌলিক চাহিদার অপ্রতুলতার জন্য জনসংখ্যার সার্বিক সামাজিক চাপ তৈরী হচ্ছে –

ক. খাদ্য খ. চিকিৎসা
গ. শিক্ষা ঘ. বাসস্থান।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

ইউনিট ১২

ভূমিকা

১৬ই জুন, ১৯৯৭ সালে UNDP কর্তৃক প্রণীত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন আয়ুষ্কাল, শিক্ষা ও মৌলিক ক্রয় ক্রমতার সম্মিলিত পরিমাপের দ্বারা ১৭৫টি দেশের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index, HDI) তৈরী করা হয়। সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৪ নম্বরের যেটা উন্নয়নের নিম্নশ্রেণীভুক্ত। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল একধাপ উপরে ১৪৩ নম্বরে। প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান ১৩৮ নম্বর আর পাকিস্তান ১৩৯।

এই অধ্যায়ে আপনারা যে সকল পাঠ গ্রহণ করবেন তা হলো

পাঠ ১ : মানব সম্পদ উন্নয়ন : ধারণা ও ক্রমবিকাশ ;
পাঠ ২ : জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান ;
পাঠ ৩ : পরিবার ও পরিকল্পনা ;
পাঠ ৪ : বেকারত্ব – জনসংখ্যা ও বেকারত্বের সম্পর্কে ;
পাঠ ৫ : বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি।

পাঠ ১ : মানব সম্পদ উন্নয়ন : ধারণা ও ক্রমবিকাশ

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়াগত বিষয়। এটি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সমার্থবোধক। মানব সম্পদ উন্নয়নের দু'টি পন্থা আছে। প্রথম : আর্থ-সামাজিক উন্নতি কাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পুঁজি বিনিয়োগ। দ্বিতীয়ত : নারী স্বাধীনতা, ছোট পরিবার গঠনের ইচ্ছা, চিত্ত বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। মানব সম্পদ উন্নয়ন বর্তমান বিশ্বে যে কোন উন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ♦ জনগণের মাথাপিছু জিএনপি জানতে পারবেন।
- ♦ একটি দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সার্বিক ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক জানতে পারবেন।
- ♦ অন্য দেশের সাথে নিজের দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তুলনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ধারণা : মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রত্যয়টি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা ও সম্যক জীবন যাপনের গুণগত পরিমাণ দ্বারা এটি পরিমাপযোগ্য। মানব সম্পদ উন্নয়নের মান পরিমাপ ও নির্ণয়ের কতকগুলো পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিগুলো সময়ের আবর্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ক. মাথাপিছু জিএনপি

মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি সনাতনী এবং সর্বাধিক দ্রুত ও ব্যবহৃত সূচক। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি অর্থনীতিতে যেসব চূড়ান্ত দ্রব্য বা সেবা উৎপাদিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে বর্তমান বাজার দরে মূল্যায়িত করে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। মাথাপিছু জিএনপি নিম্নোক্তভাবে বের করা হয় :

$$\text{মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (আর্থিক)} = \frac{\text{মোট জাতীয় উৎপাদন}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

আর্থিক মোট জাতীয় উৎপাদনকে মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। অর্থ্যাৎ,

$$\text{প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপাদন} = \frac{\text{আর্থিক মোট জাতীয় উৎপাদন}}{\text{মোট জাতীয় উৎপাদন অবপাতক}}$$

১. মোট জাতীয় উৎপাদন

মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সঙ্গে নিস্পদ বৈদেশিক আয় যোগ করলে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। দেশীয় ব্যক্তির বিদেশী আয় প্রাপ্তি থেকে বিদেশী ব্যক্তির দেশজ আয় প্রাপ্তি বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিস্পদ বৈদেশিক আয় বলে। মোট জাতীয় উৎপাদন মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মত বাজার মূল্যে অথবা উপকরণ পরিব্যয়ে দেখানো হয়।

২. মোট জনসংখ্যা

কোন নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ে (জুন) জন্মসংখ্যা যোগ করে এবং মৃত্যু সংখ্যা বিয়োগ করে একটি দেশের জনসংখ্যা সমষ্টিকে বুঝায়।

৩. মোট জাতীয় উৎপাদন অবপাতক

মূল্যস্তর মাপার এক ধরণের পরিমাপক। বর্তমান মূল্যে প্রদত্ত মোট জাতীয় উৎপাদনকে স্থির মূল্যে প্রদত্ত মোট জাতীয় উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে এই অবপাতক পাওয়া যায়।

ক্রমবিকাশ

প্রথমদিকে কোন দেশের মাথাপিছু জিএনপি নিরূপণের মাধ্যমে ঐ দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন নির্ধারণ হতো। কিন্তু এভাবে নির্ণয় পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা শুরু হয়। এবং তখন থেকেই মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্রমবিকাশ শুরু হয়।

Physical Quantity of Life Index :

১৯৭৭ সালে Overseas Development Council এর উদ্যোগে অর্থনীতিবিদ মরিস ডেভিট এই যৌগিক সূচকটি উদ্ভাবন করেন।

তিনটি সূচকের সমন্বয়ে PQLI গঠিত হয় :

১. এক বছর বয়সে মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল
২. শিশু মৃত্যুর হার
৩. শিক্ষার হার

মরিস নিম্নলিখিত অনুমানের ভিত্তিতে উপরোক্ত সূচক তিনটি নির্বাচন করেছেন :

১. প্রায় সকল অবস্থায় মানুষ দীর্ঘ জীবনযাপন করতে চায়।
২. মানুষ কখনো তার শিশুদের মৃত্যু চায় না।
৩. শিক্ষার হার কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণের জন্য মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

PQLI মানুষের অধিকাংশ মৌলিক চাহিদা পূরণের ফলাফল পরিমাপ করে।

Human Development Index (HDI) :

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP) এর পক্ষে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯০-এ মানব উন্নয়নের একটি নতুন মাপকাঠির উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুবুল হকের নির্দেশনায় উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের একটি দল এটি উদ্ভাবন করেন। প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদা সমন্বিত ও মাপকাঠির নামই হলো HDI। মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে HDI উদ্ভাবিত হয়েছে। সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য ব্যর্থতা এর সাহায্যে পরিমাপ করার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে। HDI নির্ধারণে দেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল স্বাক্ষরতা ও ক্রয় ক্ষমতাকে একসঙ্গে মিলিয়ে নেয়া হয়েছে। এই হিসেবে বাংলাদেশে আয়ুষ্কালের ন্যূনতম মান ৪২ বছর, স্বাক্ষরতা হারের ন্যূনতম মান ১২ শতাংশ এবং ক্রয় ক্ষমতা ২২০ ডলার।

উপরোক্ত সূচকগুলো বিবেচনা করে জীবনমান প্রত্যয়টিকে নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা যায় :

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

অর্থনৈতিক	সাংস্কৃতিক	রাজনৈতিক-সামাজিক
১. ক্রয়গত অবস্থান	১. চিত্তবিনোদন	১. রাজনৈতিক অধিকার
২. কর্মে নিয়োগ	২. নৈতিক অবস্থান	২. আইনগত অধিকার
৩. সঞ্চয়ের পরিমাণ	৩. চেতনগত মান	৩. স্বাস্থ্যগত অবস্থান
৪. বিনিয়োগ ক্ষমতা	৪. শিল্পবোধ	৪. খাদ্য পুষ্টির মান
৫. ভোগ্যপণ্য ও সেবা ব্যবহারের সুযোগ		৫. শিক্ষার মান
৬. সম্পদের মালিকানা		৬. বাসস্থানের মান

অনুশীলনী

১. মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে কিভাবে আপনি বাংলাদেশকে মূল্যায়ন করবেন –
ক. উন্নত খ. উন্নয়নশীল
গ. অনুন্নত ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সারাংশ

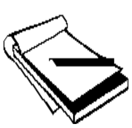

মূলতঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো এমন একটি আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ যা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান নির্ধারণ করে। এটি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন একটি উন্নততর অবস্থানের নাম যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং যথাযথ কর্মশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবাগুলো যেমন – ন্যূনতম আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মানসম্মত জীবন নিশ্চিত করে। যা অভাব মোচন ও প্রত্যাশিত জীবন নিয়ন্ত্রণকে বুঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নে সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মোট জাতীয় উৎপাদন হলো –
ক. কোন দেশের নির্দিষ্ট সময়ের মোট উৎপাদিত মূল্য ;
খ. কোন দেশের সব সময়ের মোট উৎপাদিত মূল্য ;
গ. কোন দেশের নির্দিষ্ট সময়ের নীট উৎপাদিত মূল্য ;
ঘ. কোন দেশের সব সময়ের নীট ও মোট উৎপাদিত মূল্য।

২. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয় মাথাপিছু কত –
ক. ১৮০ ডলার খ. ২২০ ডলার
গ. ২৬০ ডলার ঘ. ৩০০ ডলার

৩. মোট জনসংখ্যা বলতে আপনি কি বুঝেন –
ক. কোন দেশের বর্তমান জনসংখ্যার সমষ্টি
খ. কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার সমষ্টি
গ. কোন দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে অবস্থানরত জনসংখ্যার সমষ্টি
ঘ. কোন দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্মসংখ্যা যোগ এবং মৃত্যুসংখ্যা বিয়োগ করে জনসংখ্যার সমষ্টি।

৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যার গড় আয়ুষ্কাল কত –
ক. ৫৪ বছর ; খ. ৪৫ বছর ;
গ. ৪২ বছর ; ঘ. ৫৬ বছর।

৫. বিশ্বের মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান কত –
ক. ১৪৩ নম্বরে ; খ. ১৩৯ নম্বরে ;
গ. ১৩৬ নম্বরে ; ঘ. ১৪৪ নম্বরে।

পাঠ ২ : জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান

ভূমিকা

একটি দেশের জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে যখন কিছু বলা হবে তখন তা এভাবে বুঝানো হবে যে, এটি হলো একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুণগত উৎকর্ষের মাধ্যমে ব্যক্তির যথাযথ চিন্তা চর্চা, কর্ম নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন।

জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান প্রত্যয়টি একটি আপেক্ষিক, চলমান ও সমাজ কাঠামো নির্ভর। এটি একদিকে যেমন একটি দেশের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দক্ষ জনগোষ্ঠীকে নির্ধারণ করে তেমনি অন্যদিকে ঐ জনগোষ্ঠী জীবনমানের সর্বাধিক মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এটিকে উন্নত ও গতিশীল পর্যায়ে স্থির রাখে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি শেষে আপনি –

- একটি দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ জানতে পারবেন ;
- একটি দেশের জনসংখ্যা ঐ দেশের জন্য ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে, তা জানতে পারবেন ;
- নিজের দেশের জীবনযাত্রার মানের সাথে অন্য দেশের জীবনযাত্রার মানের তুলনা করতে পারবেন ;
- দেশের জনসংখ্যার সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে এর সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হবে।

বিষয়বস্তু

জনসংখ্যা : যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে তেমনি অন্যদিকে অর্থণৈতিক উন্নয়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে জনশক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। পক্ষান্তরে, আপনারা দেখবেন, কোন দেশের জনসংখ্যা যদি সম্পদের তুলনায় অধিক হয় তা হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

একটি দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে চাইলে আপনাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১. জনসংখ্যার গুরুত্ব
২. জনসংখ্যার পরিস্থিতি
৩. কোন দেশের জন্য অধিক জনসংখ্যা কি সমস্যা স্বরূপ? নাকি সামঞ্জস্যপূর্ণ?
৪. বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যার প্রভাব, এবং সর্বশেষে
৫. জনসংখ্যার সমস্যার সমাধানের উপায় বের করা।

জনসংখ্যার গুরুত্ব

যে কোন রাষ্ট্রের জন্য তার জনসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা হলো উৎপাদনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে, তা নির্ভর করে কর্মক্ষম উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনশীলতা নির্ভর করবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং দক্ষতার উপর। সুতরাং, উৎপাদন বৃদ্ধির অবর্তমানে কোন কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা জনগণের জীবন মান উন্নয়ন ব্যাহত করে দেশে দারিদ্রতা ডেকে আনে। সুতরাং, অধিক জনসংখ্যা ও স্বল্প জনসংখ্যা বিপরীতমুখী দুটি অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ অধিক জনসংখ্যা সমস্যায় আক্রান্ত পক্ষান্তরে জার্মানী, সিঙ্গাপুর মধ্যপাচ্যের দেশগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে।

জনসংখ্যার পরিস্থিতি

জনসংখ্যার গুরুত্ব উপলদ্ধি করলেই শুধু চলবে না, বরং বর্তমান সময়ে জনসংখ্যার পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে আছে অর্থাৎ সমস্যাপূর্ণ নাকি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিরূপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অপরাপর উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর সাথে নিজের দেশের তুলনা করতে হবে। যেমন, বাংলাদেশের মতো স্বল্প পরিসরে এতো অধিক সংখ্যক জনসংখ্যা বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশটিতে স্বল্প জনসংখ্যাই তাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে তারা পর্যাপ্ত শ্রমশক্তির অভাব বোধ করছে। অপরদিকে, আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন, যেখানে আমাদের দেশে ৫০%-এর বেশী লোক চরম দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে, সেখানে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশগুলোতে ৮০% এর বেশী লোক উন্নত জীবন যাপন করছে।

বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যার প্রভাব

কমবেশী প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো যেমন –

খাদ্য ঘাটতি : কোন দেশের অধিক জনসংখ্যা সে দেশের খাদ্য ঘাটতি ঘটায়।

দারিদ্র : মাথাপিছু আয় কম, সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম, উৎপাদন কম এবং সবকিছুর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় দরিদ্রতার। কিন্তু যদি কোন দেশের সম্পদ এবং জনসংখ্যাকে সঠিক সামঞ্জস্যতার মধ্যে এনে কাজে লাগানো যায়, তবে অবশ্যই ঐ দেশে দারিদ্র থাকবে না।

শিক্ষা : অনুন্নত দেশগুলোতে অধিক জনসংখ্যা। শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয় বলে তা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় অপরদিকে উন্নত দেশগুলোতে জনগণ পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ পায় বলে তা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

কর্মসংস্থান : অনুন্নত অর্থনীতির দেশেই কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা দেখা যায়, ফলে উদ্ভব হয় বেকারত্বের।

চিকিৎসা : অনুন্নত দেশগুলো তাদের বিশাল জনসংখ্যার জন্য চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টিতে সবসময় সক্ষম হয় না ফলে এসব দেশে জনগণ সর্বদা স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে।

আবাসন ব্যবস্থা : বর্তমানে বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত সকল দেশেই আবাসন সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে জাপানে জমির দাম সবচেয়ে বেশী। এই আবাসন সমস্যা নিরূপণের লক্ষ্যেই জাপান সরকার রাজধানী টোকিও থেকে সরিয়ে ওসাকা নগরীতে স্থানান্তরের চিন্তা-ভাবনা করছে।

সামাজিক রীতিনীতি : উন্নত এবং অনুন্নত উভয় প্রকার দেশেই অধিক জনসংখ্যা সামাজিক রীতিনীতিকে ভঙ্গ করে এবং দেখা দেয় কিশোর অপরাধ, নারী অপরাধের মতো বিভিন্ন রকম সামাজিক অপরাধ।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা :

কোন দেশের জন্য যদি সেই দেশের জনসংখ্যা সমস্যারূপে দেখা দেয় তাহলে নিম্নের উপায়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারে।

- জনসংখ্যার পুনর্বন্টন করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ঘটাতে হবে।
- আয়ের পুনর্বন্টন করতে হবে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- শিক্ষার সর্বোচ্চ বিস্তার ঘটাতে হবে।
- সুষ্ঠু পরিবার পরিকল্পনা করতে হবে।

জীবনযাত্রার মান :

যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা যায় তবে অবশ্যই জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানো যাবে। তবে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ঐ দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ উন্নত হতে হবে।

অনুশীলনী :

১. জনসংখ্যার জীবনমানের জন্য আপনার কাছে কোন্ কোন্ বিষয় অগ্রাধিকার পাবে :
   ক. শিক্ষা
   খ. অন্ন
   গ. কর্মসংস্থান
   ঘ. চিকিৎসা

সারাংশ

বাংলাদেশের এই পশ্চাৎপদ ও অবাঞ্চিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা অপমোদন জাতি হিসেবে বিশ্বের সম্মুখে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্নগামী এবং সভ্য মানুষ হিসেবে জীবন যাপনে অন্তরায়। এই কারণে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন সকল কর্মসূচীর মূল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা এই কর্মপ্রয়াস অন্য সকল প্রয়াসের সাথে সম্পৃক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. একটি দেশের জনসংখ্যা সমস্যা হিসেবে আপনি কোন্টিকে বেশী গরুত্ব দিবেন –
   ক. খাদ্য ঘাটতি　　খ. দারিদ্র
   গ. শিক্ষা　　ঘ. চিকিৎসা

২. বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল আবাসস্থল কোন্ দেশে –
   ক. যুক্তরাষ্ট্র　　খ. কানাডা
   গ. জাপান　　ঘ. সিঙ্গাপুর

৩. বিশ্বের কোন্ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে উন্নত –
   ক. যুক্তরাষ্ট্র　　খ. জাপান
   গ. কানাডা　　ঘ. সুইজারল্যান্ড

৪. স্বল্প আয় জনগণের কোন্ বিষয়ের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে –
   ক. স্বল্প সঞ্চয়　　খ. স্বল্প বিনিয়োগ
   গ. স্বল্প উৎপাদন　　ঘ. স্বল্প কর্মসংস্থান

পাঠ ৩ : পরিবার পরিকল্পনা

ভূমিকা :

পরিবার পরিকল্পনা একটি জীবন ধারা একটি দর্শন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের একটি উপায় বিশেষ। সাধারণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ বুঝে থাকি। একটি পরিবারের সঠিক কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি দম্পতি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সচেতনভাবে চিন্তাভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- পরিবারের সঠিক মঙ্গল ও কল্যাণ সাধণ করা সম্ভব তা জানতে পারবেন।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অধিক জনসংখ্যা থেকে সৃষ্ট সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন তা জানতে পারবেন।
- দেশ এবং পরিবারের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা লিখতে পারবেন।
- নারীর সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা বুঝতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

পরিবার পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয় আছে যা অবশ্যই পর্যালোচনার যোগ্য :

- পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব
- পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ
- পরিবার পরিকল্পনা সফল করার উপায়

পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব

বাংলাদেশের জনসাধারণের স্বল্প মাথাপিছু আয়, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, ব্যাপক বেকারত্ব, খাদ্য ঘাটতি প্রভৃতি সমস্যার মূলে আছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এই সমস্যার সমাধানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অপরিহার্য।

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ
২. খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণ
৩. বেকার সমস্যার সমাধান
৪. জমির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস
৫. জনসংখ্যার ঘনত্ব হ্রাস
৬. মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি
৭. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১. শিক্ষার অভাব
২. নারী শিক্ষার অভাব
৩. ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি
৪. সামাজিক পরিবেশ

৫. দারিদ্র
৬. জীবনযাত্রার নিম্নমান
৭. জনগণের অনীহা
৮. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা
৯. ঔষধপত্র ও সরঞ্জামের অভাব

পরিবার পরিকল্পনা সফল করার উপায়

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে নিম্নের উপায়গুলো অবলম্বন করা উচিত :

১. শিক্ষার বিস্তার
২. নারী শিক্ষার প্রসার
৩. ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
৪. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা রোধ
৫. চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা
৬. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শিক্ষাদান
৭. ব্যাপক প্রচার
৮. পুরস্কারের ব্যবস্থা।

পরিবার পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কিছু পদক্ষেপ

জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশ সরকার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতির প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো :

১. আগামী ২০০০ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসংখ্যা ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ সীমাবদ্ধ রাখা হবে।
২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগামী ১৯৯০ সাল নাগাদ ২.৪ শতাংশ থেকে ১.৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।
৩. ১৯৯০ সাল নাগাদ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
৪. ১৯৯০ সাল নাগাদ নিয়ামত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪১ লক্ষ থেকে ৮২ লক্ষ্যে উন্নীত করা হবে।
৫. ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রজনন হার ৬৪ থেকে কমিয়ে ৪.১ এ আনা হবে।
৬. ১৯৯০ সাল নাগাদ শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১২৫ থেকে কমিয়ে ১০০তে আনা হবে।

অনুশীলনী

১. কোন্ পদক্ষেপ আপনার কাছে পরিবার পরিকল্পনা প্রণয়নে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মনে হয় –
ক. ব্যাপক প্রচার
খ. নারী শিক্ষার প্রসার
গ. শিক্ষার বিস্তার
ঘ. পুরস্কারের ব্যবস্থা

সারাংশ

প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে পরিবারের সদস্য কি হওয়া উচিত তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা উচিত। বস্তুতঃ সন্তানের জন্মদান ঘটনাক্রমে না হয়ে পছন্দমত (Children by choice and not by chance) হওয়াই পরিবার পরিকল্পনার মূল কথা। প্রজনন হার অধিক হলে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং তা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করবে। সুতরাং, একটি ছোট ও সুখী পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যেই পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. পরিবার পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দিক কোন্‌টি –

ক. অধিক সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ

খ. খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণ

গ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

ঘ. বেকার সমস্যার সমাধান

২. সঠিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা না নেয়া হলে ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত হওয়ার সম্ভাবনা আছে –

ক. ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ　　খ. ১৬ কোটি

গ. প্রায় ১৩ কোটি　　ঘ. ১.১৬ কোটি

৩. পরিবার পরিকল্পনা কোন্ বিষয়টির সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত –

ক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন　　খ. পুষ্টি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার মান

গ. জনসংখ্যার আকার　　ঘ. বাসস্থানের মান।

পাঠ ৪ : বেকারত্ব-জনসংখ্যা ও বেকারত্বের সম্পর্ক

ভূমিকা

অর্থনীতিবিদদের মতে বেকারত্ব বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যাতে কর্মক্ষম শ্রমিকগণ প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাদের যোগ্যতানুযায়ী কাজ পায় না। আবার কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে কাজ করতে সক্ষম হয়না ; এধরণের বেকারত্বকে প্রকৃত বেকারত্ব বলা হয় না। এমতাবস্থায় প্রকৃত বেকার বলতে ঐসব শ্রমিককে বুঝায় যারা কাজ করতে সক্ষম এবং প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক অথচ যোগ্যতানুযায়ী কাজ পায় না। বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকার সমস্যা ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

- এর মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থানের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠে।
- জনসংখ্যা ও বেকারত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তুলনা করতে পারবেন।
- দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

বিষয়বস্তু

বৈশিষ্ট্য : বেকারত্বের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১. কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা
২. প্রচলিত মজুরীতে কাজ করার ইচ্ছা
৩. কাজের অনুপস্থিতি।

প্রকারভেদ : কারণ ও প্রকৃতি অনুসারে কয়েক ধরণের বেকারত্ব সৃষ্টি হয়।

১. **মৌসুমী বেকারত্ব** - ঋতু পরিবর্তনের ফলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয় তাকে মৌসুমী বেকারত্ব বলে।

২. **প্রযুক্তি বিদ্যাজনিত বেকারত্ব** - উৎপাদনের কলাকৌশল পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

৩. **সংঘাতজনিত বেকারত্ব** - দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেয়ার ফলে যে সাময়িক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়, তাকে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বলে।

৪. **প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব** - উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শ্রমশক্তি প্রত্যাহার করে নিলেও মোট উৎপাদনের কোন পরিবর্তন না হলে এরূপ অতিরিক্ত শ্রমিকদের প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকার বলা হয়।

৫. **বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব** - বাণিজ্যের ওঠানামার ফলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়, তাকে বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব বলা হয়।

৬. **আকস্মিক বেকারত্ব** - প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে অনেক সময় বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রভাব :

বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসেবে এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।

১. উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় আয় হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সময় এবং উপকরণ উভয়েরই অপচয় ঘটছে।

২. বেকারত্ব দেশের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে দিচ্ছে।

৩. বেকারত্ব কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে হতাশা ও ব্যর্থতার জন্ম দিচ্ছে যা সামাজিক সংঘাত ও কলহ সৃষ্টি করে।

৪. বেকারত্বের অসহনীয় যন্ত্রণা মানুষকে সামাজিক আইন শৃঙ্খলার প্রতি বীতঃশ্রদ্ধ করে তোলে।

৫. বেকারত্বের ফলে কর্মক্ষম ব্যক্তি সমাজে বৈধ উপায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক প্রথা, চোরাকারবার, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি করে।

৬. পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষতা ইত্যাদি সমস্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে বেকারত্ব।

৭. বেকারত্ব দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা প্রভৃতির পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

৮. নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধিতে বেকারত্ব সহায়তা করছে।

সুতরাং বলা যায়, বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যাই নয়, অন্যান্য আর্থসামাজিক সমস্যার প্রধান কারণও বটে।

বেকারত্বের কারণসমূহ :

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান আর্থসামাজিক সমস্যা হলো বেকার সমস্যা। দেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বেকার রয়েছে। এই পরিমাণ মোট শ্রমশক্তির ৩৩%। বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. **কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা :** দেশের শতকরা ৮৫ জনই কৃষিজীবি এবং মাত্র ৫/৬ মাস কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে এবং এর ফলে মৌসুমী বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

২. **শিল্পের অনগ্রসরতা :** বাংলাদেশের আশানুরূপভাবে শিল্পের অনগ্রসরতার অভাবে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।

৩. **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা :** ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতির কারণে যদিও শিক্ষার হার বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে, ফলে সহজেই তাদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যাচ্ছে না।

৪. **কারিগরি জ্ঞানে অভাব :** আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল আনা সত্ত্বেও শুধুমাত্র কারিগরি জ্ঞানের ও প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে আজ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে।

৫. **বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতন :** বাণিজ্যচক্রজনিত মন্দার ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৬. **কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ :** বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়।

৭. **সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ :** বাংলাদেশে প্রচলিত পর্দাপ্রথা, যৌথ পরিবার প্রথা, বর্ণ প্রথা প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বেকারত্বের জন্য দায়ী।

৮. **শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব :** শিক্ষার অভাব, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, যাতায়াতের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে একস্থান হতে অন্যস্থানে শ্রমিকদের গতিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বেকারত্ব দেখা দেয়।

৯. **দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে যে হারে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থান তৈরী করা যাচ্ছে না বলে বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

এসব কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে।

বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ :

বাংলাদেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যা দূর করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে –

১. **দ্রুত শিল্পায়ন :** দেশে অধিক সংখ্যক কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বেকারত্ব কাটিয়ে ওঠা যায়।

২. **ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নতি :** আমাদের দেশে মৌসুমী বেকারত্ব দূর করতে হলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করতে হবে।

৩. **শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন :** বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

৫. **নারী শিক্ষা প্রসার :** নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে তাদেরকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৬. **কর্ম বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন :** দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মবিনিময় কেন্দ্র স্থাপন করে, বেকারদের তালিকা প্রস্তুত, কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এর সমাধান করা যায়।

৭. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বেকার সমস্যা অনেকাংশে লাঘব করা যায়।

৮. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে।

জনসংখ্যা ও বেকারত্বের সম্পর্ক :

জনসংখ্যার গুণগত উন্নয়নের সাথে বেকারত্বের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

১. দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ এবং সামর্থ্যের উপর বেকারত্বের বেশ-কম ঘটে।
২. যোগ্য এবং কর্মী শ্রম শক্তিকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই বেকারত্ব থেকে বাঁচানো যায়।
৩. সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং শারীরিক যোগ্য মাত্র কর্মসংস্থানের সদ্ব্যবহার করতে পারে।
৪. উপযুক্ত খাদ্য ও সুচিকিৎসার মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস করানো যাবে।

অনুশীলনী :

১. বেকার সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার কাছে কোন্ পদক্ষেপটি বেশী কার্যকরী বলে মনে হয় –

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ খ. দ্রুত শিল্পায়ন
গ. নারী শিক্ষার প্রসার ঘ. কুটির শিল্প স্থাপন

সারাংশ :

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট তথা আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল রেখে অধিকতর জনমুখী ও সার্বজনীন করতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদনমুখী তৎপরতার মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদন সমৃদ্ধি তথা মানব সম্পদ উন্নয়নে বাস্তব সম্মত দিক নির্দেশনায় রূপায়িত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে (✓) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের বেকার সমস্যার কোন্‌টি বেশী প্রযোজ্য –
ক. শিল্পের অনগ্রসরতা খ. কারিগরি জ্ঞানের অভাব
গ. পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব ঘ. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি

২. কোন্ পদক্ষেপটি বেকারত্ব দূর করার জন্য বেশী প্রযোজ্য হবে –
ক. দ্রুত শিল্পায়ন খ. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ
গ. শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘ. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন

৩. বাংলাদেশে বেকারত্বের শতকরা হার কত –
ক. ৩৯ ভাগ খ. ৩৬ ভাগ
গ. ৩৪ ভাগ ঘ. ৪০ ভাগ

পাঠ ৫ : বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

ভূমিকা

বাংলাদেশের সার্বিক আলোচনা করলে এটা স্পষ্টতই বুঝা যায় মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এর ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান দেখা যায় না। কিন্তু মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয়ের উপর উন্নত দেশগুলো সর্বাধিক জোর দিয়ে আজ এই অগ্রগতির শিখরে পৌঁছতে পেরেছে। অপরদিকে, অনুন্নত দেশগুলো তাদের দারিদ্র্য অবস্থা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ফলে এই তিনটি বিষয়ের উপর এখনও সর্বাত্মক জোর দেয়ার সুযোগ তাদের সম্ভব হয়নি।

উদ্দেশ্য

- শিক্ষার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং তাদের অধিকারবোধ সম্বন্ধে জাগ্রত করা যায়।
- এর মাধ্যমে একটি দেশ তার এই মৌলিক চাহিদাগুলোর সমস্যা ও সমাধান নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারে।

বিষয়বস্তু

শিক্ষা : শিক্ষার সঙ্গে মানব সম্পদ উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তি তার আয় ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন থাকেন। জীবনকে পরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করেন। সন্তানের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে পরিবারের ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজন পূরণের বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিজ্ঞতা পরিবার পরিচালনার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ শিক্ষাই উন্নয়নের অনন্য চাবিকাঠি। যে জাতি যত শিক্ষিত হতে পেরেছে সে জাতি তত উন্নত হয়েছে। শিক্ষা ব্যতীত বর্তমান যান্ত্রিক যুগে উন্নয়নের কথা কল্পনাই করা যায় না। এটি জাতিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত এবং তার নাগরিকদের সচেতন হিসাবে গড়ে তোলার অপরিহার্য মাধ্যম শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারের মাধ্যমেই বাংলায় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ ঘটে।

আমাদের দেশে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন হওয়ার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতাকেই দায়ী করা হয়। পুরুষের চেয়ে মহিলারা অস্বাভাবিক হারে নিরক্ষর রয়েছে এবং নিরক্ষতার হার শহর থেকে গ্রামে বেশী। শিক্ষায় উদাসীনতা ও সফল ত্যাগের কারণে শিক্ষাগ্রহণ প্রবণতায় ক্রম-কমতি দেখা দেয়ায় আমাদের দেশে নিরক্ষতার হার প্রায় আগের মতোই রয়ে গেছে। নিরক্ষতার মতো অজ্ঞ মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশে বেড়ে গেছে। সমাজ জীবনে বিরাজমান এ অজ্ঞতা নিরক্ষতার মতো উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ও অনেক অসহনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। যে কোন সমাজেই নিরক্ষতা ও অজ্ঞতা একদিকে উন্নয়ন ও প্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করে আবার অন্যদিকে সমাজ জীবনে বিভিন্ন অস্বস্তিকর সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, স্বাক্ষরতা জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা অধিক উৎপাদনক্ষম হয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। অন্যদিকে নিরক্ষর লোকেরা কম উৎপাদন ক্ষমতার কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কম অবদান রাখে। সোভিয়েত রাশিয়ার গবেষক স্টুমিসিন এক অনুসন্ধানে লক্ষ্য করেন যে, মাত্র এক বছরের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সাধারণ স্বাক্ষরতা শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোক মেশিন চালকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় মাত্র ১২ শতাংশ। আমাদের হিসেবে গড়ে তুলতে অন্তরায়-ই-নয় ; বরং তার সাথে সাথে উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে এবং ধ্যান ধারণা যোগ্যতা অর্জনে বাধা

দেয়। তাছাড়া এখানে নিরক্ষতা ও অজ্ঞতার কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনগণের সংশ্লিষ্টতা কম থেকে যাচ্ছে। আর সে জন্যই অর্থ্যাৎ জনগণকে উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট তথা আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল রেখে অধিকতর জনমুখী ও সার্বজনীন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংমিশ্রণে প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে ঢেলে সাজাতে হবে। বয়স্ক শিক্ষা ও অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের প্রত্যয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি :

শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু, চিকিৎসক ও চিকিৎসা সামগ্রীর অপ্রতুলতা আমাদের উন্নয়নের বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মৃত্যু হার হ্রাস এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় জনগণকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সকলেই অবহিত হোন। বিশুদ্ধ পানি পানের সুযোগ সৃষ্টি, পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে কার্যকরী চিকিৎসা দান জনগণের স্বাস্থ্য সেবার প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার কৌশল হিসেবে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য এর নীতিতে স্বাস্থ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা জোরদার করণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ক. জনগণের স্বাস্থ্যমানের উন্নয়ন সাধন, বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ।

খ. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার কর্মসূচীকে সমন্বিত করে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং এর সমর্থক সেবাগুলোর গুণগত ও পরিমাণগত স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন।

গ. পারিবারিক কাঠামোতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ ঘটিয়ে পারিবারিক কল্যাণ সাধন।

ঘ. প্রধান প্রধান সংক্রামক ব্যাধি এবং অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ।

ঙ. জনসাধারণের পুষ্টির মান বৃদ্ধি করা বিশেষ করে শিশু ও মায়ের পুষ্টি সাধন।

চ. স্বাস্থ্যকর জনপদ গড়ে তুলতে ত্বরিৎ ব্যবস্থা করা এবং এর কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ছ. নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পর্যাপ্ত উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন বৃদ্ধি করা।

জ. স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুবিধা কাঙ্ক্ষিতমানে নিয়ে যাবার জন্য গবেষণা জোরদার করে স্বাস্থ্য ব্যবহার উন্নতি সাধন।

এসব লক্ষ্য বাস্তব রূপদান করার জন্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী হাতে নেয়ায় পরিকল্পনা গৃহীত হয় :

প্রথমত	:	প্রসূতি মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৭ হতে ৪.৫ হ্রাস।
দ্বিতীয়ত	:	শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১০০ হতে ৮০ হ্রাস।
তৃতীয়ত	:	গর্ভকালীন শিশুমৃত্যু প্রতি হাজারে ৮০ হতে ৬৫ হ্রাস।
চতুর্থত	:	প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা ও প্রসবকালীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সেবাদানের ব্যবস্থা করণ।
পঞ্চমত	:	মৃত্যু প্রবণতা, অসুস্থতা শৈশবকালীন অক্ষমতা, টীকাদানের মাধ্যমে হ্রাসকরণ।
ষষ্ঠত	:	পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীর মাধ্যমে উচ্চ অশোধিত জন্মহার হ্রাসকরণ।
সপ্তমত	:	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসেবে মা ও শিশুর পর্যাপ্ত ও ব্যাপকভিত্তিক সেবা দান।

উন্নত স্বাস্থ্য ও উন্নত জীবনমানের একটি বিশেষ নির্দেশ। শুধু চিকিৎসক ও চিকিৎসা সামগ্রী সম্প্রসারণ ঘটলেই হবেনা, বরং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন।

পুষ্টিজ্ঞান, খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ সর্বোপরি পরিকল্পিত পরিবার গঠন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া নারী শিক্ষা বৃদ্ধি করে সন্তান প্রতিপালন, পারিবারিক চিকিৎসা এবং পরিবারের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলা যেতে পারে। সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার ঘটিয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। প্রতিটি পরিবারে পায়খানা স্থাপন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলা স্বাস্থ্য উন্নয়নের উত্তম প্রক্রিয়া। এছাড়া গণদারিদ্র্যতা নিরসণ করে জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকশিত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যহীনতার মতো একটি বন্ধ্যাত্মকে অতিক্রম করা সম্ভব। আর্থিক সংগতি সুষম খাদ্য ক্রয়ে সক্ষমতাদানের পাশাপাশি চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করে। সুতরাং জনগণের আর্থিক সামাজিক বিকাশ তথা দরিদ্র বিমোচন জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের একটি বিশেষ মাধ্যম।

অনুশীলনী

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি –
   ক.
   খ.
   গ.
   ঘ.

সারাংশ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে ; মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতিযোগিতা থেকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, দারিদ্রের প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে জটিলতর হচ্ছে এবং এর সামাজিক প্রভাব বিভিন্ন দিক থেকে উদ্বেগজনক আকারে ধারণ করছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে বাস্তবধর্মী ধ্যান ধারণার জন্য বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ হক এর মতে, অর্থনীতির সঠিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারলে বাংলাদেশ আগামী ১০ বছরে এ অঞ্চলের মধ্যে টাইগার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব তার বক্তব্যেই জানা যায়। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সম্ভাবনা বা ভাগ্য নির্ভর করছে শিল্পায়নের উপর। আর এটা করতে হলে শিক্ষাকে বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কোন্ পদক্ষেপটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ –
   ক. কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তন
   খ. শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের সর্বাধিক অনুদান
   গ. জনগণকে মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ
   ঘ. বর্তমান শিক্ষাকে চালু রাখা।

২. কোন্ বিষয়টির কারণে জনগণ স্বাস্থ্যহীনতায় ভূগছে –
   ক. সরকাররের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।
   খ. জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতন।
   গ. দারিদ্রের কারণে জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে খেয়াল রাখে না।
   ঘ. সরকার ও জনগণের সার্বিক অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

ইউনিট ১৩

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মনে করা হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা আশানুরূপ হয়নি। ফলে সত্তরের দশকের শেষ ভাগ থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনা পূর্বের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পাঠ - ১ : সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উন্নয়ন পরিকল্পনার সংজ্ঞা বলতে পারবেন ;
- উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বলতে পারবেন।

১. সংজ্ঞা

উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে দীর্ঘকালে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমন্বিত করার জন্য সরকারের সচেতন প্রচেষ্টাকে বুঝায়। উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার উন্নয়নের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক চলক (যেমন – আয়, ভোগ, বিনিয়োগ, নিয়োগ, সঞ্চয়, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি) কে প্রভাবিত করতে, পরিচালনা করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সহজভাবে বলা যায়, উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত একটি দলিল।

২. উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব

কিছুকাল পূর্বে উন্নয়নের যন্ত্র হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হল :

১. **বাজার ব্যর্থতা :** উন্নয়নশীল দেশের দ্রব্য ও উপাদানের বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক নয়। এমতাবস্থায় উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাজারের শক্তির উপর ছেড়ে দিলে সামাজিক কাম্য উৎপাদন ও বিনিয়োগ হয়না। উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থনীতির কাম্য উৎপাদন ও বিনিয়োগ নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

২. **সম্পদ সমাবেশ ও বরাদ্দকরণ :** উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক ও দক্ষ মানব সম্পদের পরিমাণ সীমিত। এই সীমিত সম্পদকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম ব্যবহারে

নিয়োজিত করা উচিত। বাজার শক্তির উপর ছেড়ে দিলে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হয় না। যেমন – বাজার শক্তি ধনীদের জন্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে। এ অবস্থায় উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে বিনিয়োগের ক্ষেত্র বাছাই করে এবং বিনিয়োগ সমন্বয় করে যাতে সীমিত সম্পদ সবচেয়ে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়।

৩. **মানসিক প্রভাব :** উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের বিশদ বর্ণনা থাকে। এরূপ একটি দলিল মানুষের মনোভাবের উপর গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রভাব ফেলে। তখন সরকারের পক্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করা সম্ভব হয়। এর ফলে সরকারের পক্ষে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা সহজ হয়। মানুষ তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, গোত্রীয় বিভেদ ভুলে গিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

৪. **বৈদেশিক সাহায্য :** উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে কাজ করে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং বাছাইকৃত প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য সাহায্য পাওয়া সহজ হয়। দাতাদেরকে বোঝানো যায় যে তাদের দেয়া অর্থ দেশের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে। বস্তুতপক্ষে অনেক সমালোচক মনে করেন উন্নয়ন পরিকল্পনা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার হাতিয়ার বৈ কিছু নয়।

এ আলোচনা থেকে দেখা যায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

উন্নয়নশীল পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের সচেতন প্রয়াস।

উন্নয়ন পরিকল্পনা (১) বাজার ব্যর্থতার জন্য অর্থনীতিতে কাম্য বিনিয়োগ ও উৎপাদন না হওয়ার সমস্যা দূর করে, (২) দেশের সীমিত আর্থিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে, (৩) মানুষকে তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, গোত্রীয় ইত্যাদি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং (৪) দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার পথ সুগম করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়?
২. উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পাঠ - ২ : স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কাকে বলে বলতে পারবেন।
- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৩.২ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

সময়ের দিক থেকে বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন – স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

সাধারণত ৪, ৫ বা ৬ বছর মেয়াদের পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বলা হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুবিধার জন্য এরূপ পরিকল্পনাকে ভেঙ্গে বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার উদাহরণ।

সাধারণত ১৫, ২০, ২৫ বছর মেয়াদের পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কোন দেশে থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত রচনা করা। দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য পর্যায়ক্রমে অর্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় ভাগ করা হয়।

১৩.২.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের উৎস

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ বিভিন্ন উৎস থেকে আসতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় দু'টি খাত থাকে, যথা – সরকারী খাত ও বেসরকারী খাত। এই দুটি খাতের অর্থায়নের উৎসের প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন হয়। নিচে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১৩.২.২.১ সরকারী খাতের অর্থায়নের উৎস

সরকারী খাতের অর্থায়নের উৎসমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা – অভ্যন্তরীণ উৎস ও বৈদেশিক উৎস।

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস

১. রাজস্ব উদ্বৃত্ত বলতে রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের পার্থক্যকে বুঝায়। একে সাকারী সঞ্চয়ও বলা যায়। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস।

২. সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য বিদ্যমান করের হার বৃদ্ধি ও নতুন কর আরোপ করতে পারে বা বিদ্যমান করের আওতা বাড়াতে পারে। যেমন – ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়। পরবর্তীকালে এই করের আওতা বাড়ানো হয়েছে।

৩. নীট মূলধন আয় বলতে সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক আমানত তহবিলের অধীনের আমানত প্রভৃতি থেকে নীট আয়কে বুঝায়। নীট মূলধন আয় অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৪. স্বশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব আয় থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু অর্থায়ন হয়ে থাকে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আয় পরিকল্পনার অর্থায়নে ব্যবহার করা হয়।

৫. ঘাটতি ব্যয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সরকারের স্বাভাবিক উৎসসমূহ থেকে আয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের জন্য যথেষ্ট হয় না। এ অবস্থায় সরকার বন্ড বিক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে বা বেসরকারী খাত থেকে ঋণ নেয়। একে ঘাটতি ব্যয় বলে। তবে কোন কোন দেশে শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ ঘাটতি ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ দেশের মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করে। যদি এরূপ ঋণের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে দেশে দামস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

খ. বৈদেশিক উৎস

উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের একটি বড় অংশ বৈদেশিক উৎস থেকে আসে। বৈদেশিক সরকারী সাহায্য সাধারণত রেয়াতী শর্তে (বা সহজ শর্তে) দেয়া হয়। অর্থাৎ এ সাহায্য অনুদান হতে পারে যা এককালীন দিয়ে দেয়া হয় বা ঋণ হতে পারে যা আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে নিলে যে শর্তে নিতে হত তার চেয়ে কম সুদের হারে ও দীর্ঘ পরিশোধকালের জন্য দেয়া হয়। সরকার অনেক সময় বাণিজ্যিক শর্তেও ঋণ নেয়। যেমন – রপ্তানি ঋণ, ইকুইটি বিনিয়োগ এবং বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক থেকে কঠিন শর্তে ঋণ। রেয়াতী ঋণকে সাধারণত সরকারী উন্নয়ন সাহায্য বলে বা বৈদেশিক সাহায্য বলে।

২. বেসরকারী খাতের অর্থায়ন

বেসরকারী খাতের অর্থায়ন ব্যক্তিগত সঞ্চয় অথবা ঋণ থেকে হয়। অসংগঠিত মুদ্রা বাজার, ব্যাংকিং খাত, অব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি উৎস থেকে বেসরকারী খাত ঋণ পায়। এছাড়া কোন কোন প্রকল্পে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

৪, ৫ বা ৬ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা ও ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বলে।
উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের উৎস সরকারী ও বেসরকারী খাতের জন্য ভিন্ন হয়। সরকারী খাতে অভ্যন্তরীণ উৎস ও বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন হয়। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত কর আরোপ, নীট মূলধন আয়, স্বশাসিত সংস্থা ও সরকারী বিভাগের নিজস্ব অর্থায়ন ও ঘাটতি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ অনুদান, সহজ শর্তে ঋণ বা কঠিন শর্তে ঋণ হতে পারে অথবা বাণিজ্যিক শর্তে ঋণ হতে পারে।
বেসরকারী খাত নিজস্ব সঞ্চয় দ্বারা বা বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে অর্থায়ন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ - ৩ : বাংলাদেশে পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা : সফলতা ও ব্যর্থতা, ব্যর্থতার কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণসমূহ বলতে পারবেন।

১৩.৩.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশের সূচনাকাল থেকে সে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়। এরপর ১৯৭৮ - ৮০ সময়কাল একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকর থাকে। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হয় এবং পরপর এরূপ তিনটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ (১৯৯০-৯৫) শেষে আর কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু না করে অর্থনীতিকে একটি অংশীদারিত্বমূলক প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (১৯৯৫-২০১০) আওতায় আনা হয়। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপযোগিতা পুনরায় উপলব্ধি করে ১৯৯৭ - ২০০২ মেয়াদের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ করা হয়।

১. প্রত্যেক পরিকল্পনায় মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হারের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫ এর বেশি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ পরিকল্পনাকালে এই হার শতকরা ৩.৮ থেকে ৪.১৫ এর মধ্যে সীমিত থাকে।
২. মাথাপিছু গড় আয় ১৯৭২/৭৩ সালের তুলনায় ১৯৯৬/৯৭ সালে দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। এ সঙ্গে দেশে দারিদ্র পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হয়েছে। ফলে জনসংখ্যার ৮৩% দারিদ্র সীমার নিচে ছিল। তা কমে ১৯৯৬ সালে দাঁড়ায় ৪৫.৮% এ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থনীতিতে এখনও ব্যাপক দারিদ্র রয়েছে। অন্যদিকে আয় বন্টনে বৈষম্য বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
৩. বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর ফলে বেকারত্বের হার কিছুটা হ্রাস পায়, যথা – ১৯৭২/৭৩ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৩৮.৮%, ১৯৯৬-৯৭ সালে তা কমে ২৭.০% এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ অর্থনীতিতে ব্যাপক বেকারত্ব অব্যাহত থাকে।
৪. পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যাণে লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭১ সালের ২.৫% থেকে নেমে ১৯৯৬ সালে ১.৮% এ দাঁড়িয়েছে। গড় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ১৯৭০ সালে ছিল ৪৫ বছর, তা বেড়ে ১৯৯৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৮ বছর।
   ১৯৭৫ সালে জনসংখ্যার ৫৬% নিরাপদ পানীয় জল ভোগ করত, ১৯৯৬ সালে ৯০% লোক এই সুবিধা ভোগ করে। শিক্ষাখাতে বেশ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। যেমন বয়স্ক শিক্ষার হার ১৯৭৪ সালে ছিল ২৫.৪০%, ১৯৯১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩০% এ। এ উন্নতি সত্ত্বেও অবশ্য দেশের বেশির লোক এখনও নিরক্ষর থেকে গেছে।
৫. দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহে লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটেছে। দেশজ সঞ্চয়ের হার ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল – ১.৯২%, তা বেড়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৭.৭০% এ। একই সময়ে জাতীয় সঞ্চয়ের হার – ২.৭৭% থেকে বেড়ে ১৪.৬৩% এ দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগের হার ৩.০১% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.৩৭% এ। এ উন্নতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার পাশ্ববর্তী উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। এর ফলে দেশে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হার কম।

দেশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও শতকরা ৪০ ভাগ বৈদেশিক উৎস হতে আহরণের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। অবশেষে পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় এই নির্ভরশীলতা বেড়ে শতকরা ৭৭

ভাগে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়ে শতকরা ২২ ভাগে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় পরিকল্পনাকালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। সার্বিকভাবে নিম্ন মাথাপিছু দারিদ্রের আপাতন, নিম্ন শিক্ষার হার, আয় বন্টনে বৈষম্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে এখনও বিদ্যমান। তাছাড়া প্রত্যেক পরিকল্পনায় যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি।

১৩.৩.৩ পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণসমূহ

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় পরিকল্পনা কোন কোন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। পরিকল্পনার এই ব্যর্থতার জন্য কিছু কারণ কাজ করেছে। নিচে এই কারণসমূহ আলোচনা করা হল।

১. বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা লেগেই আছে। ইতিমধ্যে দুজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে এবং কয়েকবার সামরিক অভ্যুত্থান ও প্রতি অভ্যুত্থান হয়েছে। এছাড়া দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, হরতাল ইত্যাদি লেগেই আছে। এসবের ফলে দেশে সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির পরিবেশ নষ্ট হয়েছে।

২. বাংলাদেশ উদার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেছে। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ ও সাহায্য প্রদানের ধরন উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। প্রথমত, বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ উঠানামা করে, ফলে পরিকল্পনায় অনিশ্চিয়তার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে পণ্য সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এ সাহায্য থেকে গঠিত প্রতিরূপ তহবিলের পরিমাণ কমে গেছে এবং এ তহবিল দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়ন কমে গেছে।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন – বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হলে সরকারী তহবিলের কিছুটা বিনিয়োগ থেকে সরিয়ে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যক্তিগত সম্পদ, ফসল, গবাদি পশু, কলকজা ক্ষতিগ্রস্থ হলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হ্রাস পায়। এর ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতা দেখা যায়। সরকারী প্রকল্পসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময়মত সম্পূর্ণ হয় না।

৫. সরকারী প্রশাসন যন্ত্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সফলতা ও ব্যর্থতার চমৎকার নিদর্শন। পরিকল্পনার ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলো হল : ১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, ২. বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ হ্রাস, ৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতা ও ৫. দেশে সুশাসনের অভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণগুলি সংক্ষেপে লিখুন।